সাইকোলজি অফ হ্যাপিনেস

প্রশান্তি



মিরাজুল হক

প্রশান্তি

সাইকোলজি অফ হ্যাপিনেস

প্রশান্তি

মিরাজুল হক

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০২৬ খ্রি.

বইটিতে কোন কপিরাইট নেই - যে কেউ এর যে কোন অংশ যে কোন নামে ছাপাতে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যবহার করতে পারেন।

মূল্য : ৩৮০ (তিনশত আশি) টাকা মাত্র।

ISBN : 978-984-35-8571-4

সমর্পণ পত্র

আমার সকল প্রচেষ্টা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট
তাঁর সৃষ্টির সেবায় সমর্পিত

পরম কৃতজ্ঞতা সৃষ্টিকর্তার প্রতি, যিনি আমার জীবনে যেমন
অসংখ্য অসংখ্য সুখের মূহুর্ত দান করেছেন,
আবার অনেক কঠিন সময়ে আমাকে ফেলে
ঠিক তেমনিভাবেই গড়ে তুলেছেন -
যা আমার জন্য সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

আমি মন থেকে কৃতজ্ঞ সেসব মানুষদের প্রতি -
যারা আমার চলার পথকে কঠিন করেছেন,
সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন,
মানসিক স্ট্রেসের কারণ হয়েছেন,
আমার জীবন দুর্বিষহ করার জন্য অবদান রেখেছেন,
আপনাদের ধন্যবাদ, সত্যিই ধন্যবাদ।

আপনাদের কারণে আমার জীবন অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।
এমন অনেক মানসিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছি,
যা আপনাদের ছাড়া সম্ভব ছিল না।

নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি (আল-কুর'আন ৯৪:৫)

আল্লাহ কখনো বান্দাকে তার সাধ্যের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেন না, সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করেন না, বরং অণু পরিমাণ ভালো কাজেরও উত্তম প্রতিদান দান করেন। তাহলে আমরা কেন অনেক কাজের চাপ বা কাজের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াই? কেন কর্মফল বা সফলতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করি? কেন কষ্টের সাথেই থাকা সেই শান্তি আমরা খুঁজে পাইনা?

আমাদের সামনে ঘুরে বেড়ানো সফল মানুষগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস আর ধৈর্য্য নিয়ে ক্রমাগত ভালো কাজের চেষ্টা করেই নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছেন।

বিশ্বাস, ধৈর্য্য আর সন্তুষ্টির মতো গুণগুলো অনেক কঠিন হলেও মিরাজ স্যার তাঁর **"প্রশান্তি - সাইকোলজি অফ হ্যাপিনেস"** বইটিতে সহজে ধারণ করার সহজ উপায় বলে দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করলে, আমাদের শর্তহীন হাতগুলো অন্যের সাহায্যে বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই আমাদের ভার বহনের জন্য এগিয়ে আসবে চেনা-অচেনা অনেক হাত।

অনেক সুচিন্তিত সুপরামর্শের এ উপকারী বইটি আমাদের জীবনের ভার সহনীয় করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বইয়ের কথা কেবল 'কেতাবী কথা' হয়ে থাকার বেড়াজাল ভেঙ্গে এটিকে স্টেপ বাই স্টেপ ব্যবহারিক রূপ দেয়ার ব্যাপারটি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। এ বই আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক চাপ ম্যানেজ করার জন্য একটি অনবদ্য হাতিয়ার হয়ে বেঁচে থাকবে সেই শুভকামনা।

ডা. মনিরা খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক,
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ

মিরাজুল হক, আমাদের মিরাজ ভাই এর সাথে আজ ৩০ বছরের বেশী সময়ের সম্পর্ক। আমরা একে অপরের সুখে-দুখে পরস্পরের সমব্যথী। এই দীর্ঘ পথচলার কোন মোড়ে উনি আমার এবং আমার পরিবারের হাত ছেড়ে দেন নি। স্ট্রেস - বিশেষ করে মেন্টাল স্ট্রেসের সকল shade এর এ টু জেড এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ওনার নিজেরই আছে, যার সাথে যুক্ত হয়েছে ওনার সাথে ও আশপাশে থাকা শত শত মানুষ এবং তাদের পরিবারের কষ্টের অভিজ্ঞতা। স্ট্রেস ম্যানেজার মিরাজ ভাই এর দায়িত্ব হচ্ছে সকলের সে স্ট্রেস-কে ম্যানেজ করা, ডিল করা। মিরাজ ভাইয়ের লেখা এ বইটি তাঁর আজীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস। অভিজ্ঞতা হলো মানুষকে মানসিক চাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার, তাদের মানসিক ও পারিবারিক জটিল পরিস্থিতিগুলোর সমাধান করার ইতিহাস।

কোন মানুষের সৎ এবং নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম সৃষ্টিকর্তা কখনো বৃথা যেতে দেন না। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মন পর্যন্ত সাহায্য পাঠাবার এই প্রয়াস আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন - আমীন।

মাহ-এ-নূর কুদসী ইসলাম
চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মানসিক চাপ সম্পর্কে ধারণা
মানসিক চাপ কী? ২
মানবশরীরে অতিরিক্ত স্ট্রেসের প্রভাব ৪
মানসিক চাপের রকম-সকম ৬
স্ট্রেস কি মাপা যায়, বাড়ানো বা কমানো যায়? ৯
অ্যাকশন প্ল্যানিং ১০

Stress গল্পের শুরুটা কোথায়?
অতিরিক্ত স্ট্রেসের লক্ষণ ১২
ওভারলোড বা অতিরিক্ত বোঝা ১৩
মানসিক চাপ পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২৩
জীবনের যে সব সেক্টরে স্ট্রেস আসে ২৮
অ্যাকশন প্ল্যানিং ৪৪

শুকরিয়া আদায়
স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় ৪৮
একটি সুখী পাখির গল্প ৫০
চাওয়া পাওয়ার হিসাব ৫৩
প্রতিদিনের শুকরিয়া আদায়ের চর্চা ৬৩
Simple Pleasure VS. Foolish Pleasure ৬৪
অ্যাকশন প্ল্যানিং ৬৯

ইতিবাচক সংযোগের দক্ষতা
মানুষ হিসেবে আপনি কোন টাইপের? ৭৪
ইতিবাচক একটি মন তৈরী করা ৮০
ইতিবাচক সংযোগের স্বর্ণালী সূত্র ৮২
সংবেদনশীলতা ৯৩
অ্যাকশন প্ল্যানিং ৯৭

পেশাগত চাপ ব্যবস্থাপনা
বুদ্ধিমত্তার সাথে পেশা নির্বাচন ১০০
নিজেকে দক্ষ করে তোলা ১০১
'না' বলতে না পারা ১০২
কাজ ভাগ করে নেয়া ১০২
অফিস পলিটিক্স ১০২
সময়নিষ্ঠা ১০৩
ইকিগাই ১০৩
অর্থ ব্যবস্থাপনা
'অর্থ' - সম্পর্কে ধারণা ১১০
বাজেটিং ১১৬
খরচ ১১৯
সঞ্চয় ১২৬
দান - প্রাচুর্যের চাবিকাঠি ১২৯
অ্যাকশন প্ল্যানিং ১৩৪
মাইন্ডফুলনেস
'মাইন্ডফুলনেস' এর ধারণা ১৩৮
সচেতনতার সূত্র ১৪১
ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা ১৪৫
বিচ্ছিন্নতার সূত্র ১৫০
প্রো-অ্যাকটিভ বনাম রি-অ্যাকটিভ আচরণ ১৫৮
ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের অবিশ্বাস্য গল্প ১৬৮
অ্যাকশন প্ল্যানিং ১৭৪
সময় ব্যবস্থাপনা
কেন সময় ব্যবস্থাপনা জানা দরকার? ১৭৮
কীভাবে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হয়? ১৮২
3D ফর্মূলা ১৮৫
৮০/২০ প্যারেটো রুল ১৮৮
অ্যাকশন প্ল্যানিং ১৯১

মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
শারীরিক স্বাস্থ্য ১৯৪
মানসিক স্বাস্থ্য ২০০
সময় সবকিছু বদলে দেয় ২১৫
একটি ক্যামেরার গল্প ২২০
অ্যাকশন প্ল্যানিং ২২৭
রাগ নিয়ন্ত্রণ - স্ট্রেস নিয়ন্তণে একটি বড় ফ্যাক্টর ২২৮
রাগ কেন হয় - কারণ খুঁজে বের করা ২২৯
রাগ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবসম্মত কৌশল ২৩০
মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির ব্যবহার
মানসিক প্রশান্তির বিভিন্ন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ২৩৬
অনলাইন শিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ২৩৭
স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে এ.আই. (চ্যাটজিপিটি)'র ভূমিকা ২৩৭
স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা ২৪০
কখন একজন প্রফেশনাল এর শরণাপন্ন হতে হবে? ২৪০
শেষ কথা কখনোই শেষ কথা নয় ২৪৩

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট - অতি প্রয়োজনীয় একটি লাইফস্কিল

'হে প্রশান্ত আত্মা - ফিরে এসো তোমার প্রভূর কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে। অতঃপর আমার অনুগতদের শামিল হও আর প্রবেশ কর আমার উদ্যানে, অনন্ত শান্তি পারাবারে'।

আল কুর'আন : সূরা আল-ফাজর (৮৯), আয়াত ২৭-৩০

অশান্ত আত্মা থেকে প্রশান্ত আত্মায় পরিবর্তনের এ অভিযাত্রায় আপনাকে স্বাগত! মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার এই বইটিতে আমরা আলোচনা করব মনের 'প্রশান্তি'র সমীকরণ নিয়ে, কথা বলব হ্যাপিনেস এর সাইকোলজি নিয়ে।

স্ট্রেস, স্ট্রেস, স্ট্রেস–আমাদের জীবন যেন ঘিরে আছে এই শব্দটি দিয়ে। *'কেমন আছেন আপনি'?* এই প্রশ্নটি করলে অনেকেই বলবেন *'ভালো আছি,'* তবে এই 'ভালো' বলা যেন ঠিক ভেতর থেকে আসে না। আমরা যেন সবাই কিছুটা অস্বস্তিতে আছি, একটা চাপ অনুভব করছি। *'আমি খুব ভাল আছি'* - মন থেকে বলতে পারি না।

'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম!' প্রায় সব মানুষের মনে হয় - আগের দিনগুলো কতই-না ভালো ছিল। জীবন যেন আর আগের মতো নেই। আমরা সবাই স্ট্রেসের মাঝে আছি, আমাদের চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন, আশা–সবকিছুই যেন অদৃশ্য দেয়ালে আটকা পড়ে যাচ্ছে। যা আমরা চাই, তা ঠিকভাবে পাচ্ছি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে সারাক্ষণ আমাদের দুর্ভাবনা হয়, *'কী যে হবে.. কী হতে যাচ্ছে?'* সবকিছুই কেমন যেন অনিশ্চিত।

কেন এমন হচ্ছে? কীভাবে আমরা সেই চাওয়াগুলো পূরণ করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা হয়তো আমাদের প্রতিদিনের সুন্দর মুহূর্তগুলো অপচয় করছি। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের এ বইটি থেকে আমরা সেই চাপ, উদ্বেগ, হতাশা থেকে কীভাবে বের হয়ে আসা যায়, সেটা শিখতে চাই। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা স্ট্রেসের কারণ, এর প্রভাব এবং এর থেকে মুক্তির বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি এই বইটি পড়ার মাধ্যমে স্ট্রেসের শেকল ভেঙে এক নতুন সূর্যোদয়ের পথে এগিয়ে যাবেন, এমনটাই আমাদের আশা।

আজ আমরা এ বইটি হাতে নিয়েছি মানসিক চাপ সম্পর্কে জানার জন্য। মানসিক চাপ বা স্ট্রেস সম্পর্কে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে মানসিক চাপ কি আসলেই কমানো বা দূর করা সম্ভব? টেনশন থেকে কি বের হওয়া আসলেই যায়? এ ছাড়াও আরও অনেক প্রশ্নের প্রশ্নের উত্তর আমরা এ বইটিতে খুঁজে পাবো।

স্ট্রেস, যা মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর প্রয়োজনও আছে। শুনতে হয়তো অবাক লাগতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ, স্ট্রেস আমাদের জীবনের জন্য সত্যিই প্রয়োজনীয়। আপনি হয়তো ভাবছেন, স্ট্রেস থেকে মুক্তির জন্যই তো এত কিছু করছি, এত এত বই, লেকচার, ওয়ার্কশপ, এত কৌশল! তাহলে আবার বলছি, প্রয়োজনীয় - কেন?

আমরা জানি, প্রতিদিনের ছোট-বড় চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে আরও বেশি শক্তিশালী, আরও সামর্থ্যবান করে তোলে। স্ট্রেস ছাড়া আমাদের শরীর, মন ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এটি আমাদের সতর্ক রাখে, সমস্যা সমাধানের প্রেরণা জোগায়, এমনকি বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সিস্টেমকে জাগিয়ে রাখে।

স্ট্রেস না থাকলে হয়তো আমরা ঝুঁকির মুখে কীভাবে রি-অ্যাক্ট করব তা বুঝতে পারতাম না, আমাদের জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ করতাম না। জীবনে উন্নতি করার অন্যতম চালিকাশক্তিও এই স্ট্রেস। যেমন ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার বা কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োজনীয়, তেমনি স্ট্রেসও প্রয়োজনীয়। এটি আমাদের অগ্রসর হতে, চ্যালেঞ্জ নিতে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের সামলাতে সাহায্য করে।

তবে, সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন এই স্ট্রেস প্রয়োজনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। যেমন ব্লাড প্রেশার বা ব্লাড সুগার মাত্রাতিরিক্ত হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, তেমনি অতিরিক্ত স্ট্রেসও আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। স্ট্রেসের অতিরিক্ততা আমাদের মনকে ক্লান্ত করে, দুশ্চিন্তা বাড়ায়, এবং একসময় তা আমাদের সামগ্রিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা সবাই জানি, স্ট্রেস যদি আমাদের জীবনে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জায়গা দখল করে, তাহলে তা বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে–এমনকি এটি আমাদের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে।

সুতরাং, স্ট্রেসের প্রয়োজনীয় মাত্রা বজায় রাখা, এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটি থেকে আমরা শিখব, কীভাবে এই স্ট্রেসকে কাজে লাগিয়ে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায়, কীভাবে একে জীবনের এক আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং মাত্রার বাইরের অপ্রয়োজনীয় স্ট্রেস এর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায়।

এই বইটি আমরা একেবারেই সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করছি, তাই জটিল কোন মেডিকেল বা টেকনিক্যাল টার্ম ব্যবহার করা হয়নি, বরং পুরো বিষয়টি সহজ ও স্পষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, গল্পের মতো করে বলে গিয়েছি যেন সবাই সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারেন। আমি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত যত বই পড়েছি এবং যত ওয়ার্কশপ করেছি সে জ্ঞান প্রয়োগ করে আমার নিজের জীবনে আসা স্ট্রেসগুলো কীভাবে ম্যানেজ করেছি সে গল্পও এখানে করেছি।

এই অতিরিক্ত স্ট্রেসকে যদি আমরা সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে চাই, তাহলে প্রথম কাজ হবে এই শত্রুকে ভালোভাবে চেনা। কেননা, যেকোনো শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে আগে তাকে বুঝতে হয়। স্ট্রেস আমাদের জীবনে কীভাবে আসে, কেমন প্রভাব ফেলে, এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে–এসব আমরা গভীরভাবে জানব।

তারপর আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে আসা স্ট্রেসসমূহের মূল কারণ, লক্ষণ, কী পরিমাণ স্ট্রেস এই মুহূর্তে আমরা বহন করে চলেছি এবং এটি আমাদের মানসিক-শারীরিক স্বাস্থ্যে কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা আলোচনা করব।

ফাইনালি শিখব, কীভাবে এই স্ট্রেসকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রেখে, আমাদের জীবনকে আরও ইতিবাচক ও শান্তিময় করে তুলতে পারি। আশা করছি আপনারা এ বইটি একটি দারুণ জার্নির মতো করে উপভোগ করতে পারবেন।

এ বইটি একটি 'স্কিল লার্নিং' বই, শুধু তথ্যের বই নয়। এ বইটি আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য লেখা হয়েছে। শুধু তথ্য জানার জন্য নয়, বরং তা আপনার জীবনে বাস্তবে কাজে লাগানোর মতো করে তৈরি করেছি। প্রতিটি প্রয়োজনীয় স্থানে 'অ্যাকশন প্ল্যান' ও নোট লেখার জন্য জায়গা দেওয়া আছে। আমরা অন্য যেকোনো বইয়ের মতো শুধু তথ্যের জন্য না পড়ে এ বইটিকে 'ওয়ার্ক বুক' হিসেবে কাজে লাগালে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। আমরা আশা করি আপনি এ বইটির পরিপূর্ণ ব্যবহার করবেন। আমরা শুধু ফ্যাক্ট শিখব না, বরং কীভাবে সেই ফ্যাক্টগুলোকে জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সেটাও শিখব। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি পথ তৈরি করা, যা আপনাকে স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করার সুযোগ দেবে।

তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক। সবাই সীট বেল্ট বেঁধে নিন। চলুন, একসাথে এই যাত্রায় পা বাড়াই – প্রশান্তি'র পানে।

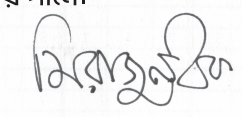

মানসিক চাপ
Mental Stress
সম্পর্কে ধারণা

যদিও শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু কম স্ট্রেস থাকলে অনেক সময় আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, এবং ভালো ফলাফল অর্জনের প্রেরণা কমে যায়। আবার অতিরিক্ত স্ট্রেস থাকলে আমরা ক্লান্ত অবসন্ন ও হতাশ বোধ করি। সঠিক মাত্রার স্ট্রেস বজায় রাখতে হয়।



মানসিক চাপ কী?

স্ট্রেসের মূল উৎস হলো আমাদের প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার মধ্যে মিল না খাওয়া। আমরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু প্রত্যাশা করে রাখি–ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব সারাজীবন ধরে চলতেই থাকে। আপনারা জানেন কি, প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার বারের মতো আমাদের অবচেতন মন এই চাওয়া-পাওয়া গুলির মধ্যে তুলনা করতে থাকে। ছোটখাটো না পাওয়া আমরা হয়তো উপেক্ষা করি, *'পরে হবে'* বলে মেনে নেই। কিন্তু যখন বড় কোন আশা অপূর্ণ থাকে, তখন সেই মিসম্যাচ আমাদের মনে চাপের বাসা বাঁধে, এবং ধীরে ধীরে তা জমা হতে থাকে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা কীভাবে এই আশা আর বাস্তবতার ফারাক সামলে নিতে পারি। আমাদের প্রত্যাশাগুলোকে কীভাবে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করা যায়, কীভাবে বড় আশা পূরণ না হলেও মানসিক চাপকে বাড়তে না দিই–এই বিষয়গুলোই আগে আমাদের বুঝতে হবে।

বন্ধুরা, দুইটা টেলিফোন কলের উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যে স্ট্রেস কীভাবে তৈরি হয়।

প্রথম উদাহরণ - ধরুন আপনি অফিসে কাজ করছেন। হঠাৎ আপনার বাসা থেকে স্ত্রী'র কল এলো। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, *'কী ব্যাপার, সব ঠিক আছে তো?'* উত্তরে তিনি বললেন, *'হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে। বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে টিভি দেখছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'* এই কথোপকথনে আপনি নিশ্চয়ই কোন রকম স্ট্রেস অনুভব করেননি। বাসায় সব ঠিক আছে শুনে আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ - ধরুন অফিসে বসে আছেন এবং হঠাৎ বাসা থেকে ফোন এলো। ফোনে জানানো হলো যে, আপনি যাকে ব্যাংকে টাকা জমা করতে দিয়েছিলেন, সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই খবর শুনে আপনার মনের মধ্যে একটি চাপ তৈরি হলো, কারণ এটি আপনার প্রত্যাশার বাইরে। এমন ঘটনা আপনি একেবারেই আশা করেননি। বাস্তবতা এবং আপনার চাওয়ার মধ্যে গড়মিল হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেস সৃষ্টি হলো।



এই দু'টি উদাহরণে আমরা বুঝতে পারি, স্ট্রেস তখনই হয় যখন কোন কিছু আমাদের আশা অনুযায়ী না ঘটে। জীবনের বাস্তবতা যখন আমাদের ইচ্ছা বা প্রত্যাশার সঙ্গে না মিলে - সেই মিসম্যাচ থেকে স্ট্রেস জন্ম নেয়। তবে এই স্ট্রেস কতটা প্রভাব ফেলবে, তা একেকজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় এবং একেক ঘটনার ক্ষেত্রেও ভিন্ন হতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমরা একটি প্রাথমিক ধারণা পেলাম – মেন্টাল স্ট্রেস মূলত আমাদের চাওয়ার সঙ্গে বাস্তবতার গড়মিলের ফল। এই বইয়ে আমরা স্ট্রেসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব, এবং একে সামাল দেওয়ার উপায়গুলো জানব।

মানবশরীরে অতিরিক্ত স্ট্রেসের প্রভাব

স্ট্রেস যখন আমাদের জীবনকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করতে থাকে, তখন তা শুধু মানসিক নয়, শারীরিকভাবেও আমাদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আসুন দেখি, স্ট্রেসের প্রভাবে আমাদের শরীরের ভেতরে, বিশেষ করে ব্রেইনে, কী কী ঘটনা ঘটে।

প্রথমেই, যখন আমরা স্ট্রেসের মুখোমুখি হই, তখন শরীরে দু'টি প্রধান হরমোন নিঃসৃত হয়: অ্যাড্রেনালিন এবং কর্টিসল। এই দুই হরমোনের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করা এবং সজাগ রাখা। বন্ধুরা, যখন এই হরমোনগুলো রক্তে প্রবাহিত হয়, তখন রক্তনালী সংকুচিত হয়, ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। যারা গ্যাস্ট্রিক, আলসার বা অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

পেটের সমস্যা ও ডায়রিয়া : স্ট্রেস Irritable Bowel Syndrome (IBS) বা পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ডায়রিয়া বা পেট খারাপের মতো সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে।

পিঠে, ঘাড়ে ও কোমরে ব্যথা : দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেসে কাঁধ, পিঠ ও কোমরে ব্যথা শুরু হয়, বিশেষ করে স্পন্ডিলাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অ্যালার্জি: দীর্ঘ স্ট্রেসের কারণে শরীরে বিভিন্ন জিনিসের প্রতি সংবেদনশীলতা বা অ্যালার্জির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক : দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে শরীরে ক্ষতিকর উপাদান যেমন কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডসের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে রক্তনালীতে ব্লক তৈরি হতে পারে, যা সময়ের সাথে ফেটে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

ব্রেইন ড্যামেজ বা হ্যামারেজ : স্ট্রোক থেকে ব্রেইন ড্যামেজ বা হ্যামারেজ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেসে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং চিন্তা ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে, পক্ষাঘাত, অঙ্গহানি এমনকি মৃত্যু হতে পারে।

এইসব সমস্যা আসলেই ভীতিকর হলেও, ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে সচেতনতা তৈরি করা। দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেস সত্যিই আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত থাকার জন্য সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুষ্টচক্রে পড়ে থাকলে স্ট্রেস থেকে বের হওয়া আরও কঠিন হয়ে যায়। আশা করি এই উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন। এই স্ট্রেস যদি দীর্ঘ সময় ধরে বহন করতে থাকি, তাহলে এটি আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

বন্ধুরা, আমাদের জীবনে স্ট্রেস এমনভাবে ঢুকে পড়ে যে আমরা প্রায়ই বুঝতেই পারি না, কতটা মারাত্মক প্রভাব এটি আমাদের শরীর ও মন, এমনকি পুরো জীবনধারায় ফেলতে পারে। তাই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট শেখা আমাদের সবার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজনীয় কৌশল ও টেকনিকগুলো শেখানো, যা আমাদের জীবনকে আরও স্বাস্থ্যকর ও সুখী করে তুলতে পারে। এই কৌশলগুলো শুধু রোগ প্রতিরোধে নয়, বরং আমাদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে, জীবনকে আরও উপভোগ্য

ও আনন্দময় করে তুলতে পারে। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, এই জ্ঞানটি যেন শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে–সবার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পৌঁছে দিন, যাতে আরও বেশি মানুষ এই বিষয়ে সচেতন হতে পারে এবং নিজেদের জীবনের মান বাড়াতে পারে। আমরা সবাই মিলে যদি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে আজকের সমাজে যে মানসিক ও শারীরিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা নিয়তঃ হচ্ছি, সেগুলো মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

মানসিক চাপের রকম-সকম

স্ট্রেস মূলত দুই ধরনের হতে পারে – আমরা সাধারণত মনে করি স্ট্রেস মানেই খারাপ জিনিস, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। স্ট্রেসের একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এই দুই ধরনের স্ট্রেস হলো :

ইউস্ট্রেস (Eustress) : এটি ভালো স্ট্রেস, যা আমাদেরকে ইতিবাচক ভাবে উত্তেজিত করে, আনন্দ দেয় এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। যেমন, একটি ভালো চাকরি পাওয়া, বড় কোন ব্যবসায়িক সুযোগ আসা, নতুন কিছু শেখা, পরিবারের নতুন সদস্যের আগমন বা জীবনের নতুন কোন চ্যালেঞ্জ – এসব ঘটনা আনন্দদায়ক হলেও কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে। তবে এই চাপটি আমাদের জীবনে আনন্দ ও সন্তুষ্টি নিয়ে আসে এবং খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ে করা বা প্রমোশন পাওয়া ইউস্ট্রেস হতে পারে, কারণ এগুলো আমাদের জীবনে সুখের মুহূর্ত এনে দেয়।

ডিস্ট্রেস (Distress) : এটি নেতিবাচক স্ট্রেস, যা আমাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, যেমন আর্থিক সমস্যা, সম্পর্কের টানাপোড়েন বা চাকরির অনিশ্চয়তা, এই ধরনের স্ট্রেস তৈরি করে। ডিস্ট্রেস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং আমাদের শরীর ও মনের ওপর দীর্ঘমেয়াদে অবশ্যম্ভাবী খারাপ প্রভাব ফেলে।

ইউস্ট্রেস সাধারণত কম সময়ের জন্য আসে এবং ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা আমাদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। অন্যদিকে, ডিস্ট্রেস দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অনেক সময় আমাদের মন ও শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। এই পার্থক্যগুলো বোঝা আমাদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইতিবাচক স্ট্রেসকে কাজে লাগানো এবং নেতিবাচক স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের চাবিকাঠি।

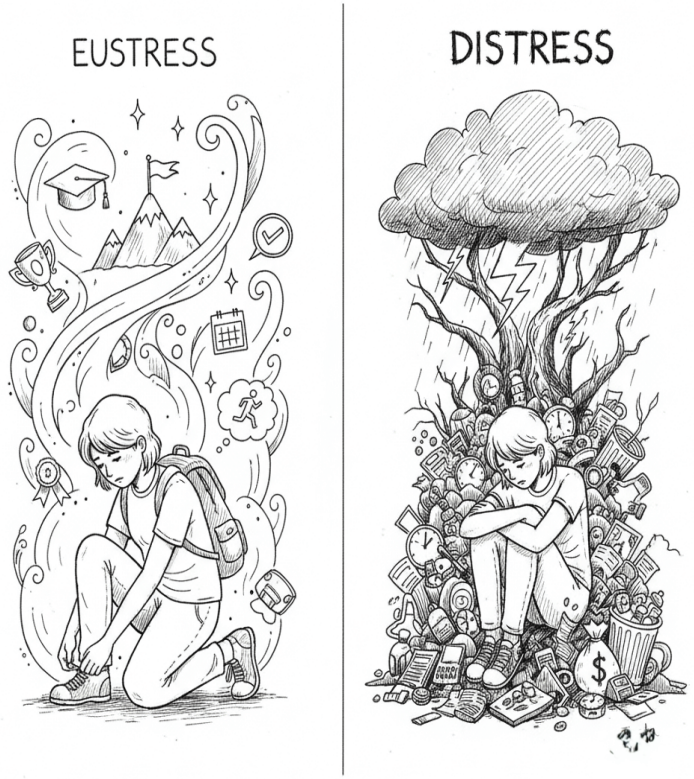

আমরা জানলাম যে স্ট্রেস মূলত দুই ধরনের হতে পারে - ইউস্ট্রেস এবং ডিস্ট্রেস। তবে সাধারণত আমরা যা 'স্ট্রেস' বলে বুঝি বা অনুভব করি, তা আসলে ডিস্ট্রেস। এই ধরনের স্ট্রেস সাধারণত নেতিবাচক এবং আমাদের জন্য চাপ ও কষ্ট সৃষ্টি করে।

ডিস্ট্রেসের কিছু উদাহরণ হলো :

ব্যক্তিগত ক্ষতি : যেমন স্বামী, স্ত্রী, সন্তান বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু। এটি একটি বড় ধরনের মানসিক আঘাত নিয়ে আসে, যা দীর্ঘমেয়াদে আমাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

আর্থিক সমস্যা : যেমন দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, ঋণে জর্জরিত হওয়া - সর্বোপরি আর্থিক সংকট। বিশেষ করে করোনা প্যান্ডেমিকের সময় অনেকেই এই ধরনের আর্থিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। অনেকের জব বা ব্যবসা স্থবির হয়ে গিয়েছিল, এবং এই পরিস্থিতিতে অনেকেই ডিস্ট্রেসে পড়েছেন। তবে অনেকেই আবার এই ডিস্ট্রেসকে ইউস্ট্রেস বা ইতিবাচক চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে সামলে উঠেছেন।

গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা : দীর্ঘমেয়াদে কোন অসুস্থতা বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, বা শরীরের কোন অঙ্গহানি হওয়া। এটি বড় ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি করে।

ঘুমের সমস্যা : পর্যাপ্ত ঘুম না হলে স্ট্রেস বেড়ে যায় এবং শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্যারেন্টিং বা সন্তানের সমস্যা : সন্তানের লেখাপড়ায় সমস্যা, আচরণজনিত সমস্যা থাকে, বাবা-মা হিসেবে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন - তবে তা পিতা-মাতার জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শারীরিক আঘাত বা স্থায়ী অসুস্থতা : যেকোনো আঘাত বা দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা ডিস্ট্রেসের একটি বড় কারণ হয়ে থাকে।

ডিস্ট্রেস আমাদের জীবনে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই ডিস্ট্রেসকে ইউস্ট্রেসে পরিণত করার চেষ্টা করা। আমরা এই প্রক্রিয়াগুলি এবং টেকনিকগুলো ধীরে ধীরে জানব, যা স্ট্রেসকে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করতে সহায়ক হবে।

স্ট্রেস কি মাপা যায়, বাড়ানো বা কমানো যায়?

স্ট্রেস মাপা যায় কিনা – হ্যাঁ, এটি কিছুটা হলেও মাপা যায়, কিন্তু ঠিক রক্তচাপ বা ব্লাড সুগারের মতো সহজে নয়। স্ট্রেসের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। স্ট্রেস পরীক্ষা করার জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয় কর্টিসল এবং এড্রেনালিন হরমোনের লেভেল, যেগুলো রক্ত, মূত্র, বা লালার পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব। এ ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন স্কেল আছে, যেমন পেরসিভ্ড স্ট্রেস স্কেল (PSS), যা ব্যক্তির মানসিক চাপের মাত্রা নির্ধারণে সাহায্য করে।

যদিও শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু কম স্ট্রেস থাকলে অনেক সময় আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, এবং ভালো ফলাফল অর্জনের প্রেরণা কমে যায়। আবার অতিরিক্ত স্ট্রেস থাকলে আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন ও হতাশ বোধ করি। সঠিক মাত্রার স্ট্রেস বজায় রাখতে গেলে, আমাদের জীবনের ইউস্ট্রেস বা ভালো স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং ডিস্ট্রেস কমাতে হবে। স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করে এবং ধীরে ধীরে আমাদের স্ট্রেস লেভেল প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখা যায়। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের টেকনিকগুলোর মাধ্যমে আমরা শিখব কীভাবে ডিস্ট্রেস কমিয়ে ইউস্ট্রেসে রূপান্তর করা যায়।

অ্যাকশন প্ল্যানিং

মেন্টাল স্ট্রেস সম্পর্কে আপনি এখন কী কী শিখলেন?

১) স্ট্রেস অর্থ হচ্ছে _____ ও _____ মধ্যে পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট মানসিক চাপ।

ক) না চাওয়া ও না পাওয়ার

খ) না চাইতেই পাওয়ার

গ) চাওয়া ও পাওয়ার

ঘ) চাওয়া ও না পাওয়ার

২) স্ট্রেস _____ রকমের হতে পারে?

৩) স্ট্রেসগুলো হচ্ছে _____ ও _____।

৪) স্ট্রেস কি মাপা যায়?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) আমি শিওর না

৫) ডিসট্রেসকে ইউস্ট্রেসে রূপান্তর করা যায় কি?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) আমি শিওর না

Stress গল্পের শুরুটা কোথায়?

একটা গাড়িতে যদি পাঁচ টন পরিমাণ মালামাল নেয়া যায়, আমরা যদি সেখানে সাত টন বা দশ টন দিই, তখন কী হবে? অবশ্যই এটা ওভারলোডেড হয়ে যাবে। সে তার পুরোপুরি শক্তি দিয়ে ঠিকমতো চলতে পারবে না। বেশি দিন ধরে যদি আমরা এটা চালিয়ে যাই, তাহলে কিন্তু ক্ষতি হবে গাড়িটার।



সবার আগে জানা দরকার আমাদের জীবনে অতিরিক্ত স্ট্রেস কোথা থেকে আসে। এ পর্বে আমরা স্ট্রেসের সম্ভাব্য উৎস এর রকম-সকম এবং আমাদের জীবনে স্ট্রেসের ওভারলোড নিয়ে কথা বলব।

অতিরিক্ত স্ট্রেসের লক্ষণ

আমরা দেখবো কীভাবে অতিরিক্ত স্ট্রেসের লক্ষণগুলো নিজের মধ্যে খুঁজে বের করা যায়। এই লক্ষণগুলো বোঝার মাধ্যমে আপনি সহজেই জানতে পারবেন আপনার মধ্যে অতিরিক্ত স্ট্রেস আছে কি না। অতিরিক্ত স্ট্রেসের কিছু সাধারণ লক্ষণ নিচে দেওয়া হলো। এগুলো যদি আপনার মধ্যে থাকে, তাহলে নোট করে রাখুন—আপনার মধ্যে এই স্ট্রেস-সম্পর্কিত উপসর্গগুলো রয়েছে কিনা :

ধূমপান : আপনি কি ধূমপান করেন? অনেকেই বলে থাকেন ধূমপান করলে টেনশন কমে যায়। তবে ধূমপান অতিরিক্ত স্ট্রেসের একটি লক্ষণ হতে পারে।

অ্যালকোহল গ্রহণ : যাঁরা অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ (মদ্যপান) করেন, তাঁরা মানসিক চাপ থেকে পালানোর জন্য এই অভ্যাসটি করে থাকেন। এটি অতিরিক্ত স্ট্রেসের একটি ইঙ্গিত।

অস্থিরতা : অতিরিক্ত স্ট্রেসে থাকলে মন অস্থির হয়ে যায়। স্থিরভাবে চিন্তা করতে কষ্ট হয়, এবং মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

মেজাজের পরিবর্তন: অতিরিক্ত স্ট্রেসে মেজাজ সবসময় খারাপ থাকে। ছোটখাটো বিষয়েও রেগে যান কিংবা বিরক্ত হন, আর এতে আশপাশের মানুষ আপনাকে বদমেজাজি হিসেবে দেখতে শুরু করে।

ঘুমের সমস্যা : ঘুম ঠিকমতো হয় না। অনেক সময় সারা রাত জেগে জেগে কাটিয়ে দেন, ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখেন। এটি দিনের দুশ্চিন্তাগুলোর রাতের প্রতিফলন।

সৃষ্টিশীলতা হ্রাস : স্ট্রেসে থাকলে সৃজনশীল চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। নতুন কিছু ভাবতে, ক্রিয়েটিভ চিন্তা করতে বাধা সৃষ্টি হয়।

ভুলে যাওয়া ও ভুল করা : ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, কাজের ভুল হওয়া, কিংবা যে কাজটা ঠিকমতো করার কথা সেটাও বারবার ভুল করে ফেলা স্ট্রেসের লক্ষণ।

গলার স্বরের পরিবর্তন : অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে গলার স্বরে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক গলা ভারী বা কাঁপা কাঁপা হয়ে যেতে পারে।

হাতের তালুতে ঘাম হওয়া : উদ্বেগে হাতের তালুতে ঘাম হয়, মনটা অস্থির থাকে। কিছু একটা অজানা আশঙ্কা মনকে কুরে কুরে খায়।

উদ্বেগ : সারাক্ষণ উদ্বেগে থাকা, *'কী হবে'* বা *'কেন এমন হচ্ছে'*– এই চিন্তায় মন তাড়িত হওয়া।

আত্মহত্যার প্রবণতা : জীবনে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হওয়া - মানসিক চাপের চরম পরিণতি, এবং এটি খুবই বিপজ্জনক। এমন ভাবনা আসলে অবশ্যই প্রফেশনালদের (সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট) সাহায্য নিতে হবে।

এই লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক যদি আপনার মধ্যে থাকে, তাহলে হয়তো আপনার অতিরিক্ত স্ট্রেস রয়েছে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, এবং পরবর্তী ধাপগুলোতে আমরা শিখব কীভাবে এই স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

'ওভারলোড' বা অতিরিক্ত বোঝা

আমরা আলোচনা করব কীভাবে বিভিন্ন কারণে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস তৈরি হয়, বিশেষত আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলোতে (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান) যেসব কারণে আমরা স্ট্রেস বা ডিপ্রেশনে পড়ি।

ওভারলোড কী? একটা গাড়িতে যদি পাঁচ টন পরিমাণ মালামাল নেওয়া যায়, আমরা যদি সেখানে সাত টন বা দশ টন দিই, তখন কী হবে? অবশ্যই এটা ওভারলোডেড হয়ে যাবে। সে তার পুরোপুরি শক্তি দিয়ে ঠিকমতো চলতে পারবে না। বেশি দিন ধরে যদি আমরা এটা চালিয়ে যাই, তাহলে কিন্তু ক্ষতি হবে গাড়িটার।

আমাদের শরীর নামের যে গাড়িটা আছে, সেই গাড়িটা কতটুকু চাপ বহন করতে পারে? যতটুকু চাপ সে নিতে পারে, আমরা যদি তার থেকে বেশি চাপ দিয়ে ফেলি, তাহলে কী হবে? একই অবস্থা হবে। সেটা ঠিক মতো ফাংশন করবে না এবং বেশি সময় ধরে যদি আমরা এই ওভারলোড টাকে কন্টিনিউ করতে থাকি, তাহলে কিন্তু সে বিকল হয়ে যেতে পারে। যেটা আমরা আপনাদের সাথে আগেই শেয়ার করেছি।

১. 'অতিরিক্ত কাজের' ওভারলোড

সবার প্রথম যে ওভারলোড নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত কাজের চাপ। আমরা কিন্তু আজকাল অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করছি। আমাদের জীবিকার জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। এটা একটা ব্যাপার, কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন, এই অতিরিক্ত কাজের কিছুটা হলেও আপনি চাইলে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন, ডেলিগেট করতে পারেন।

আমরা যদি আমাদের বাবাদের বা দাদাদের কথা চিন্তা করি, তারা কিন্তু এত বেশি পরিমাণ কাজ করতেন না। আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন যে তাদের স্ট্রেসের লেভেলও আমাদের থেকে অনেক কম ছিল? আজকালকার এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাপূর্ণ পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আমরা অনেক বেশি ওভারলোড নিয়ে নিচ্ছি।

বন্ধুরা, আসলেই এটা নেওয়ার দরকার আছে কি না, সেটা একটা ভালো প্রশ্ন। সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত আমরা আইডেন্টিফাই করছি কোন কোন জায়গায় ঝামেলাটা হচ্ছে।

আগের দিনগুলোতে মানুষ অনেক বেশি রিল্যাক্সড থাকতেন। তারা আরামে এবং শান্তিতে সময় কাটাতেন। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতেন, সেজন্য তাঁরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ধীরস্থির ও শান্ত থাকতে পারতেন।

ছোটবেলায় গ্রামে যাবার কথা মনে আছে? আমরা যখন গ্রামে যেতাম, খেয়াল করতাম যে ভোরের আগেই লোকজন ঘুম থেকে উঠত। রিল্যাক্সড একটা মুডে দিন শুরু হতো। নাশতা করে তারা সকাল ৯টা বা ১০টার দিকে মাঠে চলে যেত এবং বিকালের মধ্যে কাজ শেষ করত। এরপরে এসে ভাত খেয়ে ফেলত। সন্ধ্যা নামার একটু পরই এশার নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যেত। তারা লম্বা একটা রাত পেত বিশ্রামের জন্য এবং পর্যাপ্ত সময় পেত কাজ শেষ করার জন্য।

আজকে আমরা সময় খুঁজে পাচ্ছি না। অতিরিক্ত কাজের জন্য আমরা সময় বের করতে পারছি না। আগে একেকটা বাড়িতে ১০-১২ জন করে বাচ্চা ছিল, তাও তেমন কোন সমস্যা হতো না। আজকে আমরা একটা বা দুইটা বাচ্চা নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের নিজেদের কাজ নিয়েও এত বেশি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি যে কাজ যেন শেষই হতে চায় না।

আগে সবকিছু যেন নিজে নিজেই হয়ে যেত। আগে সবাই মিলে কাজ করত। এখন যার যার কাজ সে নিজে করতে চায়। অন্য কাউকে দিয়ে ভরসা করতে পারে না। ভরসার জায়গাগুলো কমে গিয়েছে। সবাই 'কাজের মানুষ' হয়ে গেছে। সারাদিন ধরে শুধু কাজই করতে থাকে। কাজের চাপ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। আশা করি এ ব্যাপারটা আপনারা রিলেট করতে পারছেন।

২. সময়ের ওভারলোড

দ্বিতীয় যে ওভারলোডের কথা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে টাইম। এখন যেন সময়ের সাথে দৌড়ে আমরা পারছি না, সময় যেন ম্যানেজ হয় না। এটা

কাজের চাপের সাথে সরাসরি রিলেটেড, তারপরও এটা আলাদা করে বলছি। সময়ের একটা চাপ আমাদের মধ্যে কিন্তু আছে। এখন সময় ম্যানেজ করা মুশকিল হয়ে যায়। আগে মানুষের সময় থাকত হাতে, তাই স্ট্রেসও কম ছিল। আবার অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। যেমন, ট্র্যাফিক জ্যামের কারণে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। মানুষের সময়জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক জায়গায় অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা করতে হয়।

টাইম ম্যানেজমেন্ট - টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো না মানার কারণে বা না জানার কারণেও আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি। অপ্রয়োজনীয় কাজ বা অল্প প্রয়োজনীয় কাজ, কম প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আমরা অনেক বেশি সময় নষ্ট করি। রাতে দিনে একই ২৪ ঘণ্টা সময় সবার জন্যই আছে, সবাই সমানভাবে পায়। সফল মানুষেরাও যে ২৪ ঘণ্টা পায়, একেবারে ব্যর্থ মানুষেরাও সেই একই ২৪ ঘণ্টা পায়। রাস্তার একজন ভিক্ষুক যে ২৪ ঘণ্টা পায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও কিন্তু সে একই ২৪ ঘণ্টা পায়। কিন্তু এই টাইমের যে ভ্যালু, এটা কিন্তু দুইজনের কাছে দুই রকমের।

তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখা এটাও খুবই প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার। তাহলে আমরা সময়ের চাপ থেকে বের হয়ে আসতে পারব। আপনি বলবেন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এর বইয়ের মধ্যে টাইম ম্যানেজমেন্ট কেন? স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যেহেতু টাইম ম্যানেজমেন্টও একটা অংশ, তাই টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা সেকশন আমাদের থাকবে। আমরা প্রথমে প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলছি। সলিউশন এখন বলছি না। এখানে আমরা আগে নিজের প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করব। তারপর ওই সলিউশনটার জন্যই আমরা কাজ করব। তাহলে ব্যাপারটা আমাদের আসলেই কাজে লাগবে। বন্ধুরা, তাহলে আমরা এটা জানলাম যে সময়ের একটি চাপ আমরা অনুভব করছি।

৩. তথ্যের ওভারলোড

অতি তথ্যের চাপ। আগে এত তথ্য ছিল না, এত ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসত না। একটা পত্রিকা থেকে আমরা ইনফরমেশন পেতাম বা বড়জোর রেডিও বা একটা ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল থেকে আমরা ইনফরমেশন পেতাম। আজকে প্রত্যেকেই একেকটি চ্যানেলের মালিক হয়ে গিয়েছে। আজকে আমাদের হাতে স্মার্টফোন চলে এসেছে।

এটা কি আমাদেরকে আদৌ স্মার্ট করছে, নাকি বোকা বানিয়ে দিচ্ছে - এটাই আমরা বুঝতে পারছি না। এত তথ্যের ফ্লো দিয়ে আমরা আসলে কী করব? আমাদের যে পরিমাণ তথ্য আসলে দরকার, আপনার কি মনে হয় না, বন্ধুরা, আমরা তার থেকে অনেক অনেক বেশি তথ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি?

এত বেশি তথ্য দিয়ে আমাদের কোন কাজ আসলে হয় না। বেশির ভাগ তথ্যই অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক কম প্রয়োজনীয়। এগুলো আমাদের সময় নষ্ট করে ফেলছে। বন্ধুরা, ব্রেইনের তথ্যের আধিক্য অনেক বেশি বেড়ে গেছে। গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব – কী নেই আমাদের তথ্যের জন্য! আরও কী কী লাগবে আমাদের?

লেখাপড়া - বাচ্চাদের লেখাপড়ার ওভারলোড হয়ে গিয়েছে। একটা বাচ্চা যে স্কুলে পড়ছে, তাকে কী পরিমাণ তথ্য গেলানো হচ্ছে! তার কি আসলেই এতগুলো তথ্য দরকার আছে? এবং আমাদের যে পরীক্ষার সিস্টেম, সেটাও তথ্য ভিত্তিক - মানে তথ্যের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে চিন্তা করতে, নতুন কিছু ভেবে বের করতে শেখানো হচ্ছে না। প্রশ্ন এবং উত্তরে কনভার্ট করে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। আজকের পৃথিবীর জন্য এ নিয়ম অনেক পুরানো ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এগুলো সব অনেক বড় বড় প্রবলেম, বন্ধুরা। অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন।

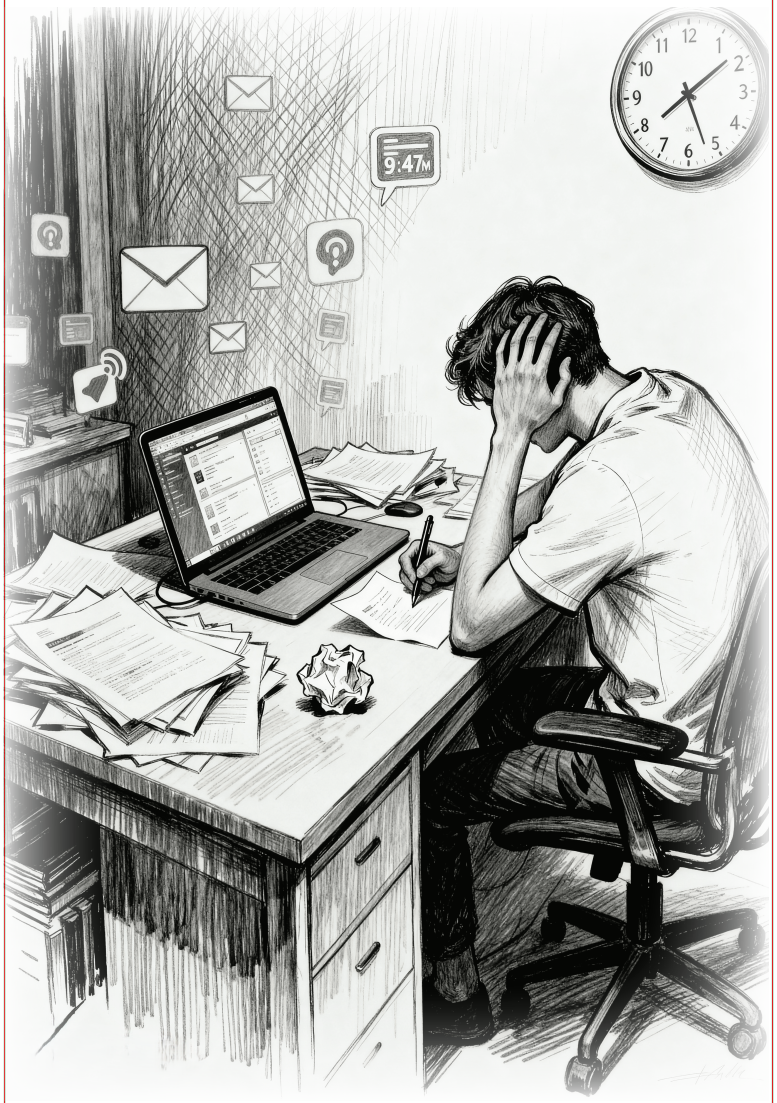

এই যে পরীক্ষা, এই যে লেখাপড়ার ওভারলোড–এটা না হলে কি হয় না? না হলে অনেক ভালো হয়। আমরা তাদেরকে শুধু শুধু অনেক বেশি তথ্যের ওভারলোডের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি এবং নিজেরাও এই মহাসমুদ্রে, তথ্যের মহাসমুদ্রে সারাদিন ধরে ডুবে আছি।

একটা গল্প মনে পড়ল, বন্ধুরা। একবার হকারদের ধর্মঘট ছিল। মানে পত্রিকা আসেনি একটা জায়গাতে, একটা শহরে। এ রকম তিন দিন ধরে কোন পত্রিকা আসেনি। তার মানে এই তিন দিন ধরে কোন খবরই আসেনি। তো, একজন স্কুলমাস্টার বলছিলেন, *'ইস! গত তিন দিন কত ভালো ছিল! সারা পৃথিবীতে কত শান্তি ছিল! কোথাও কোন খুন নাই, রাহাজানি নাই, কিছু নাই, কোন দুর্ঘটনা নাই'।* তার মানে হলো আসলে ওই ইনফরমেশনগুলো আসে নাই। আসলেই তো যদি ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে না আসে, তাহলে আমাদের কাছে ওই ঘটনাটাই ঘটে নাই। তার মানে ওই এক্সট্রা তথ্যটা দিয়ে আমাদের ব্রেইনটাকে জ্যাম করার কিন্তু আসলেই দরকার নেই। ওটা না জানলেও আমাদের কিছুই ক্ষতি হবে না, বৃদ্ধি হবে না। কিছুই হবে না। তাই না? যতটুকু আসলেই আমাদের প্রয়োজন, ততটুকু যদি আমরা তথ্য নেই, বাকিটা যদি না নেই, সেটা যদি রিজেক্ট করি, তাহলে আমাদের অনেক বেশি সময় বেঁচে যাবে। এই তথ্যের ওভারলোডের কারণে সময়ের যে স্বল্পতায় আমরা পড়ি, এইটাতে আর পড়ব না। এটা থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারব।

৪. অতি চাহিদার ওভারলোড

এরপরের ওভারলোডটা হচ্ছে অতি চাহিদার চাপ। আমাদের যতটুকু দরকার, আমরা তার থেকে অনেক বেশি চাই। আমাদের আসলে কতটুকু দরকার? একটা মানুষের কতটুকু হলে চলে?

উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে করোনা মহামারী বা প্যান্ডেমিক। এই যে আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে পড়লাম, তখন কিন্তু আমরা খরচের ব্যাপারটাতে খুব

সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। তাই না? এখন যে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে, এখন কি আমরা সেই সাবধানতাটুকু অবলম্বন করছি? করছি না। তাই না, বন্ধুরা? আমরা কিন্তু অনেক অপ্রয়োজনীয় খরচ করে ফেলছি। আমাদের চাহিদা অনেক বেশি বাড়িয়ে ফেলেছি।

এই যে দু'জোড়া কাপড়, থাকার জন্য একটুখানি জায়গা, সেটা ভাড়া বাসা হোক বা নিজের বাসা হোক, একটুখানি খাবার, একটুখানি টেকনোলজি, অল্প আসবাবপত্র–যেটা আসলেই শুধু লাগে। এইটুকু যদি হয়, আসলে কত খরচ হয়? আমি একদম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, বন্ধুরা - এবং আমি সামলে গিয়েছি। আমি শুধরে গিয়েছি। আগে যেই বাড়তি খরচটা করতাম, যে অপ্রয়োজনীয় খরচটা করতাম, এখন কিন্তু সেটা আর করি না। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এখন কিছু কিছু করে টাকা জমাতে পারছি।

এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে সামনে। আমরা ওভারলোডগুলো নিয়ে কথা বলছি। ব্র্যান্ডের জিনিস কেনার আসলেই কতটুকু দরকার আছে? যদি দরকার থাকে, তাহলে সেটা কতটুকু? এই জায়গাগুলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।

গাড়ি কেনার আসলেই কি কোন দরকার আছে? এখন তো Uber পাচ্ছেন। তাই না? দরকার হলে আপনি অবশ্যই কিনবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দরকারটা আসলেই আছে কি না, সেটা খুঁজে বের করা।

বেশি টাকা আমরা চাই। আমরা চাই আমাদের ইনকাম অনেক বেশি হোক, আমাদের সম্পদ অনেক বেশি হোক।

বন্ধুরা, একটা জিনিস কি আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? বেশি টাকা মানে কী? বেশি টাকা মানে হচ্ছে বেশি কাজ। আর বেশি কাজ মানে বেশি স্ট্রেস। এই ব্যাপারটা যদি আপনি খেয়াল করেন, তাহলে কিন্তু আপনি অনেক সাবধান হয়ে যেতে পারবেন।

আমার সাথে অনেক বেশি পয়সাওয়ালা মানুষের পরিচয় আছে। আমি তাদের জীবনকে কাছ থেকে দেখেছি। এ রকম একটা জীবন আমি চাই না। এত স্ট্রেস, এত স্ট্রেস ! যখন প্রয়োজন থেকে বেশি টাকা আপনার হয়ে যাবে, তখন যে সমস্ত স্ট্রেস আপনার লাইফে আসবে, আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না। কম টাকা যাদের আছে, তারা কখনো ওই স্ট্রেসগুলো ভাবতেই পারবে না।

তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করছি যে অতি চাহিদার চাপ এটাও আমাদের লাইফে একটা ওভারলোড। আশা করি বুঝতে পারছেন, রিলেট করতে পারছেন।

৫. অসুস্থতার ওভারলোড

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার চাপও কিন্তু বেশ বড় একটা ওভারলোড হিসেবে কাজ করে মানুষের জীবনে। আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে যে আমরা অনেকে অসুস্থ না হয়েও *'যদি অসুস্থ হই'* এইটা চিন্তা করতে থাকি এজন্য টাকা জমাতে থাকি এজন্য প্রিপারেশন নিতে থাকি *'যদি আমি অসুস্থ হই।'* না বন্ধুরা, এটা একদম ভুল - কারণ যখন আপনি অসুস্থতার চিন্তা করবেন ওই আপনার চিন্তার কারণে কিন্তু ওই ধরনের অসুস্থতা আপনার ব্রেইন আপনার শরীরকে দেবার স্টেপ গ্রহণ করবে। আপনি স্ট্রেস বাড়াবেন এবং স্ট্রেস আপনাকে অসুস্থ করে তুলবে।

তাহলে অসুস্থতার চিন্তা না করে আমরা কী করতে পারি? আমাদের লাইফস্টাইলের দিকে নজর দিতে পারি। অসুস্থতার জন্য টাকা না জমিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার জন্য টাকা জমাব। আমাদের শরীরকে কাজে লাগাব। আমরা খাবার দাবার একটু সামলে খেতে শুরু করব। ভালো খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলব। নিয়মিত ইয়োগা, প্রাণায়ামা, স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য অনেক অনেক পদ্ধতি আছে, বন্ধুরা। আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা সুস্থতার দিকে ফিরে যাব। অসুস্থতা চিন্তা করে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে টাকা কোথায় পাবো !

সে টাকা এখন জমাতে হবে। এইটা চিন্তা করতে করতেই আপনি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এটা কোনই কাজের কথা না।

অসুস্থতার চিন্তায় অসুস্থ হওয়ার মতো হাস্যকর আর কিছু নেই। একজন এসে বলল, *'ভাই, সব চুল পড়ে যাচ্ছে, টাক হয়ে যাচ্ছি।'* তো আমি যদি জিজ্ঞেস করি, *'কেন টাক হয়ে যাচ্ছেন? কেন চুল পড়ে যাচ্ছে' ?* সে বলল, *'ভাই, চিন্তায়'।* তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, *'কীসের এত চিন্তা'?* সে বলল, *'যদি সব চুল পড়ে গিয়ে টাক হয়ে যাই, সেই চিন্তা, টাক পড়ে যাওয়ার চিন্তায় চিন্তায় টাক পড়ে যাচ্ছে'!!* আমাদের ব্যাপারটা এ রকম, স্ট্রেসের জন্য স্ট্রেস করছি। যদি অসুখ হয় তাহলে কী হবে, যদি যুদ্ধ লেগে যায় তাহলে কী হবে। যদি আমার স্ট্রেস আসে তাহলে কী হবে? এক্সট্রা এক্সট্রা চিন্তা করতে করতে যদি অসুস্থ হই তাহলে কী হবে !!!

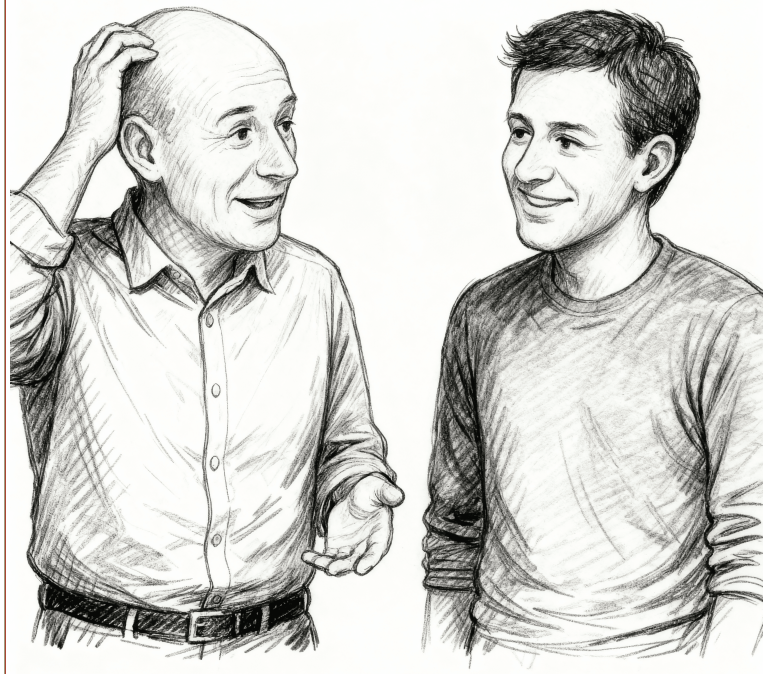

এখানে দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। একটা হচ্ছে যে, কোন জিনিসকে মোকাবিলা করার জন্য ওই জিনিসটা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তাহলে আগে জেনে নিতে হবে যে ব্যাপারটা কী।

যেমন - হার্ট অ্যাটাক আপনার হতে পারে। এটা যদি আপনার চিন্তা হয়, তাহলে হার্ট অ্যাটাক কী, কেন হয়, কীভাবে হয় জানার পর কোন কোন কাজ করলে হাট অ্যাটাক হবে না সেগুলো জানতে হবে। সেটা জেনে নেবার পর কাজ হচ্ছে সে জ্ঞানটুকু আপনার লাইফে কাজে লাগাতে হবে। মানে সে জ্ঞানের ওপর আমল করতে হবে।

একই জিনিস। আমরা এখন যে বইটি পড়ছি - স্ট্রেস কী কী করলে হয় সেটা তো আমরা জেনে নিচ্ছি। জানার পরে কোন কাজ করলে স্ট্রেস হবে না, স্ট্রেস থেকে দূরে থাকব। সেটা যখন আপনি জানবেন, তখন আপনার কাজ হচ্ছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা। সেটা মেনে চলা। মেনে চললেই কেবলমাত্র আপনি সমাধানে পৌঁছাতে পারবেন, আসলেই পারবেন।

এই পর্বটিতে আমরা জীবনের যে ওভারলোডগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। এখন আমরা জীবনের যে সেক্টর বা ভাগ থেকে স্ট্রেস আসতে পারে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করব এবং সাথে সাথে আমাদের পার্সোনাল স্ট্রেস সেগুলোকেও চিহ্নিত করব। সাথে থাকবেন।

মানসিক চাপ পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আমরা সবাই কমবেশি স্ট্রেস নিয়ে জীবনযাপন করি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্ট্রেস মাপা যায় কি? উত্তর হলো, হ্যাঁ, স্ট্রেস মাপা সম্ভব। আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) একটি স্ট্রেস মাপার পদ্ধতি তৈরি করেছে। যদিও এটি মূলত আমেরিকানদের জীবনধারার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তবুও আমরা দেখেছি যে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন করে এই পদ্ধতি আমাদের সবার জন্য কার্যকর হতে পারে।

পরের পৃষ্ঠায় আমরা আপনার জন্য একটি ছক দিয়েছি। এখানে আমরা জীবনের কিছু পরিস্থিতির কথা বলেছি। গত এক বছরে যদি এ ঘটনাগুলো আপনার সাথে ঘটে থাকে বা নিকট ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে নির্দিষ্ট নম্বরটি আপনি নিজেকে দেবেন। অবশ্যই যদি সে চাপটি আপনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন। আপনার জীবনের সঙ্গে যদি সেই পরিস্থিতিটি পুরোপুরি, অর্থাৎ একশ' ভাগ মিলে যায়, তখন আপনি সেই পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত নাম্বারটি লিখবেন। তবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন। যদি পরিস্থিতিটি আপনার জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি না মেলে, তাহলে সেই জন্য কোন নাম্বার দেবেন না। আবার, সব নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক নাম্বার লিখবেন।

প্রত্যেকটি পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমরা প্রয়োজনে কিছু ব্যাখ্যা দেব। আপনার কাজ হলো মনোযোগ সহকারে পড়ে নিজের জীবনের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা। চলুন, তাহলে শুরু করি। আপনার জীবন এবং স্ট্রেসের কারণগুলোর একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে এই প্রক্রিয়াটি আমাদের সহায়তা করবে।

এ কাজটি এখুনি করে ফেলবেন। পরে করার জন্য রেখে দিলে সম্ভাবনা বেশী যে এটি আর করা হবে না। বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলি পড়ে অ্যাকশনে যেতেও এ স্কোর আপনাকে সাহায্য করবে।

মানসিক চাপ পরিমাপ - আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

নং	জীবনের ঘটনা	স্ট্রেসের পরিমাণ	আপনার স্কোর
১	স্বামী বা স্ত্রী-র মৃত্যু	১০০	
২	বিবাহবিচ্ছেদ	৭৩	
৩	বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন (ডিভোর্স হয়নি কিন্তু আলাদাভাবে থাকছেন)	৬৫	
৪	তিন সপ্তাহের অধিক সময়ের জেল	৬৩	
৫	পরিবারের সদস্যের মৃত্যু	৬৩	
৬	বড় শারীরিক অসুস্থতা বা আঘাত	৫৩	
৭	বিবাহ (হয়েছে বা হতে যাচ্ছে)	৫০	
৮	চাকরি চলে যাওয়া/কাজ না থাকা	৪৭	
৯	বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন	৪৫	
১০	অবসর গ্রহণ (হয়েছে বা হতে যাচ্ছে)	৪৫	
১১	পরিবারের কারও স্বাস্থ্যগত বা আচরণে বড় পরিবর্তন	৪৪	
১২	গর্ভাবস্থা	৪০	
১৩	যৌন সমস্যা	৩৯	
১৪	পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন	৩৯	
১৫	ব্যবসায় বড় ধরনের পরিবর্তন	৩৯	
১৬	আর্থিক অবস্থার বড় পরিবর্তন (সম্পদ বেড়েছে বা কমেছে)	৩৮	
১৭	প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু	৩৭	
১৮	ভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করা (চাকরি থেকে ব্যবসা বা ব্যবসা থেকে চাকরি)	৩৬	
১৯	স্বামী/স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি বেড়ে যাওয়া	৩৫	
২০	বন্ধক দেওয়া (বাড়ি/গাড়ি/গহনা/ব্যবসাকেন্দ্র)	৩১	
২১	৫০ হাজার টাকার বেশি ঋণ (নিয়েছেন বা দিয়েছেন)	৩০	

২২	ঋণ শোধ করা/বন্ধক ছাড়ানোর তাগাদা	৩০	
২৩	কাজের দায়িত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন (প্রমোশন/ডিমোশন)	২৯	
২৪	সন্তানের গৃহত্যাগ (বিয়ে/লেখাপড়া) ইত্যাদি কারণে	২৯	
২৫	শ্বশুরবাড়ির মানুষদের সাথে সমস্যা	২৯	
২৬	অভাবনীয় ব্যক্তিগত সাফল্য (জাতীয় পুরস্কার, বড় কোন স্বীকৃতি)	২৮	
২৭	স্বামী/স্ত্রী-র নতুন কোন কাজ শুরু করা	২৬	
২৮	নতুন স্কুল/কলেজ/ইউনিভার্সিটি শুরু	২৬	
২৯	বসবাসের মান পরিবর্তন (নতুন বাসা/পরিবেশ/মানুষ)	২৫	
৩০	ব্যক্তিগত অভ্যাসের প্রত্যাবর্তন (আগের কোন বদভ্যাস ফিরে এসেছে এমন)	২৪	
৩১	অফিসে বসের সাথে ঝামেলা	২৩	
৩২	কর্মঘণ্টা বা কাজের পরিবর্তন	২০	
৩৩	বাসা পরিবর্তন (ভিন্ন এলাকায় চলে যাওয়া)	২০	
৩৪	স্কুল পরিবর্তন	২০	
৩৫	বিনোদনের অভ্যাস পরিবর্তন	১৯	
৩৬	ধর্মীয় বিশ্বাস/আচার আচরণে পরিবর্তন	১৯	
৩৭	সামাজিক আচরণে পরিবর্তন (ক্লাব/মুভি/দাওয়াত)	১৮	
৩৮	৫০ হাজার টাকার কম ঋণ (নেওয়া বা দেওয়া)	১৭	
৩৯	ঘুমের অভ্যাসের পরিবর্তন	১৬	
৪০	পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া	১৫	
৪১	খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন	১৫	
৪২	ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া	১৩	
৪৩	ছোটখাটো আইন অমান্য করা	১১	
	আপনার মোট নম্বর		

এবার যোগ করে নিন আপনার স্কোর :

এবার আমরা স্ট্রেস লেভেলগুলোর যোগফল নিয়ে কথা বলব। আপনার যোগফল কী বলছে তা বুঝে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি নির্ধারণ করবে আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা এবং কীভাবে আপনি এটি সামাল দেবেন।

০ (শূন্য) স্কোর: আপনার স্ট্রেস শূন্য হলে এটি অস্বাভাবিক। জীবিত মানুষ হিসেবে আপনার জীবনে কিছুটা স্ট্রেস থাকবে। শূন্য স্ট্রেস মানে হয়তো আপনি জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে আপনার ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন একটা নতুন কাজ আপনাকে এখুনি শুরু করতে হবে।

১-৫০ স্কোর : এই স্কোরটি অত্যন্ত কম স্ট্রেস নির্দেশ করে। এটি একপ্রকার 'লো ব্লাড প্রেসার'-এর মতো। এই পর্যায়ে থাকা মানুষরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় এবং তাদের জীবনে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন না। আপনাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। এটি নির্দেশ করে আপনার জীবনে কোন লক্ষ্য নেই। এটির জন্য আপনার কাজ করা শুরু করতে হবে এখুনি।

৫১-১৫০ স্কোর : এটি বেশ ভালো কিন্তু আদর্শ স্তর থেকে কম। এটি দারুণ একটি সুযোগ আপনার জন্য। এই লেভেল মানে হচ্ছে আপনি এখন নতুন কোন কাজ শুরু করতে পারেন। আপনি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে পারেন, নতুন কিছু শিখতে পারেন বা কোন নতুন বিনিয়োগ করতে পারেন। এটি একটি ইতিবাচক স্তর। এই স্তরে থাকলে আপনি স্বাভাবিক একটি মানসিক ভারসাম্যের মধ্যে আছেন।

১৫১-২৫০ স্কোর : এই স্তরটি আদর্শ। এখানে আপনি জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করতে পারবেন। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রিত এবং আপনি

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। এই স্তরটি যদি ধরে রাখতে পারেন তবে আপনি খুব প্রোডাকটিভ ভাবে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

২৫১-৩৫০ স্কোর : এটি একটি বাস্তবসম্মত স্তর। আমাদের উপমহাদেশের মানুষের জন্য এটি সাধারণ। এই স্তরে আপনি অত্যন্ত প্রোডাক্টিভ থাকবেন। তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী হওয়া উচিত নয়। একটানা এই স্তরে থাকলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৩৫১-৪৫০ স্কোর : এটি ওভার স্ট্রেস নির্দেশ করে। আপনি অতিরিক্ত চাপ বহন করছেন। এই পর্যায়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আপনার কাজ অন্যদের সাথে শেয়ার করুন, অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দেওয়া এবং নিজের শরীর ও মনের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

৪৫১+ স্কোর : এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ পর্যায়ে আপনার শরীর ও মন গভীর ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই স্তরে থাকা মানে আপনি যেকোনো সময় গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনাকে জরুরি ভিত্তিতে স্ট্রেস কমানোর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে (আপনার সাথে সবসময় একটি এম্বুলেন্স রাখবেন, যখন তখন লাগতে পারে ! - মজা করলাম, যদিও এরকম সিরিয়াস স্কোরের বেলায় মজা করা ঠিক না)।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি আপনার বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা স্ট্রেস মোকাবিলার কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

জীবনের যে সব সেক্টরে স্ট্রেস আসে

এই পর্বে আমরা মানুষের জীবনে স্ট্রেস আসার বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক যেমন একটি বড় শহরকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা হয় – ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান – তেমনই আমাদের জীবনও বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত।

স্ট্রেস আমাদের জীবনে ঠিক কোন সেক্টর থেকে আসছে এবং এটি কোন অংশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে, সেটি বুঝে নেওয়া খুবই জরুরি।

মানুষের জীবনে স্ট্রেস আসার আটটি প্রধান পথ আছে। তবে এর মধ্যে প্রাথমিক ভাবে সবচেয়ে বড় উৎস হলো অর্থনীতি ও টাকা-পয়সা সম্পর্কিত চাপ।

১. 'অর্থনৈতিক' সেক্টর

টাকা-পয়সা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার জন্য যে পানি ব্যবহার করেন, সেটাও অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়। প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থের চাহিদা কখনোই শেষ হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কত টাকা হলে আপনি স্ট্রেস মুক্ত হতে পারবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই কঠিন। কারণ আমরা জানি, টাকার চাহিদা চিরকাল থেকেই সীমাহীন। এটি আমাদের বাস্তবতা। তাই টাকার স্ট্রেস থেকে মুক্তি পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

আমরা প্রয়োজন অপ্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় খরচ করে ফেলি। শপিংমল এবং সুপারশপগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যাতে আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে উদ্বুদ্ধ হন। তাই কেনাকাটার আগে একটি নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করুন এবং সেটির বাইরে কিছু কিনবেন না। ব্র্যান্ডের পণ্য কিনতে গেলে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে কখনো কখনো 'লোক দেখানোর' প্রবণতা বেশি কাজ করে। নিজেকে প্রশ্ন করুন– আপনার এটি কেনা কি সত্যিই প্রয়োজন?

টাকা-পয়সার সঠিক ব্যবস্থাপনা শেখা খুবই জরুরি। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। যাদের অল্প টাকা আছে, তাদের যেমন চাপ বেশি, তেমনি যাদের বেশি টাকা আছে, তাদের স্ট্রেসও কম নয়। টাকা-পয়সা সম্পর্কিত স্ট্রেস থেকে মুক্তি পেতে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে।

মানি ম্যানেজমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, যা আমরা এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিশদ আলোচনা করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক স্ট্রেস কমিয়ে এমন একটি জীবন গড়ে তোলা, যেখানে আপনি মানসিক চাপমুক্ত থেকে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবেন। আসুন, এখন থেকে সচেতন হই এবং জীবনের এই সেক্টরে ভারসাম্য বজায় রাখি।

২. 'ওয়ার্কপ্লেস - কাজের জায়গা' সেক্টর

দ্বিতীয় যে সেক্টর সেটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কপ্লেস, যেখানে আমরা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কাজ করি। আপনি কি খেয়াল করেছেন যে কেউই তার কাজটা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না? যিনি ডাক্তার তিনি মনে করছেন যে আইটির মানুষ হলে ভালো হতো। যারা আইটিতে কাজ করে, তারা মনে করছেন যে ডাক্তার হলে ভালো হতো। হাসব্যান্ড মনে করেন ওয়াইফ হলে জীবনে আর কোন চিন্তাই থাকত না আর ওয়াইফ মনে করেন হাসব্যান্ড হতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যেত।

চাকরি নাকি ব্যবসা? চাকরিজীবী মনে করেন ব্যবসায়ীরা খুব ভালো আছেন। ব্যবসায়ীরা মনে করেন চাকরিজীবীরা অনেক আরামে আছেন। যিনি যে কাজটি করেন তিনি সেটাকে কঠিন মনে করছেন এবং অন্য একটা কাজকে সহজ মনে করছেন। এটি হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ। এভাবেই আমাদের ওয়ার্কপ্লেস হয়ে ওঠে স্ট্রেস আসার অন্যতম প্রধান পথ।

ডাক্তার ভাবছেন, *'আইটির মানুষের কী মজা! সারাদিন কম্পিউটারের সামনে কী-সব করে! সারাক্ষণ গেমই খেলে মনে হয়'*, তাই না? আর আইটির মানুষ মনে করছেন, *'সারাদিন এই কম্পিউটারের সামনে বসে বসে চোখ নষ্ট করে, জীবন ধ্বংস করে চলেছি। কী পরিমাণ যে প্রেশার! সবাই মনে করে তাদের সব কাজই হচ্ছে আইটির মানুষের কাজ'।*

আমি ব্যক্তিগতভাবে আইটি জগতের মানুষ। আমি জানি এটা কী পরিমাণ হেক্টিক হতে পারে, আবার কী পরিমাণ মজার-ও হতে পারে।

ডাক্তার কী বলেন? কী একটা প্রফেশন, রাত দিন বলে কিছু নাই। রাত ৩টায় ডাকলেও আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। কোন ছুটি নাই। বাচ্চাদেরকে সময় দিতে পারছি না। সব রকমের অসুবিধা এই ডাক্তারির মধ্যে আছে।

সরকারি অফিসার সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ী কী মনে করছেন? ব্যবসায়ী মনে করছেন, আহ্! কী সুন্দর চাকরি। সকালবেলা সরকারি গাড়ি করে অফিসে চলে যাওয়া। সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। দেশ কোথায় গেল-দুনিয়া কোথায় গেল না গেল, এটা নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নাই। করোনা প্যান্ডেমিকের সময় সবচেয়ে মজায় ছিল সরকারি চাকুরিজীবীরা। মাস শেষে বেতন তো চলে আসছে, বোনাস চলে আসছে। সমস্ত সরকারি ছুটিগুলো পাচ্ছে। মজাই মজা! কী যে মজা! আমরা টাকা ইনকাম করি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কত মানুষের সাথে যোগাযোগ করে, কত রকমের কায়দা কানুন করে আমাদেরকে ব্যবসাটা করতে হয়। কর্মচারীদের সামলানো কি সোজা কথা? লাভ হয়তো হয়। যদি কখনো লস হয়, তাহলে তো একেবারে অনেক দিনের লাভ সব একসাথে নিয়ে চলে যায়। প্রতি মাসের শেষে চিন্তা শুরু হয় - কর্মচারীর বেতন, দোকান ভাড়া, কত কত বিল পরিশোধ করতে হবে। কী অনিশ্চিত একটা জীবন!

আর সরকারি কর্মকর্তা কী চিন্তা করছেন? ব্যবসায়ী হলেই ভালো হতো। চাকরি করে সীমিত আয়ের মধ্যে কষ্ট করে চলতে হয়। মাসের ১০ তারিখ শেষ হতে না হতেই পকেট খালি। ব্যবসায়ীরা কত ভালো আছে। প্রতিদিন টাকা আসে। আনলিমিটেড ইনকাম, ইচ্ছা হলে অফিস যাও, ইচ্ছা না হলে যাওয়ার দরকার নেই, কত স্বাধীন একটা জীবন, ইস্, ব্যবসায়ী হতে পারতাম!

এভাবে একেকজন প্রফেশনাল অন্য একজনের প্রফেশন সম্পর্কে ধারণা করছেন এবং তার নিজের যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ক্রমাগত আফসোস করে যাচ্ছেন।

হাসব্যান্ড কী মনে করছেন? তিনি মনে করছেন - *'ওয়াইফ-টা সারাদিন বাসায় বসে থাকে। তার কোন কাজ নাই। সারাদিন টিভি সামনে বসে বসে রিমোট টিপে আর ফেসবুক-ইউটিউব চালায়। আমি কত কষ্ট করি। সারাদিন অফিসে থাকি, কত মিটিং, ক্লায়েন্ট সামলানো, বস সামলানো, কত কাজ করতে হয়, কত দায়িত্ব, কত জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। তার ওপর বসের ঝাড়ি - সেটা তো ফ্রি - কত রকমের ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়'।*

আর ওয়াইফ কী মনে করেন? *'ইস! যদি হাসব্যান্ড হতে পারতাম। সে কী করে? সে গাড়িতে করে অফিসে চলে যায়। অফিসে গিয়ে কিছু পেপার সাইন করে, আর বসে বসে আড্ডা মারে আর চা-কফি খায় সারাদিন। আর আমি দেখো, আমি বাসায় সারাদিন কত কাজ করি। রান্না আমাকে সামলাতে হয়। কাজের বুয়াদের দেখাশোনা করতে হয়। বাচ্চাদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নিতে হয়। বাচ্চাদেরকে সময় দিতে হয়। কত কিছুই না করতে হয়'।*

তাহলে ওয়াইফ তার জায়গা থেকে হ্যাপি না। সে হাসব্যান্ড হতে চায়। আর হাসব্যান্ড মনে করে ওয়াইফ কত সুখে আছে।

এইরকম আমরা সবাই যার যার দিক থেকে অন্য মানুষের পজিশনকে অনেক বেশি জেলাস করি এবং সেখান থেকে আমাদের লাইফে অনেক বেশি স্ট্রেস চলে আসে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজকে অপছন্দ করছে এবং অপরের কাজকে ভালো মনে করছে।

একজন মানুষ যিনি রিটায়ার করবেন, তিনি মনে করছেন, *'কতই-না ভালো ছিলাম এতদিন চাকরিতে ছিলাম। কাজে থাকতাম সারাদিন। আমি এখন সারাদিন কী করব?'* সেই রিটায়ারমেন্টের স্ট্রেসে-যন্ত্রণায় তারা তাদের ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে ফেলেন।

আবার একই রিটায়ার আরেকজন মানুষ করতে যাচ্ছেন। তিনি মনে করছেন, *'ওয়াও! শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্রণার চাকরি শেষ হচ্ছে। এই ফালতু কাজ আর করতে হবে না। সারাদিন অফিসে বন্দী থাকতে হবে না। এখন আমার ছুটি। সারাজীবনের জন্য ছুটি। কী-যে মজা করব! সকালে পত্রিকা পড়ব, হাঁটতে বের হব, তারপর বাসায় এসে একটা ঘুম দেবো। বই পড়ব, নাতি নাতনিদের সাথে খেলব, জীবনটাকে উপভোগ করব।'*

দেখেন, দুইজন কিন্তু দুই রকমের চিন্তা করছেন। একজন মনে করছেন যে রিটায়ারমেন্ট-টা এনজয় করতে পারব না। আরেকজন যিনি সারাজীবন ধরে কাজটাকে হেইট করতেন, তিনি চিন্তা করছেন যে এইবার এই ফালতু কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হলো, কে আসলে রাইট? কেউ ঠিক না - আবার কেউ ভুলও না। যখনই আপনি এই মুহূর্তে যা করছেন, এই জিনিসটাকে এনজয় করতে পারবেন, এ ব্যাপারটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন। আপনার বর্তমানে কাজের যে জায়গা, সেটা যাই হোক না কেন, সেখানে আপনি ভালো থাকবেন এবং ভালো করবেন।

আপনার বর্তমানের কাজের যে জায়গাটা, সেটা বিজনেস হোক, জব হোক, আপনি হাসব্যান্ড হোন, আপনি ওয়াইফ হোন, যাই হোন না কেন, সেই কাজটাকে যখন আপনি মন থেকে এনজয় করতে পারবেন, তখনই আপনার এই ওয়ার্কপ্লেস এর স্ট্রেসটা কমতে শুরু করবে। আপনার মধ্যে একধরনের শান্তি চলে আসবে। ওয়ার্কপ্লেসের স্ট্রেস কমানোর পদ্ধতি নিয়ে পরের পর্বে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো।

৩. 'সম্পর্ক এবং পরিবার' সেক্টর

সম্পর্কের ইমোশন আমাদের সাথে জড়িয়ে থাকে বাসার প্রত্যেকটা মানুষের সাথে। এই জায়গা থেকে অনেক বেশি আনন্দ বা স্ট্রেস দুই-ই আসতে পারে। তাহলে প্রশ্নটা এ রকম হতে পারে–আচ্ছা, তাহলে কি ফ্যামিলি আসলেই দরকার? না থাকলে কী হয়? তাহলে তো খুব মজা হয়, মাথাও নাই - মাথা ব্যথাও নাই। ফ্যামিলি না থাকলেই ভালো থাকব।

ফ্যামিলির অন্যান্য মানুষদের সাথে ইমোশন কানেক্টেড থাকে। তাদের সাথে একধরনের বন্ডিং থাকে, যে বন্ডিংটা আমাদের জন্য খুব দরকার। কারণ মানুষ হচ্ছে সামাজিক প্রাণী। মানুষ একা একা বাঁচতে পারে না। অসুস্থতার সময় কিন্তু ফ্যামিলি সাংঘাতিকভাবে আমাদেরকে হেল্প করে। ফ্যামিলির আসল ভ্যালুটা কিন্তু তখন বুঝতে পারি যে একটা ফ্যামিলি আসলেই মানুষের জীবনের জন্য কতটা দরকার।

পরিবার সহ যেকোনো সম্পর্ক উন্নয়নের টেকনিকগুলো সম্পর্কে এই বইয়ের পরবর্তী চ্যাপ্টারে আরও বিস্তারিত কথা বলব। আপাতত কিছু হিন্ট দিয়ে চলে যাচ্ছি। অন্য মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা – আপনার ফ্যামিলিতে অন্যান্য যারা আছেন, পরিবারে সদস্য যারা আছেন, তাদের বড় করে দেখা। আমরা এখন থেকে যদি নিজেদেরটা বাদ দিয়ে অন্য মানুষ কী চায়, অন্য মানুষ কী পেলে খুশি হবে, সেই ব্যাপারটা যদি একটু খেয়াল করতে পারি, অন্য মানুষের ইন্টারেস্ট নিয়ে যদি আমরা ইন্টারেস্টেড হই, তাহলে কিন্তু ফ্যামিলি প্রবলেমগুলো মিটে যাবে। এই ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে খুব সুবিধা হবে।

হাসব্যান্ড অফিস থেকে আসলো। খুব খুশি, জানো আজ অফিসে কী হয়েছে- কথাটা বলতে যাবে - কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রেগে আগুন তুলকালাম – *'তোমার অফিসের গল্প বাসায় বলবে না ! অফিসে কী হয়েছে, সেটা অফিসে রাখ। অফিসের গল্প বাসায় এসে বলার কী আছে? অফিস কেন বাসায় নিয়ে আসো'?*

অনেক খুশি হয়ে অনেক আগ্রহ নিয়ে সে বলতে এসেছিল যে তার একটা প্রমোশন হয়েছে বা সে একটা বড় কাজ পেয়ে গেছে সেই খুশির খবরটা দিতে গিয়ে মুখ খোলার সাথে সাথে কী যে হয়ে গেল - বউয়ের ঝামটা খেয়ে ফেলল। তারপর ওয়াইফটি বলল - *'গ্যাসের চুলা যে নষ্ট হয়ে আছে সেটা তোমাকে আর কতবার বলতে হবে...'* তারপর বলল -

'শপিং যে করতে হবে কতদিন ধরে বলছি তোমার কি হুঁস জ্ঞান নাই...' এই ধরনের কথা শুনে তখন কি আর মন মেজাজ ঠিক থাকে? ঠিক থাকে না, তাই না? যে দারুণ খুশির একটি সংবাদ দেওয়ার কথা ছিল সেটা মাঠে মারা গেল।

একই উদাহরণ ভিন্নভাবে শোনা যাক। কলিং বেল বাজল। স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। লোকটি বলল *'জানো আজ অফিসে কী হয়েছে?'* তখন স্ত্রী বলল, *'আচ্ছা কিছু স্পেশাল হয়েছে নাকি - মনে হয় তোমার যে বড় কাজটি পাওয়ার কথা ছিল সেটি পেয়ে গিয়েছ?'* হাজব্যান্ড বলল - *'ইয়েস, ঠিক তাই।' 'ওয়াও ! দারুণ খবর ! বল তো কীভাবে কী হলো? দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে চা নিয়ে আসি।'* তারপর তারা অনেক খুশি হল। ওয়াইফ চা নিয়ে আসলো, চায়ের সাথে 'টা' নিয়ে আসলো। সবাই মিলে গল্প করল। তারপর সেই লোকটা কত পরিশ্রম করে কত দিনের কষ্টের পরে কীভাবে কন্ট্রাক্টটি পেলেন বিস্তারিত সে ঘটনা বললেন। তারপর বললেন, *'চল, তোমার না শপিং ছিল? আজ শপিং করব। আচ্ছা, চুলাটা না ঝামেলা করছে, আজ সেটাও ঠিক করে আনি।'*



এই যে ব্যাপারটি যদি আমরা খেয়াল করি - যখনই ওই ওয়াইফটা তার হাজব্যান্ডের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হল হাজব্যান্ডও তখন ওয়াইফের যে ইন্টারেস্ট সেটাতে ইন্টারেস্টেড হল। একটা মজার জিনিস খেয়াল করেন - আপনি যা দেবেন তাই পাবেন যেভাবে দেবেন সেভাবেই পাবেন। আপনি যেই জিনিসটা দেবেন, যেটা প্রকৃতিতে ছাড়বেন - সেটি কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক বা যখনি হোক না কেন, আপনার কাছে ফিরে আসবে। আপনি যখন অন্যের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবেন অন্য মানুষও আপনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবে।

আপনি এখন থেকে অন্য মানুষের ইন্টারেস্ট নিয়ে ইন্টারেস্টেড হবেন। আপনি যখন বাচ্চার সাথে কথা বলবেন তখন তার খেলা নিয়ে কথা বলবেন, তার ক্রিকেট নিয়ে কথা বলবেন। আপনি যখন ওয়াইফের সামনে যাবেন ওয়াইফের যেই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লাগে, ওয়াইফের যে জিনিসটা মজা লাগে - সেই জিনিসটা নিয়ে তার সাথে কথা বলবেন। আপনার হাসব্যান্ডের সাথে যখন কথা বলবেন তার ইন্টারেস্টের বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। পারিবারিক স্ট্রেস থেকে নিজেকে মুক্ত করার খুবই সহজ এবং খুবই ম্যাজিক্যাল একটি সমাধান। সিক্রেট বললাম আপনাদেরকে।

৪. 'ভালোবাসা' সেক্টর

বন্ধুরা, আমরা পশ্চিমা দেশগুলোকে ফলো করি। ভালোবাসার অভাব একসময় তাদের প্রবলেম ছিল, কিন্তু আমাদের এখানে ভালোবাসার কখনো অভাব ছিল না। আমরা পরিবার কেন্দ্রিক মানুষ ছিলাম। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল।

পৃথিবীতে আপনি যা দেবেন, তা-ই পাবেন। আপনি যদি ঘৃণা ছড়ান, মানুষ আপনাকে ঘৃণা করবে। আর যদি ভালোবাসা দেন, ভালোবাসা ফেরত পাবেন। সবার হয়তো ভালোবাসা প্রকাশ করার টাইপ একরকম নয়।

কেউ হয়তো খুব উচ্ছাস করে প্রকাশ করবে, আবার কেউ চুপচাপ থাকবে। ব্যাপারটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। তবেই ভালোবাসা সম্পর্কিত স্ট্রেস আমাদের লাইফে কম আসবে।

ভালোবাসা পাওয়ার আশা না রেখেই ভালোবাসা দিয়ে যাবেন। বিশেষ করে পরিবারের লোকজন থেকে ভালোবাসা পাওয়ার আশা করলে নিশ্চিত ধরা খাবেন। শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার আশা করবেন।

৫. 'সামাজিক স্বাস্থ্য' সেক্টর

কিছু কাজ আমরা এখন থেকে নিঃস্বার্থভাবে করব। চাইব না কিছু। এমন কাজ করব, যার প্রতিদান এই দুনিয়াতে আশা করব না। সব জিনিসের প্রতিদান যদি চাইতে থাকি, তাহলে আমরা স্ট্রেসফুল হয়ে যাব। নিঃস্বার্থ কাজ যেখানে কোন প্রত্যাশা থাকবে না। মানুষকে সাহায্য করে যে মানসিক শান্তি পাবেন, তা অকল্পনীয়।

আপনি মানুষকে সাহায্য করবেন এবং ভুলে যাবেন। এটা কঠিন কাজ, কিন্তু অত্যন্ত মজাদার। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এমন অনেক কিছু আছে, যা আপনি টাকা ছাড়াই দিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, একজন বয়স্ক মানুষকে রাস্তা পার করিয়ে দেওয়া। এতে কোন খরচ নেই। এ ধরনের অনেক কাজ আছে, যা ভালোবাসা ছড়াতে সাহায্য করবে।

উপকারী পরামর্শ দিয়ে উপকার করা যায়। এ ধরনের কাজ করলে আপনার জীবনে ভালোবাসার আর কোন অভাব থাকবে না। আপনি ভালোবাসা দিয়ে যাবেন এবং ভালোবাসা পাবেন।

আমরা সমাজের মানুষের সাথে মিশব। কিপটামি করব না। মানুষের জন্য আশীর্বাদ ছড়াব। তাদের উৎসাহ দেব। মানুষের সাথে কানেক্ট করব। কত রকমের মানুষ আছে! যখন আপনি অন্যের জন্য কিছু করবেন, দেখবেন আপনার জীবন অনেক আনন্দে কাটবে। ভালোবাসা ছড়ানো এবং গ্রহণ করার অভ্যাস আমাদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

৬. 'অহংকার' সেক্টর

এই জায়গা থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশি স্ট্রেস আসে বন্ধুরা। আমাদের ইগো আমাদেরকে এগোতে দেয় না। সবসময় আমরা কেন যেন অন্য মানুষের পেছনে লেগে থাকি। অন্য মানুষকে আঘাত করতে আমাদের কেন জানি অনেক বেশি মজা লাগে।

এটি যতগুলো প্রবলেম আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। ইগো বা অহংকার মানে হচ্ছে – আমরা মানুষের সাথে রাগ করি, ঝগড়া করি, চিৎকার করি। কেন? কারণ আমি মনে করি আমি হচ্ছি একমাত্র 'মিস্টার রাইট।' আবার অন্যজনের কাছে সেই জিনিসটা ভুল। সে কথাটা ভুল। People are not wrong, they are different কেউ ভুল নন, সবাই ভিন্ন।

'আমারটাই সবসময় ঠিক'–এই ব্যাপারটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এটি পরিবারের সম্পর্কের ব্যাপারে হতে পারে। এটি ধর্মীয় ব্যাপারে হতে পারে। এটি রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে। আমার দৃষ্টিই যে সবার দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হবে, ব্যাপারটা সে রকম নয়। অন্যের সাথে সহ অবস্থানের যে ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই অহংকার থেকে আমরা নেমে আসতে পারব। সবসময় আমি ঠিক, এই ধারণাটা সঠিক নয়। আমি ঠিক না-ও হতে পারি।

নিজের কথা বলি। ধর্মীয় ব্যাপারে আমার একধরনের কিছু আইডিয়া ছিল। সব জেনে গেছি, এমন একটা ধারণা পোষণ করতাম। জীবনের এক পর্যায়ে নতুন ধরনের কিছু প্রশ্ন আমার মনে আসল। তখন আমি নিজে একটু লেখাপড়া করলাম এবং আরও অন্য রকমের কিছু মানুষের সাথে যুক্ত হলাম। তাদের কথা শুনে মনে হলো, এতদিন যা মনে করতাম, সেগুলো সবকিছু ভুল ! একদম ভুল !!

তাহলে কি সবকিছু ভুল? এভাবে যতই দিন যাচ্ছিল, নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হচ্ছিল, দেখা হচ্ছিল, নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম - আমি যে নিজেকে ঠিক আর সবাইকে ভুল মনে করছি - এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। যখন আপনি নিজেকে সবচেয়ে বেশি ঠিক মনে করবেন, absolutely right মনে করবেন, তখনই জানবেন – আপনি ভুল পথে আছেন। আপনাকে তখন আরেকটু লেখাপড়া করতে হবে। তবে সেটি হতে হবে unbiased - পক্ষপাত মুক্ত। আপনি যদি আপনার আগের কনসেপ্টকে absolute right মনে করে লেখাপড়া করেন, ভেরি সরি টু সে - সেটা তেমন একটা কাজে দেবে না।

এটা যখন বুঝতে পারবেন, তখন জানবেন যে অহংকার করার আসলে কিছু নেই। অহংকার শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই সাজে। তিনি এত জ্ঞান সৃষ্টি করে রেখেছেন যে সেগুলোর ক্ষুদ্রতম ধারণাও মানুষ করতে পারে না। তার সে যোগ্যতাই নেই। অহংকার করা মানুষের শোভা পায় না। মানুষ অনেক ক্ষুদ্র জীব। মানুষকে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি দুর্বলতাও দেওয়া হয়েছে।

এই স্ট্রেস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, অন্যের কথা রিসিভ করার মতো ধৈর্য রাখতে হবে। অন্য মানুষ যেকোনো কথা বলতে পারে, সেই কথাটা রিসিভ করার মতো মানসিকতা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। তার এক্সপেরিয়েন্স থেকে ঠিক কথাই হয়তো বলছে, হয়তো আমি ধরতে পারছি না। সত্যিকারের অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা মানুষকে এখন থেকে করব। অন্যের ভালো জিনিসে আমরা নজর দেব এবং নিজের যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলোর দিকে নজর দেবো। কিন্তু আমরা করি ঠিক উল্টো-টা, অন্য মানুষের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বেড়াই এবং নিজের যে স্ট্রং পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোর দিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

তাহলে আমরা এখন থেকে করব কী? ঠিক উল্টোটা। আমরা নিজের কমজোরি গুলির দিকে তাকাব।

৭. 'শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য' সেক্টর

নেক্সট যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে স্ট্রেস আসে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য। আমরা কী করি? আমরা টাকার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে স্বাস্থ্য নষ্ট করি।

আমাদের ঘুমের সময় ঠিক থাকে না। আমাদের খাবারের অভ্যাস ঠিক থাকে না। এভাবে করতে গিয়ে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করি। সেই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে যে টাকা ইনকাম করেছিলাম, সেগুলো সব নষ্ট করে ফেলি।

আমরা মানুষের সাথে ঝামেলায় জড়াই। অনেক সময় আমরা দুর্নীতি করি। দুর্নীতি করে যে পরিমাণ টাকা ইনকাম করি, তা আবার মানুষের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করে হারিয়ে ফেলি।

তাহলে আমাদের কী করতে হবে? আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা–শারীরিক এবং মানসিক–এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না। জ্ঞান এর সাথে চেষ্টাটাও থাকতে হবে।

আমরা এখানে আরেকটা পর্বে স্বাস্থ্য নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বেসিক নলেজ আমাদের দরকার। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অন্য একটি চ্যাপ্টারে বিস্তারিত বলবো।

৮. 'আধ্যাত্মিকতা' সেক্টর

আধ্যাত্মিকতার মানে হচ্ছে একজন সৃষ্টিকর্তার ওপরে আপনার বিশ্বাস রাখা। যে মানুষগুলি সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, সে অবধারিতভাবে আধ্যাত্মিকতার অভাব বোধ করে। আপনি যাকেই সৃষ্টিকর্তা মানেন না কেন, আপনি তার ওপর ভরসা করতে পারবেন। যখন আপনার অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে না, আপনি কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারবেন না, আপনি নিরুপায় হয়ে যাবেন, তখন একজন সুপ্রিম যে সত্ত্বা তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারার মতো স্ট্রেস ফ্রি হওয়ার আর কোন পদ্ধতি নেই। একজন সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস এবং তার ওপর ভরসা রাখতে হবে যে ভালো থাকলে ভালো, আর কষ্টে থাকলে আরও ভালো। কেন কষ্ট থাকলে ভালো? কারণ এই কষ্টটা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পরীক্ষা করেন এবং আমাদের অনেক কিছু শেখান।

যে ধর্মগ্রন্থ আপনি অনুসরণ করেন, সেটি পড়ুন। সেখান থেকে সরাসরি শিখুন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে আমরা শিখব এবং সেটি পালন করার চেষ্টা করব। আমরা একটি জায়গায় খুব বড় ভুল করি, সেটি হচ্ছে ধর্মাচরণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে আর খেয়াল করি না। ধর্মের মূল স্পিচ বা মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। সহ্য করার ক্ষমতা নিজের মধ্যে তৈরি করা, মাফ করে দেওয়ার অভ্যাস, ভালোবাসা এবং দয়া, নম্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা–এই সবকিছুই আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মনটাকে স্থির রাখা, এটি আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পরিবর্তন আসতে থাকবে, পরিবর্তন এক্সেপ্ট করতে হবে, কারণ এগুলো সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে আসে। তিনি না চাইলে কিছুই হয় না।

আমাদের রাগ কমাতে হবে, লোভ কমাতে হবে, ঈর্ষা কমাতে হবে। খুব বেশি এটাচমেন্ট কমাতে হবে। এমন কোন জিনিস নেই যেটা ছাড়া আপনার চলবে না। আপনার আসলে যেটা ছাড়া চলবে না, সেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার দয়া। প্রতিশোধপরায়ণতা, অন্য কারও উপর রিভেঞ্জ নেওয়ার যে মানসিকতা আমাদের সেখান থেকে সরে আসতে হবে। অহংকারও একটি সাংঘাতিক জিনিস। অহংকার থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

নেক্সট আরেকটা এক্সট্রা জিনিস বলছি, সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে অতি ভাবনা। এটা একটা নাম আছে, এটা হচ্ছে ক্রনোফোবিয়া। যদি যুদ্ধ লাগে - তাহলে কী হবে? যদি আবার কোন মহামারী আসে করোনা ভাইরাসের মতো - যদি জব চলে যায়, তখন কী হবে? যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কী হবে - কী আর হবে? আমরাও ধ্বংস হব পৃথিবীর সাথে। ফোবিয়া ক্রনিক আকার ধারণ করতে পারে এবং আমাদেরকে মহা স্ট্রেসে ফেলে দিতে পারে।

আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তা করতে থাকেন এবং কোন কাজই করতে পারেন না। খবর সংগ্রহ করতে থাকেন যে আগামী দশ বছরের পৃথিবীর কী হবে। আজকে আমি কী কাজ করলাম? এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমাদের চিন্তা থাকে না।

অপ্রয়োজনীয় স্ট্রেস আমরা নেব না। অবশ্যই কাজ করব। দায়িত্ব নেব, স্ট্রেস না নিয়েও কিন্তু কাজটা করা যেতে পারে। শুধু স্ট্রেস নিতে হবে না। আমরা কি পরিস্থিতি বদলে ফেলতে পারব বা ভবিষ্যৎ বদলাতে পারব, না, পারব না, আমরা কী করতে পারব? আমরা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হতে পারব। আমরা কাজ করতে পারব। আপনি আপনার জীবনে যেখানে পৌঁছাতে চান, সেখানে পৌঁছানোর জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো কি আপনার কাছে লিস্ট করা আছে? কী কী করবেন? আগামী এক মাসের গোল কি আপনার হাতে আছে? আগামী বছরের গোল কি আপনার হাতে আছে? যদি না থাকে, এখুনি সেটা করে নিন। তারপর কাজে নেমে পড়ুন। ওয়ার্কশপ আছে, প্রচুর বই আছে এ বিষয়ে সেগুলো আপনি পড়ে নিতে পারেন। আমাদের আবহাওয়া, রাজনীতি, যুদ্ধ, মহামারী, পরিবার, স্ত্রী, সন্তান–আমরা কাউকে চেঞ্জ করতে পারব না। আমরা যদি কাউকে চেঞ্জ করতে পারি, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের মনোভাব বা অ্যাটিটিউড। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনার প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে পারি এবং সেভাবেই স্ট্রেস থেকে বের হয়ে আসতে পারি।

চলুন একটু রিভিউ করি স্ট্রেস আসার পথগুলোর।

- অর্থনৈতিক
- কাজের জায়গা বা ওয়ার্কপ্লেস
- পরিবার ও অন্যান্য সম্পর্ক
- ভালোবাসা
- সামাজিক অবস্থান
- অহংকার বা প্রাইড
- শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা
- আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টিকর্তার সাথে কানেকশন
- ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনা ক্রনোফোবিয়া

তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত আসার যে সেক্টরগুলো আছে, সেগুলো জানলাম। আসুন, দেখি এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ একেকটা জিনিস ধরে ধরে এর সমাধানের দিকে যাই।

অ্যাকশন প্ল্যানিং

স্ট্রেস চার্টে আমার প্রাপ্ত স্কোর :

আমাকে স্কোর বাড়াতে হবে ☐ কমাতে হবে ☐ ঠিক আছে ☐

আপনার জীবনে কোন কোন সেক্টর থেকে এই মুহূর্তে স্ট্রেস আসছে ?

সবচেয়ে বেশি স্ট্রেসের সেক্টরটি সবার ওপরে রেখে ক্রমানুসারে সাজান।

স্ট্রেসের সেক্টর	আপনার স্ট্রেস আসার পথ (ক্রমানুসারে)
টাকা পয়সা	১.
কাজের জায়গা বা ওয়ার্কপ্লেস	২.
পরিবার ও অন্যান্য সম্পর্ক	৩.
ভালোবাসা	৪.
সামাজিক অবস্থান	৫.
অহংকার বা প্রাইড	৬.
শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা	৭.
আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টিকর্তার সাথে কানেকশন	৮.
ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনা (ক্রনোফোবিয়া)	৯.

আপনার বর্তমান মানসিক চাপগুলো চিহ্নিত করে এই পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখুন-

নোট -

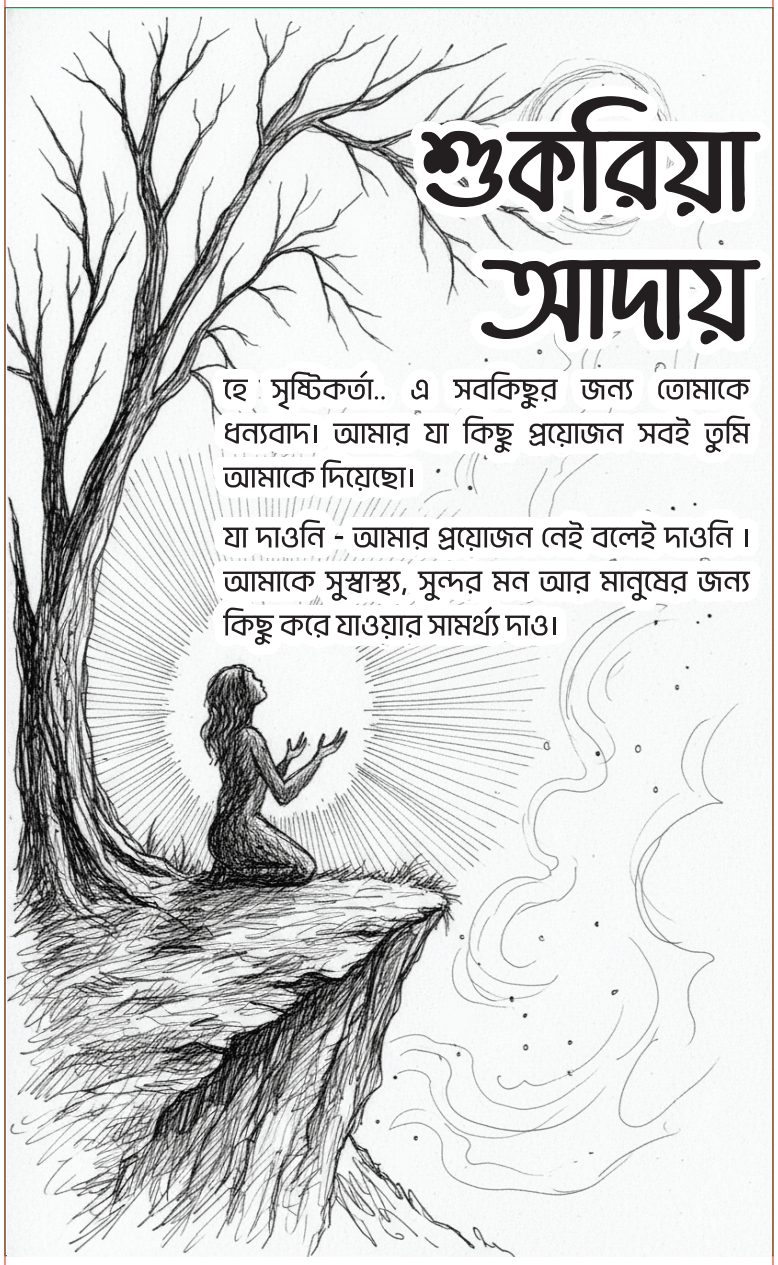

আমরা ইতিমধ্যে স্ট্রেস সম্পর্কিত সম্ভাব্য সমস্যা, সেগুলো আসার কারণ, পথ সবকিছু নিয়ে কথা বলেছি। এখান থেকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সমাধানের দিকে যাব। এই অংশটুকু কিন্তু অনেকটুকু প্র্যাকটিক্যাল হবে। মানে, আমি আপনাদেরকে কিছু কাজ দিয়ে দেবো, সেই কাজগুলো আপনারা করবেন। যেমনটি বলছিলাম, স্কিল শেখার যে ওয়ার্কশপগুলো হয়, সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজে না লাগার কারণ হচ্ছে যে কাজগুলো দেওয়া হয়, সেগুলোই আমরা করি না। সব মোটা মানুষই জানে, ওজন কীভাবে কমাতে হয়, কিন্তু আসলে কমায় কয়জন?

যদি আপনি কাজগুলো ঠিকমতো করেন, তখন কী হবে? আপনি ফলাফল কিছু না কিছু একটা তো পেতে শুরু করবেন এবং যেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবারও আলোচনাটা চালিয়ে যেতে পারব। সলিউশন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আলোচনা চালাতে পারব, ভিন্ন ভিন্নভাবে চেষ্টা করতে পারব। কিন্তু যদি আপনি কাজই না করেন, তাহলে কিন্তু ওখানেই আমরা আটকে যাব। তাই না?

শুকরিয়া আদায়: স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়

সবচেয়ে কার্যকর স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট টুল হলো শুকরিয়া আদায় করা। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যত বই লেখা হয়েছে, যত কোর্স তৈরি হয়েছে, সেগুলোর মূল বার্তা একটাই—যা কিছু আপনার জীবনে আছে, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শুকরিয়া আদায় কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তবিক উপায়ে আমাদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

আমাদের জীবনে লক্ষ্য থাকবে, আকাঙ্ক্ষা থাকবে, চাহিদা থাকবে। এগুলো থাকা জরুরি, কারণ এগুলো আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবে সেইসঙ্গে আমাদের যা কিছু ইতোমধ্যে আছে, তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আমরা যা কিছু অর্জন করেছি, তা অবমূল্যায়ন করি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের জীবনে অনেক কিছু এমন আছে, যা আমরা না চাইতেই পেয়েছি।

শুকরিয়া গোপন করা বা স্বীকার না করাই হচ্ছে কুফরি - মহান আল্লাহ'র কথা অনুযায়ী। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে - আমরা যদি যথাযথ শুকরিয়া আদায় না করি তবে আমরা কুফরি করলাম। যে কুফরি করে তাকে কী যেন বলে? আমরা কি আমাদের সাথে এ শব্দটি সহ্য করি, 'কাফির' শব্দটিকে আমরা নিকৃষ্টতম গালি মনে করি, যদি সৃষ্টিকর্তা নিজেই আমাদেরকে *'কাফির'* বলেন তবে সর্বনাশের আর কি কিছু বাকি থাকে?

শুকরিয়া আদায়ের প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। প্রথমত, আমরা প্রতিদিন কৃতজ্ঞতার চর্চা শুরু করতে পারি। প্রতিদিন সকালে বা রাতে এমন বিষয় নিয়ে ভাবতে পারি, যা নিয়ে আমরা কৃতজ্ঞ। এটি হতে পারে স্বাস্থ্য, পরিবার, কাজ, প্রকৃতি, বা অন্য কিছু। এই অভ্যাসটি আমাদের মনোভাবকে ইতিবাচক করে তুলবে। জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। এটি হতে পারে একটি সুন্দর সকালে হাঁটার সুযোগ, একটি ভালো খাবার, বা বন্ধুদের সাথে একটি আড্ডা মুখর বিকেল। এটি যে কোন কিছু হতে পারে - খুঁজে দেখুন আপনার চারপাশে, খুঁজে দেখুন আপনার নিজের ভেতরে, খুঁজুন আপনার মনের গভীরে। আপনি কখনো সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবেন না। তাঁর নিয়ামতে পরিপূর্ণ এ ত্রিভুবন। *'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?'* - ***কুর'আন - সূরা আর রাহমান***

জীবনের সমস্যাগুলোকে শিক্ষার সুযোগ হিসেবে দেখতে পারলে সমস্যার পরিমাণ কমে আসবে। এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের শক্তিশালী এবং দক্ষ করে তোলে। কষ্টের মধ্যেও শুকরিয়া আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে সমস্যা আপনাকে কাবু করতে পারবে না। কেবল আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় নয়, আপনার জীবনে আসা মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। যাঁরা আপনাকে সাহায্য করেছেন বা

কোনোভাবে আপনার জীবনে অবদান রেখেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানান। যারা আপনার জীবনকে কঠিন করে তুলেছেন, তাঁদেরকেও মনে মনে ধন্যবাদ দিন কারণ তারা আপনার জীবনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করতে আপনাকে সাহায্য করেছেন (এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে তাদের কথা বলেছি)।

আমরা নিজের চাহিদাকে সীমিত রাখবো এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে শিখবো। আমরা যা পেয়েছি, তাই নিয়েই সুখী থাকার চেষ্টা করবো। চাহিদার অতিরিক্ত বোঝা আমাদের স্ট্রেস বাড়ায়। যখন আপনি নিয়মিত শুকরিয়া আদায় করা শুরু করবেন, তখন আপনার জীবনে একটি আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আসবে। এটি কেবল স্ট্রেস কমাবে না, বরং আপনার আত্মবিশ্বাস, মানসিক শান্তি এবং জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি বাড়াবে।

এই মুহূর্ত থেকেই আমরা শুকরিয়া আদায় শুরু করি। এটি আমাদের জীবনের একটি অভ্যাসে পরিণত হোক। আমাদের জন্য যা কিছু আছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, কারণ শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমেই আমরা জীবনে আরও নিয়ামত পাব।

একটি সুখী পাখির গল্প

এক ছিল কাক, তার মনে অনেক দুঃখ। সে ভাবত, তার জীবন দুঃখে ভরা কারণ সে দেখতে কালো এবং তার গলার স্বরও কর্কশ। অন্যান্য পাখিদের মতো মিষ্টি স্বর এবং সুন্দর রং তার নেই। তার মনে সবসময় হাহাকার চলত, *'যদি আমি কোকিলের মতো সুন্দর গলা পেতাম, তাহলে হয়তো সুখী হতে পারতাম।'*

একদিন কাক সেই কোকিলের কাছে গেল। সে বলল, *'ভাই কোকিল, তোমার গলার স্বর এত মিষ্টি! তুমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি।'*

কোকিল কাকের কথায় মৃদু হেসে উত্তর দিলো, *'আমার গলার স্বর মিষ্টি, কিন্তু আমি দেখতে কালো। সবাই আমার মিষ্টি স্বর শুনে কিন্তু কেউ আমাকে দেখে না। আমি সবসময় লুকিয়ে থাকি। যদি মানুষ আমায় দেখত তবে কখনোই পছন্দ করত না। আমার যদি রাজহাঁসের মতো সাদা রং থাকত, তাহলে হয়তো আমি সত্যিই সুখী হতে পারতাম। ইস্! আমি রাজহাঁস হতে পারতাম!'*

কাক ও কোকিল তখন রাজহাঁসের কাছে গেল। সে বলল, *'তোমার গায়ের রং এত সুন্দর! তুমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি।'* রাজহাঁস কাকের দিকে তাকিয়ে বলল, *'না-রে ভাই। আমার রং নিয়ে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমার মাত্র একটি রং - তাও সাদা। খুবই একঘেঁয়ে। ওই যে দেখো, টিয়া পাখির কী চমৎকার রং–সবুজ আর লাল মিলে কী সুন্দর! যদি আমি তার মতো রঙিন হতাম, তাহলে হয়তো সুখী হতে পারতাম।'*

কাক, কোকিল এবং রাজহাঁস একসঙ্গে টিয়া পাখির কাছে গেল। তারা বলল, *'তুমি কত সুন্দর! কী চমৎকার উজ্জ্বল সবুজ তার মধ্যে লাল ঠোঁট - তোমার দিক থেকে তো চোখই ফেরানো যায় না। তুমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি।'* টিয়া পাখি একটু হেসে বলল, *'আমার মাত্র দুইটি রং। কিন্তু দেখো, ময়ূরের রং কত সুন্দর, কত রঙিন তার পালক! কী সুন্দর সিল্কের শাড়ি পরে সে ঘুরে বেড়ায় । সে যখন নাচে, সবাই দেখার জন্য কী উদগ্রীব হয়ে থাকে। ময়ূরই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি। আমি যদি তার মতো হতে পারতাম' !*

অবশেষে তারা সবাই মিলে ময়ূরের কাছে গেল। ময়ূর কোথায় পাওয়া যায়? হ্যাঁ, চিড়িয়াখানায়। তারা তখন চিড়িয়াখানায় ময়ূরের খাঁচায় গেল। তারা ময়ূরকে বলল, *'তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং রঙিন পাখি। তুমি নিশ্চয়ই সবচেয়ে সুখী পাখি।'* ময়ূর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, *'তোমরা জানো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি কে? সেটা হলো কাক !*

কাককে কেউ খাঁচায় রাখে না। কাক পুরোপুরি স্বাধীন। যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে'।

কাক তখন নিজের দিকে তাকাল এবং ভাবল, *'তাইতো, আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি। এতদিন অন্যদের দেখে হিংসা করে আমি আমার সুখ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে, আমার স্বাধীনতাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ'।*

আমাদের জীবনেও এই গল্পটি সত্য। আমরা প্রায়ই অন্যদের দেখে হিংসা করি, তাদের সুখী মনে করি। কিন্তু বাস্তবে, আমাদের নিজেদের জীবনে এমন অনেক কিছু আছে, যা অনেকের জন্য স্বপ্ন। আমরা যদি তা উপলব্ধি করি এবং যা কিছু পেয়েছি তার জন্য শুকরিয়া আদায় করি, তবেই সত্যিকারের সুখের সন্ধান পাব।

আপনাদের কাছে প্রশ্ন - *'কে বেশি সুখী পাখি'?* উত্তর হচ্ছে - *'সবাই সুখী আবার সবাই অসুখী। পাখি যদি নিজেকে সুখী মনে করে তবে সে সুখী, অসুখী মনে করলে অসুখী'।*



গল্পটি আমাদের শেখায়, সুখ হলো আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যের দিকে তাকিয়ে নিজের আনন্দ হারানোর কোন মানে হয় না। বরং যা কিছু আমাদের আছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুখ আসলে আমাদের নিজেদের ভেতরে লুকিয়ে আছে। ঠিকভাবে শুকরিয়া আদায় করলেই আমরা সেই সুখ খুঁজে পাব।

এই গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হলো আপনাকে উপলব্ধি করানো যে আমাদের জীবনের বেশির ভাগ স্ট্রেস আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবনে দুই ধরনের জিনিস থাকে। প্রথমটি হলো, যা আমরা চেয়েছি কিন্তু পাইনি। আর দ্বিতীয়টি হলো, যা আমরা চাইনি, কিন্তু পেয়েছি। না চাইতেই পেয়ে গেছি।

আমরা প্রায়ই প্রথম দিকটির প্রতি বেশি মনোযোগ দিই। যা পাইনি, তা নিয়ে হতাশ হই এবং সেটা আমাদের স্ট্রেসের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা যদি দ্বিতীয় দিকটি, অর্থাৎ যা কিছু না চাইতেই পেয়েছি, সেগুলোকে নিয়ে ভাবি, তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের জীবনে শুকরিয়া আদায় করার মতো অনেক কিছুই আছে।

চাওয়া পাওয়ার হিসাব

এখন আসুন, এই ব্যাপারটি একটু বাস্তবভাবে দেখে নিই। এখানে একটি ছক দিচ্ছি যার একপাশে লেখা আছে - *'আমি কী কী চাই, কিন্তু পাইনি।'* এখানে লিখুন সেই জিনিসগুলোর নাম, যেগুলো আপনার জীবনে অনুপস্থিত এবং যেগুলোর জন্য আপনি স্ট্রেস অনুভব করেন। অন্য পাশে যেখানে লেখা আছে - *'আমি কী কী না চাইতেই পেয়েছি।'* এখানে লিখুন সেই জিনিসগুলো, যা আপনি কখনো চাওয়ার আগেই জীবনে পেয়েছেন। চলুন, এখুনি এই কাজটি করে ফেলি-

চেয়েছি কিন্তু পাই নাই	না চাইতেই পেয়েছি

যখন আপনি এই কাজটি করবেন, তখন দেখবেন প্রথম কলামে আপনার না পাওয়ার তালিকা সীমিত। হয়তো বিশ থেকে ত্রিশটি কারণও আপনি খুঁজে পাবেন না। অনেক চেষ্টা তদবিরের পর যদি পঞ্চাশটি কারণও পান, সেটিও খুব বেশি হবে না। তবে মোটামুটি চ্যালেঞ্জে যাওয়া যায় যে পঞ্চাশটি আপনি লিখতে পারবেন না। (হবে নাকি চ্যালেঞ্জ?)

অন্যদিকে, যখন আপনি *'না চাইতেই পেয়েছি'* কলামে লিখবেন, তখন দেখবেন তালিকা যেন শেষই হচ্ছে না। আপনি হয়তো এভাবে কখনো ভেবে বের করার চেষ্টা করেননি তাই হয়তো কখনো বুঝতেও পারেননি যে আপনার জীবনে শুকরিয়া আদায় করার এত কিছুই আছে। আপনার সুস্থতা, হাত-পা, চোখ, আপনার মানসিক শক্তি, আপনার সন্তান, মা-বাবা, পরিবার-পরিজন যাবতীয় কিছু যা আপনি ব্যবহার করছেন। আপনার পরিবার, যারা সবসময় পাশে থাকে। আপনার কাজ, যা আপনাকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দিয়েছে। আপনার শিক্ষা, যেখানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, আমি যে চাকরি বা ব্যবসা করছি, সেটা তো আমার নিজের পরিশ্রমের ফল। কিন্তু এই পরিশ্রম করার শক্তি কে আপনাকে দিয়েছে? আপনার মেধা, শক্তি, সুযোগ–এসব কি গিফ্‌ট নয়? আপনি যে পরিবেশে বড় হয়েছেন, যে মানুষদের সঙ্গে থেকেছেন, যেখান থেকে শিক্ষা পেয়েছেন–এসবই তো আপনার জীবনের বড় বড় উপহার।

এই কাজটি করার পর আপনি দেখতে পাবেন, আপনার জীবনে শুকরিয়া আদায় করার জন্য কত কিছু আছে। আপনার স্ট্রেস কমে যাবে, এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাবে। শুকরিয়া আদায় শুধু একটি অভ্যাস নয়, এটি আমাদের মন এবং আত্মার জন্য একটি শক্তিশালী উপায়, যা আমাদের জীবনের মান উন্নত করে। আসুন, আজ থেকেই এই চর্চা শুরু করি এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাই।

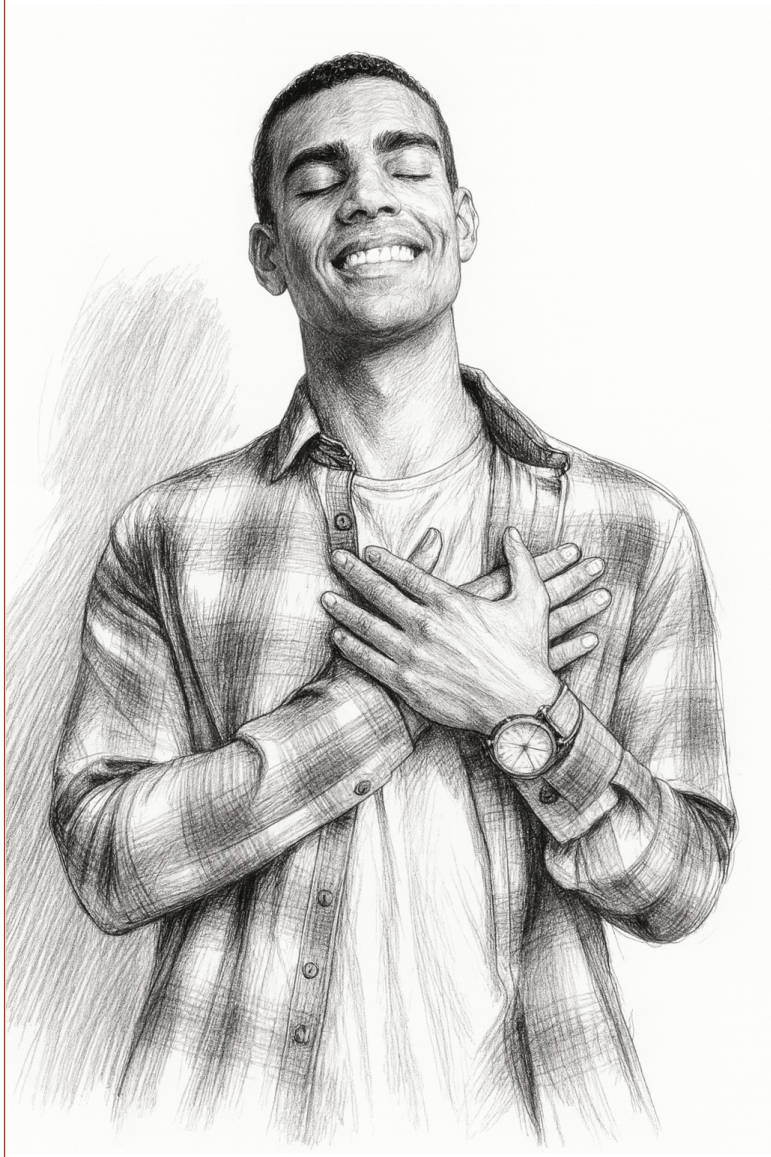

আপনার কাছে এমন অনেক কিছু আছে, যা আপনার বন্ধুদের কাছে নাই। তাদেরও তো একই ফ্যাসিলিটি ছিল, একই রকমের বুদ্ধি ছিল। বরং আপনার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি ছিল, তাই না? আপনাকে যে যোগ্যতাটা দেওয়া হয়েছে, সেটাও কিন্তু গিফ্‌ট। তার মানে হচ্ছে, যত গিফ্‌ট আপনি পেয়েছেন, এই গিফ্‌ট গুলি কিন্তু আপনি লিখে শেষ করতে পারবেন না।

যাই হোক, আমাদের টাস্কটা হলো যে এই সবগুলো জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত মনে পড়ে, আমরা লিখব। লিখে এবার কী করব? যেই জিনিসগুলো আমি পাই নাই, সেই জিনিসটা - আপনি পেয়েছেন এমন কোন জিনিসের বদলে আপনি নিতে চান? মানে, আপনি না চাইতেই পেয়েছেন, সে রকম একটা জিনিস কেটে দিয়ে, আপনি পান নাই সে রকম একটা জিনিস পেতে চান? কোনটার বদলে? আমি কি বোঝাতে পেরেছি?

যেমন, আপনার সুস্থতা, এটাকে কেটে দিয়ে আপনি অনেক বেশি টাকা চান। যেমন, আপনি চাচ্ছিলেন যে আপনার বিজনেসটা এক কোটি টাকার বিজনেস হোক বা একশ' কেটি টাকার, তাই না? তা আপনি পান নাই। এটা আপনি পেতে চান। এই পাশ থেকে কোন জিনিসটা বাদ দিয়ে? আপনার সুস্থতা বাদ দিয়ে? নাকি আপনার ঘুম বাদ দিয়ে? কোন জিনিসটা বাদ দিতে চান? এভাবে করে কাটার চেষ্টা করেন। দেখেন তো, কয়টা কাটতে পারেন। আমার বিশ্বাস, আপনি খুব বেশি জিনিস কাটতে পারবেন না। একটাও কাটতে পারবেন না বলেই আমার মনে হয়। ট্রাই করে দেখুন।

তার মানে কী? মানে খুব সহজ। আপনার জন্য যা কিছু আসলেই দরকার, সৃষ্টিকর্তা সেগুলোই আপনাকে দিয়েছেন। আপনি যা যা চেয়েছেন, সব জিনিস কিন্তু পান নাই এবং এই যে পান নাই, সেটা কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই পান নাই।

একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেবো। আপনার পাঁচ বছরের বাচ্চা যদি আপনাকে এসে বলে যে, *'মা/বাবা, আমাকে মোটরসাইকেল কিনে দাও'*, আপনি কি তাকে দেবেন মোটরসাইকেল? খেলনা মোটরসাইকেল না, সত্যি সত্যি মোটরসাইকেল। আপনি নিশ্চয়ই দেবেন না, আমি জানি। রাইট? আমরা কেউ ই দেবো না। কেন দেবো না? কারণ আমি জানি যে, ওই জিনিসটা সে ব্যবহার করার উপযুক্ত হয় নাই। সে কিন্তু মনে করছে যে, সে এটা ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়েছে - কিন্তু আমরা বাবা-মা হিসেবে জানি যে, সে এটার উপযুক্ত এখনও হয় নাই।

আমরা যদি বাবা-মা হয়ে, আমাদের সন্তানের জন্য এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি, তাহলে সৃষ্টিকর্তা তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে অনেক ভালোভাবে জানেন। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যতটুকু জানি, আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার থেকে অনেক, অনেক, অনেক, অনেক বেশি জানেন। কোন তুলনাই হয় না। ইন্‌স এন্ড আউট্‌স তিনি জানেন। আমাদের কোন কোন জিনিস আমাদের জন্য ক্ষতিকর হবে, কোনটা কোনটা উপকারী হবে, সেটা হিসাব করেই তিনি আমাদেরকে দেন। আমাদের সব চাওয়া তিনি গ্রহণ করেন না।

বন্ধুরা, যা নেই, তা কেন নেই, এটা যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনি আনসারটা পেয়ে যাবেন। আপনি কি খেয়াল করেছেন? আপনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে এমন এমন জিনিস চেয়েছিলেন। পরে গিয়ে মনে হয়েছে, *'ভাগ্যিস পাইনি! যদি ওইটা পেতাম, তাহলে কী যে ধ্বংস হতো, কী যে ক্ষতি হয়ে যেত আমার জীবনে।'* তাই না? আপনি কি এ রকম কখনো ফিল করেছেন? কখনো কি এক্সপেরিয়েন্স করেছেন?

তাহলে আমরা এখন থেকে কী করব? আপনি একটা জিনিস চাচ্ছেন, সেটার জন্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা পাননি বা সেটা হয়নি। সেজন্য আপনি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেবেন।

আপনি সেটার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেবেন। আপনার থেকে কোন একটা জিনিস চলে গিয়েছে, কোন একটা জিনিস হারিয়ে গিয়েছে। আপনি পরিশ্রম করেছেন, চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারপরও জিনিসটা পাননি। সেজন্য এখন থেকে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেবেন।

আপনি এজন্য ধন্যবাদ দেবেন যে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে তার চোখে চোখে রেখেছেন। তিনি আপনাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেননি, আপনি 'আন এটেনডেড' নন। কোন মানুষই, কোন প্রাণী, কোন জন্তুই কিন্তু আন এটেনডেড না। সৃষ্টিকর্তা সবাইকে পাহারা দিয়ে রাখছেন এবং সবাইকে তার যা যা দরকার সেটা দিচ্ছেন। যা যা চাচ্ছি, সেটা না। সবকিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তার একটি প্ল্যানিং আছে।

আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখবো - বিনা যোগ্যতায় তিনি কাউকে কিছু দেন না। আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি আমি একটা ভালো জিনিস করতে চাই এবং সেটা হচ্ছে না, আমি চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না, তখন আমাকে ভাবতে হবে এইভাবে যে আমি ওটার এখনও পর্যন্ত যোগ্য হয়ে উঠি নাই। ওইটা যদি আমি এখন পাই, তাহলে আমি সেটা নষ্ট করে ফেলতে পারি, বা আমার জন্য খারাপ হতে পারে।

তাহলে আমি চেষ্টা করে যাব। সেটা যদি একটা ভালো জিনিস হয়, তাহলে আমি চেষ্টা করে যাব। যখনই আমার যোগ্যতা তৈরি হবে, তখনই তিনি দেবেন। আর যদি না দেন, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা আমার জন্য উপযুক্ত না বা আমি ওই জিনিসটার জন্য উপযুক্ত না। সময় হলে তিনি দেবেন। যদি তিনি আমাদের জন্য ভালো মনে করেন, তিনি আগেও দেন না, পরেও দেন না। সময় হলেই দেন। আমরা যা চাচ্ছি, তা তিনি দিচ্ছেন না। কারণ হয়তো আমরা তার জন্য প্রস্তুত নই। এইভাবে যদি আমরা ভাবি, তাহলে শুকরিয়া আদায় করতে পারব। সত্যিকারের শুকরিয়া আদায় কিন্তু আমরা তখনই করতে পারব। আমি একটি কথা

সবসময় আমার শিক্ষার্থীদেরকে বলি - *'পেলে ভালো, না পেলে আরও ভালো।'*

এই স্ট্রেস গুলি তখন আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে। যখনই আমরা কিছু পাব না, আমাদের হিসাবের সাথে মিলবে না যে আমি এত চেষ্টা করলাম, পেলাম না কেন, তখনই আমি মনে করব যে আমার এখনও সময় হয়নি বা আমি এটার জন্য উপযুক্ত না।

আলহামদুলিল্লাহ বলব, সামনে এগিয়ে যাব, কাজ করতে থাকব। আশা করি, এ ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে পেরেছি।

আপনি যদি উপলব্ধি করতে চান যে, আপনি সৃষ্টিকর্তার কতটা নিয়ামতের ভেতরে আছেন, তাহলে কিছু কাজ করতে পারেন। এই কাজগুলো আপনাকে শিখিয়ে দেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব। এগুলো করলে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার জীবনে শুকরিয়া আদায় করার কত কারণ রয়েছে।

প্রথমে আপনি হাসপাতালে যাবেন। হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখুন। প্রথমে হার্টের ডিপার্টমেন্টে যান। হার্ট অ্যাটাক করে যারা ভর্তি হয়েছেন, তাদের অবস্থা দেখুন। আপনি বুঝতে পারবেন, জীবন এবং মৃত্যু কত কাছাকাছি। আমি আমার বাবার সাথে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্টের ওয়ার্ডে এক মাস ছিলাম। প্রতিদিন ১২-১৫ বা ২০ জন মানুষের মৃত্যু দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, মৃত্যু কতটা অনিশ্চিত এবং আমাদের জীবন কতটা মূল্যবান।

এরপর মানসিক রোগীদের ওয়ার্ডে যান। সেখানে আপনি এমন মানুষ দেখবেন, যারা বাইরের দিক থেকে আমাদের মতো সুস্থ মনে হলেও, মস্তিষ্কের সামান্য সমস্যা তাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাদের আচরণ, কথাবার্তা–সব কিছুই এমন যে, তারা নিজেরাও জানেন না তারা কী করছেন। এই দৃশ্য দেখে আপনি উপলব্ধি করবেন, মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব কত বেশি।

আগুনে পোড়া রোগীদের ওয়ার্ডেও ঘুরে আসতে পারেন, তবে যদি আপনার সে রকম মানসিক শক্তি থাকে। সেখানে মানুষকে এমন যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখবেন, যা হয়তো একটি ছোট অসাবধানতার কারণে ঘটেছে।

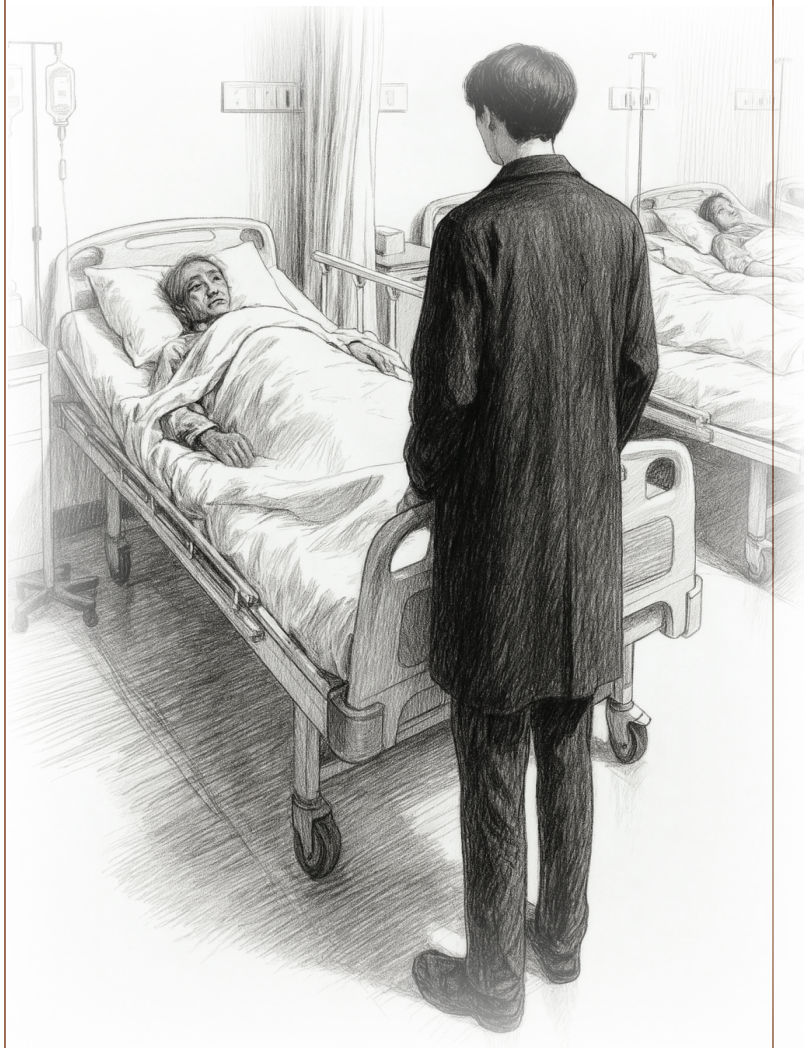

কতটা আরামের নিয়ামতে আমরা আছি। সৃষ্টিকর্তা চাইলে যেকোনো সময় আমাদের এই অবস্থায় ফেলতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

ড্রাগ অ্যাডিক্টদের সেন্টারে যান। সেখানকার মানুষদের চ্যালেঞ্জ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি কতটা ভালো আছেন। আপনার জীবনে এই ধরনের আসক্তি নেই, যা আপনাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বস্তিগুলোতে ঘুরে দেখুন। সেখানে মানুষ কীভাবে ছোট ছোট জায়গায়, প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাপন করছে, তা দেখুন। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে থাকার জন্য একটি ভালো ব্যবস্থা দিয়েছেন। এটি উপলব্ধি করুন। আপনি যদি তাদের সাথে একটি দিন বা রাত কাটাতে পারেন, জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা পুরোপুরি বদলে যাবে।

জেলখানায় যারা আছেন, তাদের জীবন এবং মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের পরিস্থিতি আপনাকে শেখাবে যে, আপনি কতটা স্বাধীন এবং ভালো অবস্থায় আছেন।

আমাদের সমস্যাগুলো হলো, আমরা সবসময় আমাদের থেকে যারা ভালো অবস্থায় আছেন, তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি। আজ থেকে আপনি নিজেকে তুলনা করুন তাদের সঙ্গে, যারা আপনার থেকে কঠিন অবস্থায় আছেন।

শুকরিয়া আদায় করতে পারা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের একটি বড় অংশ। এটি যদি আপনি ঠিকমতো করতে পারেন, তাহলে আপনার জীবনে স্ট্রেস কমবে এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি বাড়বে। আমরা এখন থেকে এই চর্চা শুরু করি।

আমরা এখন থেকে স্ট্রেস ম্যানেজ করার জন্য প্রতিদিন এক মিনিটের একটি প্রার্থনা করব। এই প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করব।

কী প্রার্থনা? *'হে প্রভু, আমার যা প্রয়োজন তা আমার আছে, তুমি আমাকে দিয়েছ। যা আমার নেই, তা প্রয়োজন নেই বলেই তুমি দাওনি। আমাকে সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান, ও অপরের জন্য কাজ করার শক্তি দাও'।*

আরেকবার বলছি, এই এক মিনিটের প্রার্থনাটা আমরা প্রতিদিন করার চেষ্টা করব। এটি আমরা একটি প্রজেক্ট হিসেবে নিতে পারি, যেখানে প্রতিদিন এক মিনিট সময় বের করে এই প্রার্থনা করব।

'হে প্রভু, আমার যা প্রয়োজন তা আমার আছে, তুমি আমাকে দিয়েছ। যা আমার নেই, তা প্রয়োজন নেই বলেই তুমি দাওনি। আমাকে সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান, ও অপরের জন্য কাজ করার শক্তি দাও'।

এই প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা শিখব কীভাবে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হয় এবং বাকি সবকিছু সৃষ্টিকর্তার উপর ছেড়ে দিতে হয়। Try your best, leave the rest–এটি আমাদের মূলনীতি হবে। আমরা আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু করব, এবং বাকিটা সৃষ্টিকর্তার উপর ছেড়ে দেব।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্পণ থাকা উচিত। তিনি আমাদের জন্য যা চাচ্ছেন, সেটাই ফুল অ্যান্ড ফাইনাল। সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো।

প্রতিদিনের শুকরিয়া আদায়ের চর্চা

এই পর্যায়ে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, তা হলো প্রতিদিন দুইবার শুকরিয়া আদায়ের চর্চা করা। একবার সকালে এবং একবার সন্ধ্যায়। এটি আপনাকে জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে সাহায্য করবে এবং স্ট্রেস কমাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, আপনি একটি নোট লিখবেন। লিখবেন কেন আপনার রাতটা ভালো গিয়েছে। আপনি রাতে ঘুমাতে পেরেছেন, এর জন্য

সৃষ্টিকর্তাকে শুকরিয়া আদায় করবেন। যদি কোন কারণে আপনি রাতে ভালো ঘুমাতে না পারেন, তাহলে এটাও একটি সুযোগ যে, আপনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে পেরেছেন। এজন্যও শুকরিয়া আদায় করবেন। যেকোনো কারণেই হোক, সকালে ঘুম থেকে উঠে একটি শুকরিয়া জানাতে পারেন।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, আপনি সারাদিনের ভালো দিকগুলো নিয়ে লিখবেন। আজকের দিনে আপনার কী কী ভালো হয়েছে, তা লিখে শুকরিয়া আদায় করবেন। আমরা সবসময় ভালো দিকগুলোর ওপর ফোকাস করব। খারাপ বা নেতিবাচক কোনো কিছু আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করলে সঙ্গে সঙ্গে ভাববেন, *'এই অভিজ্ঞতা আমাকে আরও শক্তিশালী করবে। এখান থেকে আমি একটি শিক্ষা পেলাম।'* এই ভাবনাটাও আপনাকে শুকরিয়া আদায়ে সাহায্য করবে।

সকালে এবং রাতে, দুইবার শুকরিয়া আদায়ের এই অভ্যাস যদি আপনি ধরে রাখতে পারেন, তাহলে এটি আপনার মনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলবে। এটি এক মাস পর্যন্ত চর্চা করবেন। এক মাসের মধ্যে এটি আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। এরপর আপনি অবচেতনভাবেই এই চর্চা চালিয়ে যেতে পারবেন।

এই অভ্যাসটি আপনাকে আরও সুখী, কৃতজ্ঞ এবং মানসিকভাবে শান্ত রাখতে সাহায্য করবে।

Simple Pleasure vs. Foolish Pleasure

মূল্যবান আনন্দ বনাম অমূল্য আনন্দ মানেটা কী? আমরা অনেক টাকা খরচ করে, অনেক সময় ব্যয় করে, অনেক পরিশ্রম করে মূল্যবান একেকটি আনন্দ খুঁজে বের করি। বছরের শেষে ওই তিন দিন মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য টাকা জমালাম। তারপর যখন

সিঙ্গাপুর গেলাম, সেটা একটা বড় আনন্দ। আমি জীবনে একটা গাড়ি কিনব। কখনো যেদিন গাড়ি কিনতে পারব, সেদিন আমার জন্য অনেক বড় আনন্দ। তার মানে ওই আনন্দটা আপনাকে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। বন্ধুরা, এ রকম আনন্দ আপনি সারাজীবনে কয়েকটা মাত্র পাবেন। হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র এবং এর স্থায়িত্ব খুবই কম।

এখন থেকে আমরা এই বড় বড় আনন্দের সাথে ছোট ছোট অসংখ্য আনন্দের দিকে ফোকাস করব। আমরা খুঁজে বের করব অমূল্য আনন্দ। মূল্যবান আনন্দের বদলে অমূল্য আনন্দ কোন কোন জিনিস আপনাকে দিতে পারে?

যেমন কোন একটি হবি থাকা। কার কার আপনাদের হবি আছে? আর কার কার নেই? যাদের হবি নেই, তারা হবিটি খুঁজে বের করুন এবং হবির জন্য একটু সময় বের করুন। আনন্দের জন্য করি সে রকম একটা কাজ। যখন আপনি করবেন, তখন - ওই যে টাইমটা, এটা আপনাকে অমূল্য আনন্দ দেবে। মানুষকে সাহায্য করা। যখন আপনি কোন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবেন এবং সাহায্য করে ভুলে যাবেন।

আপনি যখন একটা গাছ লাগাবেন, তখন কেমন মজা লাগে আপনার? একটু গাছের পরিচর্যা করেন। একটা ছোট্ট কুঁড়ি যখন বের হয়, একটা ছোট্ট পাতা যখন বের হয় আপনার বাগানের গাছে, তখন আপনার কেমন লাগে? একটা ফল ধরলে, সে আনন্দের কি কোন তুলনা হয়? ওই যে আনন্দটা, অমূল্য আনন্দ। আমরা কিন্তু এই আনন্দগুলোকে আলাদাভাবে খেয়াল করি না। আসলে আনন্দ বলে মনে করি না। আজকে থেকে আমরা এই আনন্দগুলোকে নোটিস করব।

যেমন, যারা ছবি আঁকেন, তারা জানেন যে একটা ছবি আঁকা শেষ করলে কেমন মজা লাগে। আপনি ছবি আঁকা শিখা শুরু করতে পারেন। যেকোনো একটা মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট শিখতে শুরু করতে পারেন।

কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা ভাষা শিখতে শুরু করতে পারেন। আপনি একটা ভাষা যখন শিখবেন, তখন শুধু সেই অঞ্চলের না, তার আশপাশের অনেক অঞ্চলের কালচার সম্পর্কে আপনার ধারণা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটি অনেক চমৎকার একটি ব্যাপার।

আপনি একটা কবিতা পড়তে পারেন বা কবিতার ভেতর থেকে আনন্দ খুঁজে বের করতে পারেন। সেই পুরোনো যমানার যে কবি, তিনি তার জীবনে তার আশেপাশে কী দেখেছেন, কী এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, কীভাবে তাঁরা ভাবতেন, কী ভাবতেন - এই ব্যাপারগুলো আপনি পুরোনো মানুষদের বই পড়লে খুঁজে পাবেন। এটি অনেক তীব্র একটা আনন্দ।

আপনি গান শুনতে পারেন। একটা পাখির উড়ে যাওয়া আপনি দেখতে পারেন। আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াতে পারেন। কক্সবাজার না হোক, পতেঙ্গা তো যাওয়া যেতেই পারে। আপনি আপনার সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। আমাদের সন্তানদেরকে আমরা ভুলে গেছি একটু স্পেশালি আদর করতে। আপনি আপনার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে দেখুন। কোন কারণ ছাড়া। এমনিতেই তাকে জড়িয়ে ধরুন। তাকে বলুন আমি তোমাকে ভালোবাসি। আপনি দেখেন যে কী রকম আনন্দ আপনি পান। তার সাথে একটু খেলুন। একটু কাছ থেকে। একটু অবসর নিয়ে তার সাথে একটুখানি খেলুন।

রেগুলারলি অপরিচিত মানুষকে একটা সুন্দর হাসি দিয়ে দেখুন। কেমন লাগে? নিজেকে একটা গিফ্‌ট দিন। নিজেকে একটা আইসক্রিম খাওয়ান। নিজেকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ান। নিজেকে একটা চকলেট কিনে দেন। ওয়াইফের জন্য, হাজব্যান্ডের জন্য, একদিন একটা ফুল কিনে আনতে পারেন। কেমন লাগে দেখুন তো!

এই জিনিসগুলো আমরা সব এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। আমি আপনাদেরকে একটু গাইড দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আপনি এক্সপেরিমেন্ট করবেন। আমরা বছরের শেষে একবার কক্সবাজার যাই।

কখন কক্সবাজার যাব? কখন গিয়ে সমুদ্রের সামনে দাঁড়াব? তারপর আমার ভালো লাগবে। আমি যেই মাত্র কক্সবাজারের জন্য প্ল্যানিং করব, যখন আমি টিকিট কিনব, যখন আমি গাড়িতে উঠব, গাড়িতে উঠে পুরো রাস্তাটা ভ্রমণ করব, পুরো রাস্তাটাই তো একটা মজার ব্যাপার, তাই না?

আমরা এই বড় বড় আনন্দগুলোর জন্য এই ছোট ছোট প্লেজারকে উপেক্ষা করতে থাকি। কোন দরকার নাই। বড় বড় আনন্দ আপনি সারাজীবনে খুব বেশি পাবেন না। এই ব্যাপারটা আমরা খেয়াল করব। ছোট ছোট জিনিস। বড় বড় আনন্দ। ছোট ছোট মিলিয়ন মিলিয়ন আনন্দ।



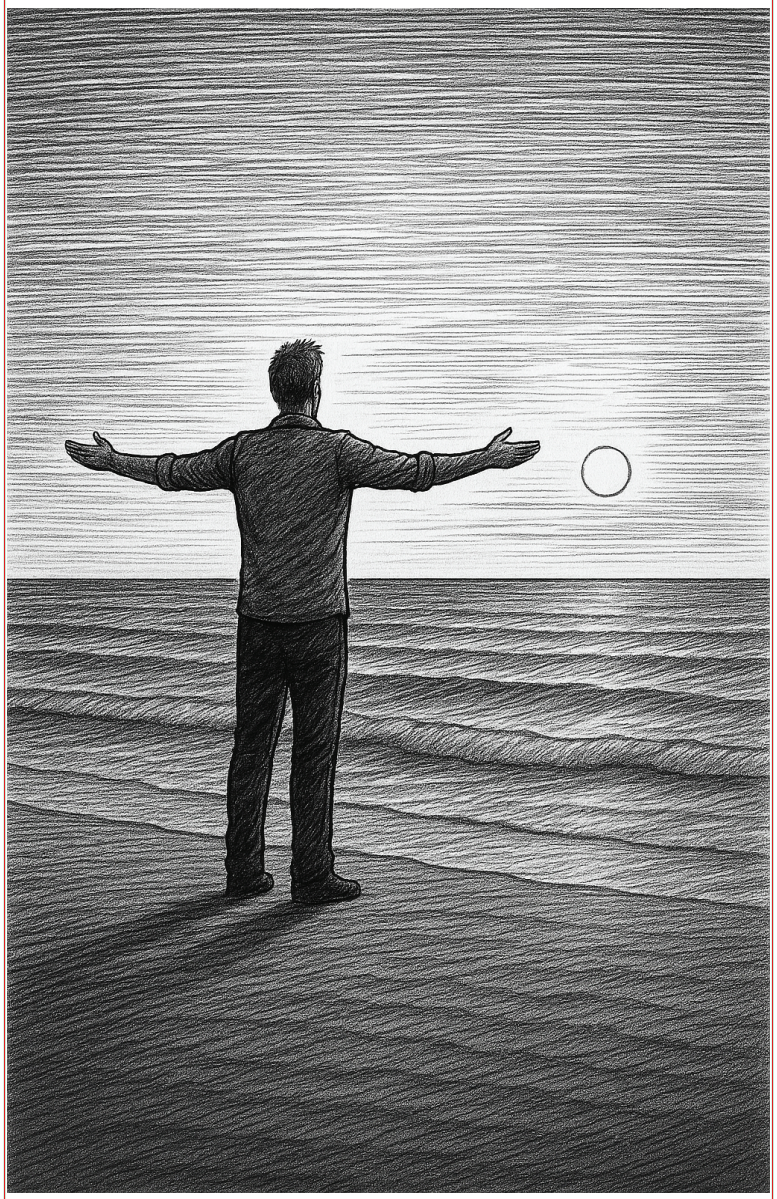

অ্যাকশন প্ল্যানিং

প্রতিদিন শুকরিয়া আদায়ের চর্চার চার্টের উদাহরণ (এক সপ্তাহের জন্য)

দিন	ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কারণ	মনের অবস্থা (ইমোজি)	অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি থাকে)
শনিবার	উদাহরণ : বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পেলাম।		দিনটি ভালো কাটল।
রবিবার	উদাহরণ: অফিসে নতুন কিছু শিখলাম।		শেখার সুযোগ পেয়ে ভালো লাগল।
সোমবার	উদাহরণ: পরিবারের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটালাম।		বিশেষ স্মৃতিময় সময়।
মঙ্গলবার	উদাহরণ: সুন্দর প্রকৃতির আবহাওয়ায় হাঁটতে গেলাম।		সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।
বুধবার	উদাহরণ: প্রিয় বই পড়ার সময় পেলাম।		মন শান্ত হলো।
বৃহস্পতিবার	উদাহরণ: প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রশংসা পেলাম।		অনুপ্রাণিত হলাম
শুক্রবার	উদাহরণ: নিজেকে সময় দিলাম।		বিশ্রাম করলাম।

ব্যবহার নির্দেশনা:

প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় (সকালে বা রাতে) চার্টটি পূরণ করুন।

প্রতিদিন অন্তত একটি কারণ লিখুন যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ।

অনুভূতি বোঝাতে একটি ইমোজি নির্বাচন করুন।

বিশেষ কোনো মন্তব্য থাকলে তা লিখুন।

সপ্তাহ শেষে চার্টটি পর্যালোচনা করুন এবং নিজেকে উদ্দীপিত করুন।

আপনি চাইলে এই চার্টটি হাতেকলমে বানাতে পারেন বা প্রিন্ট আউট নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এক সপ্তাহ পর এটি আপনার জন্য কতটা উপকারী হলো, তা শেয়ার করতে ভুলবেন না!

কয়টি ছোট ছোট আনন্দ (Simple Pleasure) আজ আপনি সচেতনভাবে উপভোগ করেছেন ? সেগুলো কী কী?

১._____

২._____

৩._____

৪._____

৫._____

৬._____

৭._____

৮._____

৯._____

১০._____

নোট –

নোট –

ইতিবাচক সংযোগের দক্ষতা

মানুষের সাথে মানুষর ইতিবাচক সংযোগের দক্ষতা, সেটি যত বেশি হবে, সেই মানুষটির জীবনে ততই সফলতা আসবে, এবং জীবনে সে যত সফল হবে, ততই তার স্ট্রেস লেভেল, মানসিক চাপ কমে আসবে। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করার এই স্কিলটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। এটি আপনার পেশাগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তথাপি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে



ইতিবাচক সংযোগ বা পজিটিভ কমিউনিকেশন স্কিল এটি মানুষের জীবনে ম্যাজিকের মত কাজ করতে পারে। একজন ম্যাজিশিয়ান স্টেজে যখন পারফর্ম করে, তখন মানুষ অবাক হয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারা ভেবে পায় না যে এই অদ্ভুত কাণ্ড কীভাবে সম্ভব। একই রকম ভাবে ইতিবাচক যে দক্ষতা, ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করার, ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করার যে দক্ষতা, সেটিও একই রকম ভাবে মানুষের জীবনে ম্যাজিকের মত কাজ করে থাকে। ম্যাজিক্যাল ইফেক্ট দিয়ে থাকে।

একজন মানুষের যে এই সংযোগের দক্ষতা, সেটি যত বেশি হবে, সে মানুষটির জীবনে ততই সফলতা আসবে, এবং জীবনে সে যত সফল হবে, ততই তার স্ট্রেস লেভেল, মানসিক চাপ কমে আসবে। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করার এই স্কিলটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। এটি আপনার পেশাগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তথাপি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

আসুন তাহলে আমরা এখন এই স্কিলটি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব।

মানুষ হিসেবে আপনি কোন টাইপের?

সবার আগে জানতে হয় নিজের সম্পর্কে, চিনতে হয় নিজেকে। আপনি যখন নিজেকে চিনতে পারবেন, যত ভালো চিনতে পারবেন, ততই আপনি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন। আপনার টাইপ অনুযায়ী, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি নিজেকে পরিবর্তন করবেন। প্রশ্ন হলো, 'টাইপ?' এটা আবার কী? মানুষ কি আবার বিভিন্ন টাইপের হয়?

হ্যাঁ, মানুষ অনেক ধরনের হতে পারে। তবে আচরণগত দিক থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষকে প্রথমতঃ দু'টি ভাগ করেছেন। আপনি হতে পারেন একজন টাইপ A মানুষ অথবা টাইপ B মানুষ।

টাইপ A মানুষ : তারা সাধারণত আক্রমণাত্মক aggressive স্বভাবের হয়ে থাকেন। আক্রমণাত্মক মানে নিজের কথাই সবসময় ঠিক মনে করা। যদি আপনার চিন্তা এমন হয় যে সবসময় আপনিই সঠিক, তাহলে আপনি টাইপ A মানুষ। টাইপ A মানুষ খুব রক্ষণশীল strict টাইপের হতে পারে। তারা সময়নিষ্ঠ এবং সবকিছু নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া উচিত বলে মনে করেন। যদি আপনার ধারণা থাকে যে সবকিছু সময়মতো এবং নির্ভুল হতে হবে, তাহলে আপনি টাইপ A মানুষ।

টাইপ A মানুষ কাজের ক্ষেত্রে কোন ভুল সহ্য করতে পারেন না। কোন ভুল হলে তারা সহজে মেনে নিতে পারেন না। এ ধরনের মানুষ কখনো হার মানতে চান না। যদি কোন কারণে হার মানতে হয়, তাহলে তারা রেগে যান এবং হতাশ হয়ে পড়েন। তারা মনে করেন তাদের কথাই সবসময় ফাইনাল। টাইপ A মানুষ খুব প্রতিক্রিয়াশীল reactive হন এবং সহজেই রেগে যান। তারা অন্য কারও মতামত মেনে নিতে চান না। হয়তো শোনেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কথাটাই চূড়ান্ত মনে করেন। এদের স্বভাব বেশ আক্রমণাত্মক এবং দৃঢ়। এই হলো টাইপ A ধরনের মানুষ।

টাইপ B মানুষ : এবার আসি টাইপ B মানুষের দিকে। টাইপ B মানুষ সহজ-সরল easy-going স্বভাবের হন। তারা সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং তাদের স্ট্রেস লেভেল তুলনামূলকভাবে কম থাকে। টাইপ B মানুষ সাধারণত উদাসীন হন, তবে তারা সবার কথা শোনেন এবং সবার সঙ্গে সহজেই মিশে যান।

টাইপ B মানুষের বিশেষত্ব হলো, তারা যদি মনে করেন যে অন্য কারও মতামত তাদের চেয়ে ভালো, তাহলে তারা সেটা সহজেই গ্রহণ করেন এবং ইতিবাচকভাবে মেনে নেন। তারা নিজে থেকেই সবার সঙ্গে সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমরা সাধারণত এই ধরনের মানুষকে সহজ-সরল easy-going টাইপের মানুষ বলি।

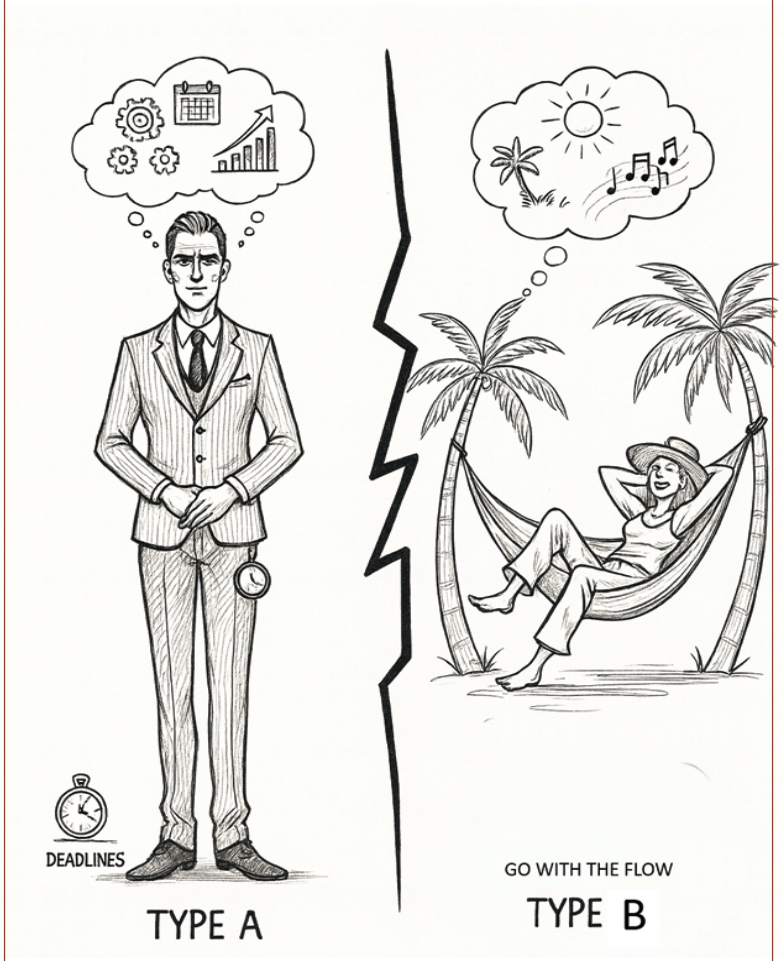

আমাদের চারপাশে যেমন টাইপ A মানুষ দেখি, তেমনই টাইপ B মানুষও দেখি। একইভাবে, আপনিও হতে পারেন টাইপ A মানুষ অথবা টাইপ B মানুষ। আপনি কোন টাইপ? টাইপ A নাকি টাইপ B?

যদি আপনি টাইপ A হন, তাহলে স্ট্রেস আপনার পিছু ছাড়বে না। আপনি সারাজীবন ধরে স্ট্রেস এবং টেনশনের মধ্যে ডুবে থাকবেন। কারণ, আপনার মনে হবে - কোনো কিছুই আপনার ইচ্ছামতো হচ্ছে না। আপনার ইচ্ছামতো সবকিছু চলবে না, আর এটাই আপনাকে সবসময় চাপের মধ্যে রাখবে।

তাই, যদি আপনি টাইপ A ধরনের মানুষ হন, তাহলে আপনাকে নিজের আচরণের ওপর কিছুটা কাজ করতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্বকে নমনীয় করতে হবে, যাতে আপনি সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং স্ট্রেস এড়াতে পারেন।

অন্যদিকে, টাইপ B মানুষ সহজ-স্বভাবের এবং স্বাভাবিক মানসিকতার হয়। তারা একটি 'Pleasant Personality' গড়ে তোলে। টাইপ B মানুষের মধ্যে সহজে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে এবং তারা জীবনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেস। তাদের সঙ্গে সময় কাটানোও অনেক বেশি আনন্দদায়ক হয়।

আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন বুঝে সেটি আরও উন্নত করার চেষ্টা করুন। Pleasant Personality গড়ে তুলতে হলে টাইপ B মানুষের কিছু গুণাবলি নিজেদের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হয়।

মানুষ খারাপ নয়, তারা ভিন্ন - People are not bad, they are different

আমাদের একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে– মানুষ খারাপ না, তারা আপনার চেয়ে ভিন্ন। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কেউ কারও মতো নয়। প্রত্যেক মানুষ অনন্য unique পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ ভিন্ন এবং এই ভিন্নতার কারণেই তাদের আচরণও আলাদা হবে। এটি স্বাভাবিক।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করবে। তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েছে এবং সেজন্য তাদের আচরণও আলাদা হবে। এই ভিন্নতাকে আমাদের মেনে নিতে হবে।

আপনার মনে করা উচিত নয় যে সবাই আপনার মতো হবে। আপনি যেমন অন্য কারও মতো নন, অন্যরাও আপনার মতো নয়। প্রত্যেক মানুষ তার পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিন্তা ও আচরণ করে।

ভাবুন, যদি পৃথিবীর সবাই একই রকম হতো, তাহলে কেমন হতো? নিশ্চয়ই একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হয়ে যেত, তাই না? পৃথিবীর বৈচিত্রই এর সৌন্দর্য। এই ভিন্নতা সৃষ্টিকর্তার দান।

টাইপ A মানুষদের জন্য এটি মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তারা মনে করেন, সবকিছু তাদের মতো হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে অতিরিক্ত স্ট্রেস সৃষ্টি করে।

যখন আপনি অন্যের কথা শুনবেন এবং সম্ভব হলে তাদের মতামত মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, তখন দেখবেন অন্যরাও আপনার কথা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। আপনি অন্য মানুষের সঙ্গে যে আচরণ করবেন, অবচেতনভাবেই মানুষও আপনার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে।

সবসময় যে মতের মিল হবে, তা নয়। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মতের মিল হবে না। যখন আমাদের মধ্যে ভিন্ন মত তৈরি হবে, তখন কীভাবে সেগুলো সামলানো যাবে, সেটি একটি দক্ষতা। এটি শিখে নিতে হবে।

আমরা জানতে পেরেছি, মানুষ খারাপ নয়। তারা ভিন্ন এবং তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। যেমন আপনি চান আপনার পরিবারের সবাই আপনার মতো চলুক, তেমনি আপনার পরিবারেও সবাই আপনাকে সমানভাবে পছন্দ করবে না। আমাদের এডজাস্ট করতে শিখতে হবে। টাইপ A থেকে টাইপ B-এর দিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হবে। সহজ এবং নমনীয়

মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। এতে আমাদের জীবন অনেক সহজ এবং আনন্দময় হয়ে উঠবে।

এই যে টাইপ বি মানুষ বললাম, টাইপ বি মানুষের আবার ভিন্ন রকমের প্রবলেম আছে। তারা 'না' বলতে পারেন না। এটি আবার একটু অন্য ধরনের সমস্যা। 'না' বলতে না পারলে আপনি জীবনে অনেক জিনিস মিস করে যাবেন। এই 'না' বলাটা শিখতে হবে। টাইপ বি হতে গিয়ে আমরা বেশির ভাগই আবার প্যাসিভ হয়ে যাই। প্যাসিভ হচ্ছে এগ্রেসিভ এর উল্টো।

প্যাসিভ মানুষ কী করে? তাদের নিজেদের অধিকার ছেড়ে দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বেশির ভাগ সময় তাদের অধিকার ছেড়ে দেয়। না, বন্ধুরা, আমরা এটি করতে বলছি না। আবার রেগেও যেতে বলছি না। রাগ না করে কিন্তু আপনি আপনার কথাটা সুন্দরভাবে মানুষকে বোঝাতে পারেন। বোঝানোর চেষ্টা করতে পারেন। সুন্দর করে, কনফিডেন্টলি বলতে পারেন। এই টাইপের মানুষকে আমরা বলছি অ্যাসার্টিভ মানুষ, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ।

টাইপ বি মানুষ হলেই যে আপনি প্যাসিভ মানুষ হবেন, আমি সেটা বোঝাচ্ছি না। প্যাসিভ মানুষ খুব দুঃখী মানুষ হতে পারে। 'না' বলার সময় 'না' বলতে পারা–এটা একটা আর্ট। এটি আমাদের শিখতে হয়। এটি শিখার জন্য রীতিমতো ট্রেনিং আছে। আমি নিজে সাংঘাতিক রকমের প্যাসিভ ছিলাম। আমি যখন আমার টিনএইজ পার করেছিলাম, তখন আমি ভয়ংকর রকমের প্যাসিভ ছিলাম। আমি কোনো কিছুতে 'না' বলতে পারতাম না। সবকিছু মেনে নিতাম এবং সবকিছু মেনে নেওয়ার সময় আমার নিজের অনেক কষ্ট হতো। অনেক, অনেক অধিকার আমি ছেড়ে দিয়েছি মানুষকে খুশি করার জন্য। বন্ধুরা, আপনাকে সবাইকে খুশি করতে হবে না। আপনাকে সবাইকে রাগাতেও হবে না, কেমন?

আপনার রাগও করতে হবে না। রাগ না করেই আপনি আপনার কথাটা সুন্দরভাবে, সহজভাবে, শক্তভাবে, স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন। এই যে একটি জিনিস শেখা, এটি একটি আর্ট। না বলার সময় না বলতে শিখা–কত সুন্দর করে আপনি 'না' বলতে পারেন, এই জিনিসটাকে বলা হয় অ্যাসার্টিভনেস ট্রেনিং।

অ্যাসার্টিভনেস ট্রেনিং - আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার ট্রেনিং হচ্ছে - আমাদের অভিমত আমরা সহজভাবে, সুন্দরভাবে, হাসিমুখে, শক্তভাবে বলবো। উইন-উইন চিন্তা করব। আমরা নিজেদের অধিকার ছেড়ে দেবো না, অন্যদের অধিকার নষ্ট করব না। মাঝামাঝি একটা জায়গাতে এসে সেট করব। যেমন, আমরা যা চাই এবং অপর পক্ষ যা চায়, সেই দুইটার মাঝামাঝি একটা জায়গাতে এসে অবস্থান নেব।

এটাকে বলা হয় অ্যাসার্টিভনেস ট্রেনিং, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার ট্রেনিং। চমৎকার একটি ট্রেনিং। আপনারা চাইলে সেটাতে জয়েন করতে পারেন।

ইতিবাচক একটি মন তৈরি করা

বন্ধুরা, আমরা খুবই নেতিবাচকভাবে বড় হয়েছি। আমাদের চারপাশে যে পরিবেশ, সেটি আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক হতে শিখিয়েছে। তাইতো নেতিবাচক কন্টেন্ট পেলে আমরা অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে উঠি।

Good In - Good Out, Bad In - Bad Out

যদি আপনি ভালো কিছু আপনার মাথায় ঢোকান, তখনই ভালো কিছু বের হবে। ইতিবাচক মন হচ্ছে শুধু মাত্র ভালো চিন্তার কারখানা। আপনি যা দেবেন, তাই আপনি পাবেন। আপনি যা ভাববেন, তাই আপনি হবেন। আপনি যে দিকে তাকাবেন, সেটাই আপনি দেখবেন। আপনি যদি মনে করেন আপনি পারবেন, তবে আপনি অবশ্যই পারবেন, আর যদি মনে করেন এ কাজ আপনার দ্বারা সম্ভব না, বিশ্বাস করেন আপনি পারবেন না। দুই ক্ষেত্রেই আপনি কিন্তু সঠিক।

এগুলো নিয়ে আগে কথা বলেছি, আরও কথা বলব, কারণ এগুলো অনেক, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি মূল্যবান বিষয়, বন্ধুরা। আবারও বলছি, এই কথাটা–আপনি যা দেবেন, তাই আপনি ফেরত পাবেন। আপনি যা ভাববেন, তাই আপনি হবেন। আপনি যে দিকে তাকাবেন, তাই আপনি দেখবেন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পারবেন, তবেই আপনি পারবেন। আর যদি মনে করেন আপনি পারবেন না, তাহলে আপনার মন সেটি আপনাকে করতে দেবে না। সে প্রমাণ করবে যে আপনি আসলেই পারবেন না।

ইতিবাচক সংযোগ তৈরির টেকনিক - এখন আমরা মানুষের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করার টেকনিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব। ইতিবাচক সংযোগের মাধ্যমে আপনি একজন সাফল্যমণ্ডিত মানুষে পরিণত হবেন। এই যে সংযোগ, এই যে অন্য মানুষের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি, এটি আসলে আমরা কোথা থেকে শিখেছি?

আমরা শিখেছি আমাদের পরিবেশ থেকে, আমাদের পরিবার থেকে, আমাদের স্কুল থেকে, আমাদের দেশের মানুষ থেকে।

জন্মের পর থেকে আমরা আসলে ক্রমাগত শিখে যাচ্ছি। এই শিক্ষাটি যদি নেতিবাচক হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা নেতিবাচক হয়েই যায়। তাই আমরা নেতিবাচক হয়ে গিয়েছি। আমরা কেন নেতিবাচক হয়েছি? আমরা আমাদের আশপাশের মানুষদের প্রভাব থেকে নেতিবাচক হয়েছি।

সাধারণত মানুষের এই অটোমেটিক শেখার প্রক্রিয়া টিনএইজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। যারা এই ব্যাপারটি জানেন, তারা কিন্তু তাদের মাথা খোলা রাখেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা নতুন জিনিস শিখতে পারেন। কেমন? তাহলে বড় হয়েও শেখা যেতে পারে। আমাদের আচরণ বদলানো যেতে পারে।

ইতিবাচক সংযোগের স্বর্ণালি সূত্র

তাহলে আমরা এই অংশ থেকে কিছু গোল্ডেন রুল, কিছু স্বর্ণালি সূত্র শিখবো। এই সূত্রগুলো–যে আমরা জানি না, তা না। আমরা কিন্তু জানি। মুশকিল হচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা এটা মানি না। বা এটা আসলে মানা যায়, সে রকম বিশ্বাস করতে পারি না।

কিন্তু যারাই এই ক্লাসিক গোল্ডের রুল তাদের জীবনে প্রয়োগ করেছেন, অভূতপূর্ব ফল পেয়েছেন। চাইলে যে কেউ এই সূত্রগুলো শিখে আশপাশের মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন। গোল্ডেন রুল অফ কমিউনিকেশন – যা যেকোনো সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যেকোনো কালের জন্য, যেকোনো দেশের জন্য এবং যেকোনো জায়গার জন্য প্রযোজ্য, শুরু করি।

স্বর্ণালি সূত্র ১ : আজ থেকে আমি কোন মানুষের অন্যায় সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ করব না

এক নম্বর নিয়ম - আমি আজ থেকে কোন মানুষের অন্যায় সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ করব না। যদি অভিযোগ করতেই হয়, যার সমস্যা তাকে গিয়ে সুন্দর করে বলব, অন্য কাউকে না। কাকে কাকে বলা যাবে? যাদেরকে বললে আসলেই কোন লাভ হবে না, তাদেরকে আমি বলব না।

আমরা যদি কারও সমালোচনা করি বা কারও সম্পর্কে অভিযোগ করি, তাহলে কার লাভ হচ্ছে? যে মানুষ সম্পর্কে সমালোচনা করা হচ্ছে, তার কি আসলেই লাভ হচ্ছে? না, হচ্ছে না। যাকে বলছি, তার কি কোন লাভ হচ্ছে? তাও হচ্ছে না। আচ্ছা, আমার কি কোন লাভ হচ্ছে? তাও হচ্ছে না। তাহলে আমরা কেন এটা করছি? আমি বলে একধরনের অসুস্থ সান্ত্বনা পাচ্ছি, অসুস্থ ধরনের শান্তি পাচ্ছি। এই শান্তিটা কিন্তু সুস্থ শান্তি না, এটি একটি অসুস্থ শান্তি।

এটা আসলে শান্তি না; এটি একধরনের যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসবে। কোন ধর্মগ্রন্থ এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করে না। কুরআন বলেন, হাদিস বলেন, অন্য যেকোনো ধর্মগ্রন্থ বলেন, যেকোনো ভালো বই বলেন, যেকোনো শিক্ষকের কথা বলেন–তারা কেউ এই জিনিসটাকে সাপোর্ট করেন না। মানবতা এটিকে সমর্থন করে না।

কিন্তু আমরা এটি অনেক বেশি বেশি করে থাকি এবং সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো - আমরা এটাকে তেমন বড় কোন দোষ বলে মনে করি না। আমরা যা করব, সেটাই কিন্তু ফেরত পাবো। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি কখনো অনিয়ম করে না। সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিকে এমনভাবে বানিয়ে দিয়েছেন যে সেটি বরাবর কাজ করে। হাদিসগ্রন্থ বলছে, *'এটি আপনার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার মত পাপ।'* আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন? ধরুন, আপনার বাড়িতে আপনার ভাই মারা গিয়েছেন। আপনি তার গোশত কেটে বাসায় এনে রান্না করে খেতে পারবেন? কেমন লাগছে এটা পড়তে? এটা খুবই ডিসগাস্টিং, মর্মান্তিক - তাই না?

একই রকমের ঘৃণাবোধ গিবতের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তৈরি হতে হবে। এতটাই খারাপ লাগতে হবে, যখন আমরা অন্য কারও সম্পর্কে গিবত করব, অন্য কারও সমালোচনা করব বা অন্য কারও সম্পর্কে অভিযোগ করব। এটি আমরা বন্ধ করে দেবো। ঠিক?

কমিউনিকেশন স্কিলের সবার প্রথম যে রুল সেটি হচ্ছে : আমি আজ থেকে কোন মানুষের অন্যায় সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ করব না। যদি তাকে শোধরানোর ব্যাপার থাকে, তাহলে ওই মানুষটিকে আলাদা করে ডেকে সুন্দর করে বলব, যদি আমার বলার আসলেই দরকার হয়। হ্যাঁ, আমি অন্য কাউকে সাবধান করার জন্য বলতে পারি। কিন্তু নাম স্পেসিফাই না করে, যদি সম্ভব হয়। অন্য মানুষ যে কথাটা শুনলে ব্যথা পাবে, সে রকম করে না বলা। যেই কথা শুনলে যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

তিনি কষ্ট পাবেন, সে রকম কথা আমরা এখন থেকে বলব না। কথাটি যদি সত্যি হয়, তারপরও বলব না। একটি রুল মনে রাখবেন: এই কথাটি বলে কি কারও লাভ হচ্ছে? ধরুন, আমি কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে কিছু একটা কিনেছি এবং কিনে ঠকেছি। আমি অবশ্যই সেটি সম্পর্কে কমপ্লেইন করতে পারি, তাই না? সেটি সম্পর্কে আমি সাবধান করতে পারি, যাতে অন্য মানুষ না ঠকে। কিন্তু এমনি এমনি, কোন কারণ ছাড়া আমরা এটা করব না। কাজটি কিন্তু অনেক কঠিন কিন্তু এর পুরষ্কার অনেক মধুর।

স্বর্ণালি সূত্র ২ : আমি সবসময় মানুষের ইতিবাচক ও ভালো প্রশংসা করব

ইতিবাচক এবং ভালো প্রশংসা, বন্ধুরা, প্রশংসা সাংঘাতিক একটি ম্যাজিক্যাল জিনিস। যখন কোন মানুষকে সত্যিকারভাবে প্রশংসা করা হয়, তখন কিন্তু তার মধ্যে অনেক বেশি উৎসাহ আসে। সে ওই কাজটা আরও অনেক ভালোভাবে করতে পারে। আমরা আজ থেকে মানুষের মধ্যে ভালো ভালো গুণ গুলো খুঁজে বের করব এবং সেগুলো তাকে সুন্দর করে বলবো। আমার দিনের একটা গোল এ রকম থাকতে পারে যে আমি আজ কোনো একজন মানুষকে খুঁজে বের করব এবং তাকে তার প্রশংসার একটি কথা বলবো।

আপনি নিজে কিন্তু চান যে মানুষ আপনার কাজের প্রশংসা করুক। আপনার কাজটি রেকগনিশন পাক। আমরা সবাই এটা চাই। কিন্তু অন্য কাউকে দিতে চাই না। যেই জিনিস আপনি চাইবেন, আপনি সবসময় সেই জিনিস মানুষের জন্য করবেন।

আপনি যখন মানুষের সমালোচনা করেন, মানুষও কিন্তু আপনার সমালোচনা করে এবং এটি আপনি জানেন। আপনি যখন মানুষের প্রশংসা করবেন, সত্যিকারের প্রশংসা করবেন, আপনার অজান্তে সেটি অনেক বেশি হয়ে আপনার কাছেই ফেরত আসবে। আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এটি অবশ্যই আসে, উইদাউট এনি মিস!

আমরা মানুষের ভালো ভালো গুণগুলো খুঁজে বের করব এবং সেগুলো তাকে বলব। ভালো জিনিসগুলো তাকে বলব, পচা জিনিসগুলো না।

স্বর্ণালি সূত্র ৩ : অন্য মানুষের মধ্যে ইতিবাচক আগ্রহ জাগিয়ে তুলব

অন্য মানুষের ইতিবাচক কাজে তাকে আগ্রহী করে তোলা। যেমন, *'ওয়াও, আপনি তো খুব ভালো কাজ করছেন। আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'*

তার কী কী সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যগুলো নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলব এবং সেগুলোকে সাহায্য করার চেষ্টা করব, সেগুলোকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি যদি নিজের উন্নতি চান, তাহলে তো অবশ্যই অপরের উন্নতির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্য মানুষের ভালো করার কথা বলা হচ্ছে, অন্য মানুষের খারাপ থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে। এই সমস্ত কথাগুলো কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলিও বলছে। সমস্ত টিচাররা কিন্তু এই কথাগুলোই বলছেন। সব মহাপুরুষরাও এই কথাগুলোই বলে গেছেন। তাই কথাগুলো শাশ্বত সত্য। এগুলো কখনো পুরানো হবে না, কখনো বিলুপ্ত হবে না।

স্বর্ণালি সূত্র ৪ : অন্য মানুষের প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে উঠব

আমি অন্য মানুষের প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে উঠবো। সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা মানে হচ্ছে অন্য মানুষ সম্পর্কে আমরা আগ্রহ দেখাব। অন্য মানুষ তখন আপনার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখাবে।

আমি যখন আপনার সম্পর্কে আগ্রহী হব, যেমন আপনি কী করেন সেটি জানতে চাইব, আপনার কী কী ভালো লাগে, কী কী হবি আছে, কী কাজ করতে আপনি পছন্দ করেন, এই জিনিসগুলো যখন আপনার কাছে জানতে চাইব, তখন মানুষ আমার খুব ভালো বন্ধু হবে। আমরা অন্যের

কথা শুনতে আগ্রহী হই না, তাই না? আপনি যখন অন্য মানুষ সম্পর্কে আগ্রহী হবেন, তখন সেই মানুষটা তার কথা বলতে উৎসাহ পাবে। সে তার কাজে উৎসাহিত হবে।

অন্য মানুষের প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা এটি খুব দারুণ একটি ব্যাপার। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাসায় নিশ্চয়ই কুকুর বা বিড়াল পোষেন। এই প্রাণীগুলোকে আমরা একদম নিঃস্বার্থভাবে পছন্দ করি, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি।

এবং তারাও কিন্তু মন প্রাণ উজাড় করে দিয়ে আমাদেরকে ভালোবাসে। একটি কুকুর আপনাকে কেন ভালোবাসে? আপনি তাকে খাবার দেন বলে? না বন্ধুরা, সেজন্য কিন্তু না। আপনি যেটুকু খাবার দেন তার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসা সে আপনাকে ফেরত দেয়। সে আপনার প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়, সেজন্যই আপনি তাকে এত বেশি ভালোবাসেন এবং সেও আপনাকে ভালোবাসে।

স্বর্ণালি সূত্র ৫ : সুন্দর করে হাসব

পাঁচ নম্বর গোল্ডেন রুল হচ্ছে সুন্দর করে হাসা। সুন্দর করে হাসতে পারা একটি দারুণ ব্যাপার। চাইনিজ একটি প্রবাদ আছে, তারা বলে, 'You don't need to open shop if you don't know how to smile' আপনার দোকান খোলার দরকার নেই যদি আপনি হাসতে না জানেন। হাসিমুখের মানুষকে সবাই পছন্দ করে। তাদের সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আমাদের দেশে একটি ভুল কথা প্রচলিত আছে যে ব্যক্তিত্ব ধরে রাখতে হলে গম্ভীর মুখে থাকতে হয়। একদম ভুল কথা। বরং সুন্দর করে হাসতে পারলে, ব্যক্তিত্বে চার্ম আসে, মানুষ আপনাকে পছন্দ করে। আর আপনিও স্ট্রেস ফ্রি থাকতে পারেন। এটি আপনার ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল হেল্‌থের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস।

বন্ধুরা, আমরা যারা সুন্দর করে হাসতে পারি, তারা তো ব্লেস্‌ড। কিন্তু যারা একটু কম পারি, তারা আজ থেকেই প্র্যাকটিস করা শুরু করব। আয়নার সামনে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন যে, এই হাসিটিতে আমাকে ভালো লাগে নাকি ওই হাসিটিতে ভালো লাগে।

স্বর্ণালি সূত্র ৬ : মানুষের সুন্দর নামটি ধরে তাকে ডাকব, তাচ্ছিল্যের সাথে বা বিকৃতভাবে নয়

আমি আজ থেকে মানুষের সুন্দর নামটি ধরে ডাকব, তার পেশা ধরে, তাচ্ছিল্যের সাথে বা বিকৃতভাবে নয়। এটি আমাদের এই অঞ্চলের একটি নিয়ম হয়ে গিয়েছে যে আমরা মানুষকে সুন্দরভাবে সম্বোধন করি না।

আমরা মানুষের সুন্দর নামটিকে বিকৃত করে ডাকি, তাই না? এটি কিন্তু সাংঘাতিক একটি ভুল কাজ। এটি শুধু ভুল নয় বরং এটি খুব বড় একটি অপরাধ। এভাবে আমরা ডাকতে পারি না, যেভাবে ডাকার ফলে একজন মানুষ অসন্তুষ্ট হতে পারে।

যেমন, আমরা রিকশাওয়ালাকে কী বলি? *'এই খালি'*, তাই না? *'এই ঠেলা'*, *'এই কলা'*–এভাবে তার পেশা ধরে ডাকি। আপনাকে যদি কেউ এভাবে ডাকে, তাহলে কেমন লাগবে? *'এই ছাত্র'*, *'এই হুজুর'* *'এই মাস্টার'*, *'এই ডাক্তার'*–কেমন লাগে? ভালো লাগে না, তাই না?

মানুষের নিজের নামটি হচ্ছে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে পছন্দের নাম। এই ব্যাপারটি আমরা সবসময় মনে রাখবো। একটি নিয়ম আমরা মনে রাখব - আমরা মানুষ থেকে যে রকম ব্যবহার আশা করব, আমরাও সে রকম ব্যবহার মানুষের সাথে করব। এটি হচ্ছে এ স্কিল এর মূল সূত্র। এইটুকু মনে রাখলেই হবে। আমরা মানুষকে তার বয়স অনুযায়ী একটা সুন্দর নামে ডাকতে পারি। নাম জানলে নাম দিয়ে, আর নাম না জানলে মামা, চাচা, ভাই–তাই না? এ রকমভাবে আমরা ডাকতে পারি।



আমরা নামকে বাঁকা করে ডাকব না। বিশেষ করে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এই ব্যাপারটা দেখা যায় যে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা নামগুলো উচ্চারণ করে। তাহলে, যার নাম বলা হচ্ছে, সে নিশ্চয়ই খুশি হয় না। সে হয়তো কিছু বলে না, হয়তো এটাকে জোক বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু আসলেই সে মাইন্ড করে। আপনিও মাইন্ড করবেন, কেমন?

তাহলে, পজিটিভ মানুষ, যাদের কমিউনিকেশন স্কিল অনেক ভালো, তারা কখনো মানুষের অপছন্দের নামে তাকে ডাকে না। সুন্দর নাম ধরে তাকে ডাকব। এটি কমিউনিকেশন স্কিলের দারুণ একটি লেসন।

স্বর্ণালি সূত্র ৭ : ভালো শ্রোতা হয়ে উঠব,
মানুষকে তার কথা বলতে উৎসাহ দেব

আমি ভালো শ্রোতা হব। অন্যদের নিজের কথা বলতে উৎসাহ দেব। আমরা অনেকেই কথা বলতে অনেক বেশি পছন্দ করি। এটি খারাপ কোন ব্যাপার না। কিন্তু, অন্য মানুষ যখন আমার সাথে কথা বলবে, তখন আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথাটি শুনব।

ধরেন, আপনি একজন ডাক্তারের কাছে গেলেন বা কারও কাছে পরামর্শের জন্য গেলেন, কিছু তার উপদেশ শোনার জন্য।

এখন, তিনি যদি অনেক বেশি কথা বলতে থাকেন আর আপনার কথা যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনেন, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না, তাই না?

এখন, আপনি আমার কথা শুনছেন। আপনি যদি আমার সামনে থাকেন আর আমি যদি আপনাকে দেখি যে আপনি অমনোযোগী, তাহলে কি আমার কথা বলতে আসলে ইচ্ছা করবে? ইচ্ছা করবে না, তাই না? তাহলে এই ব্যাপারটি আমরা অন্য মানুষের ক্ষেত্রেও মনে রাখব।

আমরা যখন অন্য মানুষের সাথে কথা বলব এবং সে যখন কথা বলবে, আমরা নিশ্চিত করব যে আমরা তার কথাটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কমিউনিকেশন স্কিলের একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে 'অ্যাক্টিভ লিসেনিং।'

আমরা যখন কথা শুনব, তখন নিশ্চিত করব যে আমরা তার কথা আসলেই শুনছি। আমরা তার প্রতি আমাদের আগ্রহটি ধরে রাখব। মাঝে মাঝে তাকে প্রশ্ন করতে পারি, মাঝে মাঝে *'আচ্ছা, তাই নাকি?, তারপর?'* – এই ধরনের কথা বলতে পারি। তাহলে সে বুঝতে পারবে যে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছি। আপনি শুধু এই একটি স্কিল যদি আয়ত্ত করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনার প্রচুর বন্ধু হবে এবং অনেক মানুষ আপনার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। এটি একটি ম্যাজিক্যাল ট্রিক।

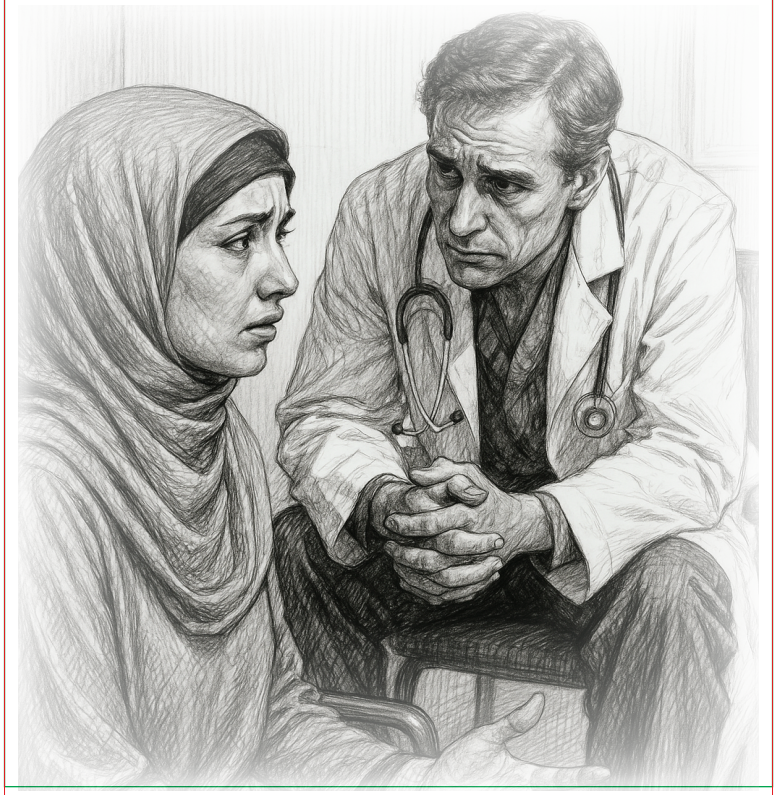

আমরা এখন থেকে মানুষের কথা শুনব এবং অ্যাকটিভলি শুনব। সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে শুনব।

স্বর্ণালি সূত্র ৮ : অন্য মানুষের আগ্রহ/উৎসাহ নিয়ে কথা বলা

আমি অন্যের উৎসাহ নিয়ে কথা বলব। অন্যের উৎসাহ মানে, অন্য মানুষ যে জিনিস পছন্দ করে, তার পছন্দ নিয়ে কথা বলব। যেমন, একজনের হবি হচ্ছে ছবি আঁকা। তাহলে, আমি তার ছবি আঁকা নিয়ে তার সাথে কথা বলতে পারি।

সে কী ভালোবাসে, কী করতে পছন্দ করে, সেই জিনিস নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি।

অন্য মানুষ যা পেতে চায়, সেটি তাকে আমরা পেতে সাহায্য করতে পারি। অন্য মানুষকে গুরুত্ব দেব এবং মন থেকে সেটা করব। আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে এখানে সবকিছুই ঘুরেফিরে শুধু অন্য মানুষের ইন্টারেস্ট নিয়ে হচ্ছে। আপনার নিজের ইন্টারেস্ট নিয়ে কিন্তু হচ্ছে না। অন্য মানুষের সুবিধা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। অন্য মানুষের অসুবিধা না করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্য মানুষকে তার জীবন সহজ করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

আপনি যখন অন্য মানুষকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন, অন্য মানুষের জীবনকে সহজ করতে চেষ্টা করবেন, অন্য মানুষ বা অন্য সবকিছু - সৃষ্টিকর্তা পুরো প্রকৃতির মাধ্যমে আপনার জীবনকে সহজ করে দেবেন। এটি আসলে আমি মুখের কথা বলছি না। এটি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সাথে মিশে, মানুষের সাথে কথা বলে, তাদেরকে এক্সপেরিয়েন্স করে, এই পৃথিবীকে এক্সপেরিয়েন্স করে–এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলছি।

তাহলে, আমরা উপকারী একজন সত্ত্বা হিসেবে পৃথিবীতে থাকব। আমাদের আচরণে, আমাদের কথায়, আমাদের সবকিছুতে, আমাদের হাসিতে, আমাদের পরিপূর্ণ সত্ত্বা-টি নিয়ে আমরা মানুষের কাজে লাগব।

স্বর্ণালি সূত্র ৯ : 'ধন্যবাদ' ও 'দুঃখিত' বলতে কার্পণ্য করব না

'সরি' এবং *'থ্যাঙ্ক ইউ'* – এই কথাগুলো বলতে কখনো কার্পণ্য করব না। যখনই আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কোন ভুল কথা বলেছি বা ভুল আচরণ করেছি, কোন ভুল আমাদের দ্বারা হয়ে গেছে। ভুল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, তাই না? টাইপ 'এ' মানুষ যারা, তারা এটি কখনো বুঝতে পারে না যে তারা ভুল করছে এবং কখনো তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে না এবং সেজন্য তারা নিজেদের মধ্যে স্ট্রেস সঞ্চয় করতে থাকে।

তাহলে এই ব্যাপারটি আমরা মনে রাখবো। 'সরি' বলতে কখনো কার্পণ্য করব না। যেকোনো উপকার আমরা মানুষ থেকে পাব, সাথে সাথে তাকে কী বলব? *'ধন্যবাদ'* বলব, *'থ্যাঙ্ক ইউ'* বলবো। এই কথা দু'টি বলতে আমরা কখনো কোন রকমের কার্পণ্য করব না। আপনার লাইফ সিম্পলি ওয়ান্ডারফুল হয়ে যাবে।

স্বর্ণালি সূত্র ১০ : 'গিভ' - 'টেক' - 'গিভ'

Give - Take - Give - আমরা বলি 'গিভ অ্যান্ড টেক।' এখানে কী বলছে? মানে, কমিউনিকেশনের স্বর্ণালি সূত্র আমাদেরকে বলছে - দাও - নাও - আবার দাও।

সবসময় আপনি দিয়ে যাবেন। আপনি অবশ্যই মানুষ থেকে কিছু পাবেন প্রতিদানে। কিন্তু তারপরও তাকে কী করবেন? লাস্ট কে দেবে? ইয়েস, আপনি দেবেন। ওকে? মানে, শেষের দেওয়াটা যেন আপনার থাকে। তার মানে, সবসময় পৃথিবীর মানুষকে আপনার কাছে ঋণী করে রাখবেন। আমরা সবসময় পেতে চাই। কিন্তু আপনি দিয়ে দেখেন কী ম্যাজিকটা হয়। তাহলে, এই চমৎকার একটি টেকনিক আমরা শিখলাম। আমরা দেবো, নেব, এবং আবার দেবো। গিভ, টেক, অ্যান্ড গিভ।

আমরা সবসময় শেষে দেবো।

সংবেদনশীলতা

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে? পৃথিবীর অন্য যেকোনো মানুষ সম্পর্কে আমাদের কিছু প্রিজুডিস/পূর্ব নির্ধারিত বিচার থাকে, কিছু আইডিয়া থাকে, কিছু ধারণা থাকে। ধারণা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু নেগেটিভ আইডিয়া আমরা যেন না রাখি।

যেমন, আমরা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি একটা বিরূপ চিন্তা কিন্তু রাখি। বা, অন্য বিশ্বাসের মানুষের প্রতি, বা যাদের চামড়ার রং আমাদের চেয়ে ভিন্ন, তাদের প্রতি। নির্দিষ্ট কোন মহাদেশের বা নির্দিষ্ট কোন দেশের মানুষের প্রতি, বা নির্দিষ্ট কোন জেলার মানুষের প্রতি। তাই না? আমাদের অনেক সময় বিরূপ আইডিয়া থাকে। এই জিনিস কমিউনিকেশন স্কিলের জন্য খুব খারাপ। এ ধরনের একজন মানুষ যখন আপনার সামনে আসবেন, তার সাথে আপনাকে কমিউনিকেট করতে হবে।

আমাদের মনের ভেতরে যেই খারাপ জিনিসগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের চেহারায় চলে আসবে।

যখন আপনি ওপেন হয়ে যাবেন, সবার প্রতি সমান অনুভূতি, একটি sensibility একটি সুন্দর মানসিক অবস্থা যখন তৈরি করতে পারবেন, তখনই কিন্তু আপনি সত্যিকার ভাবে সফল হতে পারবেন।

এবং এই অনুভূতিটি এক ডিভাইন শক্তি আপনাকে দেবে। সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে অফুরন্ত রহমত আপনার উপর নাজিল হবে এবং সেজন্য, আপনার জীবন simply সফল হয়ে যাবে।

অনেক কথা হলো আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন টেকনিক নিয়ে, কমিউনিকেশন স্কিলস নিয়ে। এই কথাগুলো আসলে কোন কাজে লাগবে না যদি আমরা একটি অ্যাকশন প্ল্যানিং-এ না যাই। অ্যাকশন হচ্ছে আসল জিনিস। জানা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, সবার আগে তো জানতে হবে, তাই না? কিন্তু জানাই সব না, জানাটাই যথেষ্ট না। আসল জিনিস হচ্ছে

একটি অ্যাকশন প্ল্যান, একটি প্ল্যানিং। প্ল্যানিং যখন ঠিকমতো হবে, তখন কিন্তু আসলে কাজও ঠিকমতো হবে, কাজ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আসেন, তাহলে আমরা আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানিং-এ চলে যাব।

এই যে আমরা টেকনিকগুলো শিখলাম, কোন কোন টেকনিক আমরা সবার আগে কাজে লাগাতে শুরু করব এবং কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করব। আমরা আরেকটু সহজ করে দিচ্ছি, এক্সাম্পল দিচ্ছি।

যেমন হচ্ছে ফ্যামিলি, পরিবার। আমরা একটি পরিবারে থাকি। পরিবারের কোন কোন সদস্যদের উপর আমরা আজকের শেখার টেকনিকগুলো ব্যবহার করতে শুরু করব। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর দিয়ে আমরা সর্ট আউট করে ফেলবো। আপনাদেরকে ওয়ার্কশিট দেওয়া হচ্ছে এখানে। ওয়ার্কশিটে কীভাবে কার উপর কোন জিনিসটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, সেটির আমরা একটি প্ল্যানিং করে ফেলবো।

এই সপ্তাহে কয়টা টেকনিক, কোন কোন মানুষের সাথে এপ্লাই করব এবং এপ্লাই করার পর আমরা একটি পজিটিভ রেজাল্ট পাবো।

এই যে টেকনিকগুলো বললাম, এই টেকনিকগুলো যখন আপনি প্ল্যান করবেন কারও সাথে, যে অমুক মানুষের সাথে আমরা এই আচরণটি আজকে করব। আপনার বাসায় যে কাজের মানুষটি helping hand আছেন, তার সাথে আমরা গতানুগতিক ব্যবহার করি, যে রকম আমরা করে আসছি। আমরা আজকে তার সাথে একটু পজিটিভ ব্যবহার করে দেখব।

এই যে যে নিয়মগুলো বললাম, তার থেকে কোন একটি নিয়ম - যেমন পাঁচ নম্বর রুলটি ছিল সুন্দর করে হাসি দেয়া। আমরা যদি আজকে তার সাথে এই হাসির ব্যাপারটি ইমপ্লিমেন্ট করি, নিশ্চয়ই কোন একটা রেজাল্ট পাব - বা, আমরা যদি দুই নম্বর রুলটি যে তার

একটি কাজের প্রশংসা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তার থেকে একটি পজিটিভ রেজাল্ট পাবো। কিছু একটা রেজাল্ট তো পাবো।

এই রেজাল্টটা আমরা আমাদের পজিটিভ বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আপনি আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন যে, আমি এইরকম করেছি, এ রকম করে একটি রেজাল্ট পেয়েছি। এই রেজাল্টটা পেয়েছি।

এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করতে পারব। বেশির ভাগ জিনিসে আমরা জানি কিন্তু আমরা মানি না। কারণ আমাদের একটা অ্যাকশন প্ল্যান থাকে না। যখন আপনি প্ল্যানিং করবেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করবেন, তখনই কিন্তু কাজগুলো হয়ে যাবে।

সফল মানুষ এবং অসফল মানুষের মধ্যে এইটা হচ্ছে পার্থক্য। সফল মানুষ এবং অসফল মানুষ, এ দু'টি দলই কিন্তু অনেক জিনিস জানে। কিন্তু সফল মানুষেরা কিছু জিনিস এপ্লাই করে ফেলেন এবং অসফল মানুষেরা ওই জিনিসগুলো এপ্লাই করে না। কারণ তাদের কোন প্ল্যানিং থাকে না। তারা শিখে আর ভুলে।

যেমন, আপনাদের কাজের জায়গাতে, যে যেখানে কাজ করেন বা আপনাদের অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে বা আপনাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বসদের সাথে বা সহকর্মীদের সাথে, কোন কোন জিনিসগুলো এপ্লাই করবেন, সেটি একটি অ্যাকশন প্ল্যানের মাধ্যমে হতে পারে।

এই সপ্তাহে কয়টা জিনিস এপ্লাই করবেন? সপ্তাহ শেষ হবার পর আপনি একটু হিসাব নেবেন যে কয়টা এপ্লাই করতে পারলাম এবং কী কী রেজাল্ট আমরা পেলাম।

যেমন, ফ্রেন্ডসদের সাথে, বন্ধুদের সাথে কোন কোন জিনিসটা এপ্লাই করলেন? যেমন, আপনি একজন ফ্রেন্ডকে একটি বাজে নামে ডাকতেন।

আজ আপনি গিয়ে আপনার সেই ফ্রেন্ডকে বলতে পারেন যে, ভাই, তোমাকে আমি এই নামে আর ডাকব না, সুন্দর করে ডাকব এখন থেকে।

হ্যাঁ। তাহলে, এইভাবে করে, কোনটি কোনটি আপনি এপ্লাই করবেন, সেটি আপনি আসলে ঠিক করবেন। আমি ঠিক করে দেবো না। এটি আপনাদের জন্য ওপেন। আপনারা নিজেরা ঠিক করে নেবেন।

কিন্তু, রেজাল্ট পাওয়ার পর আমাদেরকে জানাবেন, কেমন?



অ্যাকশন প্ল্যানিং

কমিউনিকেশন স্কিল - স্বর্ণালি সূত্রের চার্ট

স্বর্ণালি সূত্র	কার কার ওপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করবেন
১. আজ থেকে আমি কোন মানুষের অন্যায় সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ করব না	
২. আমি সবসময় মানুষের ইতিবাচক ও ভালো প্রশংসা করব	
৩. অন্য মানুষের মধ্যে ইতিবাচক আগ্রহ জাগিয়ে তুলব	
৪. অন্য মানুষের প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে উঠব	
৫. সুন্দর করে হাসব	
৬. মানুষের সুন্দর নামটি ধরে তাকে ডাকব, তাচ্ছিল্যের সাথে বা বিকৃতভাবে নয়	
৭. ভালো শ্রোতা হয়ে উঠব, মানুষকে তার কথা বলতে উৎসাহ দেব	
৮. অন্য মানুষের আগ্রহ/উৎসাহ নিয়ে কথা বলব	
৯. 'ধন্যবাদ' ও 'দুঃখিত' বলতে কার্পণ্য করব না	
১০. Give - Take - Give প্র্যাকটিস করব	

নোট –

পেশাগত চাপ ব্যবস্থাপনা

বুদ্ধিমত্তার সাথে পেশা নির্বাচন করা। খুব ভালোভাবে বাছাই করে তারপর কাজটি শুরু করা। আসলে আমি কাজটি পছন্দ করতে পারবো কিনা, অনেক লম্বা সময় ধরে আমরা এই কাজটি চালিয়ে যেতে পারবো কিনা - সেটি সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হওয়া।

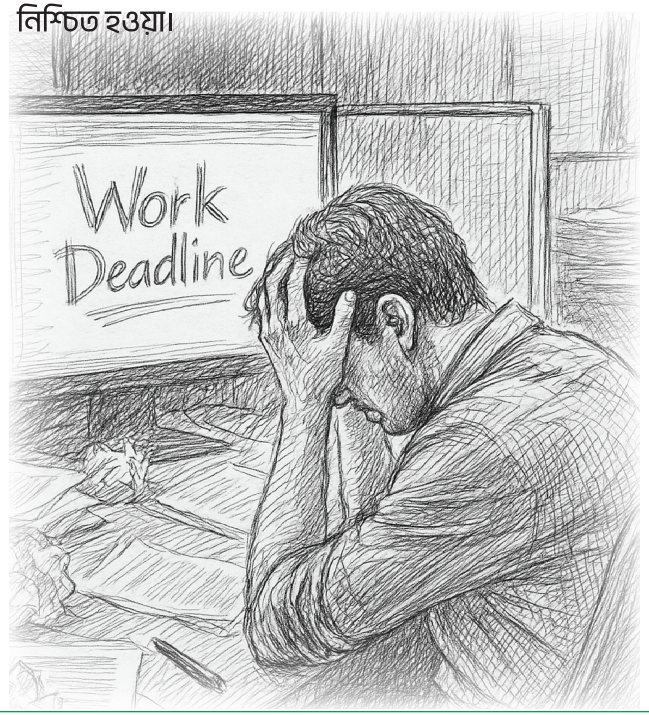

আমরা যেখানে কাজ করি, সেখান থেকে বড় বড় স্ট্রেস আসতে পারে। বেশির ভাগ সময় আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা যে কাজটি করি, সেটি আমরা পছন্দ করি না। অথবা প্রথম কিছুদিন পছন্দ করার পরেই সেটি আর ভালো লাগে না। আমরা সাধারণত যে পেশায় অল্প সময়ে বেশি টাকা আয় করা যায় সেটিকেই প্রফেশন হিসেবে নিতে চাই, কাজটিকে মন থেকে পছন্দ না করেই।

বুদ্ধিমত্তার সাথে পেশা নির্বাচন

সবার প্রথমে যে স্টেপটি অবশ্যই নেওয়া উচিত, বুদ্ধিমত্তার সাথে পেশা নির্বাচন করা। খুব ভালোভাবে বাছাই করে তারপর কাজটি শুরু করা। আসলে আমি কাজটি পছন্দ করতে পারব কিনা, অনেক লম্বা সময় ধরে আমরা এই কাজটি চালিয়ে যেতে পারব কিনা–সেটি সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হওয়া। কীভাবে সেটি নিশ্চিত হওয়া যাবে? ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। ক্যারিয়ারের শুরুতেই বিভিন্ন রকমের কোর্স করবেন, বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং প্রোগ্রামের ভেতর দিয়ে যাবেন। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কোন কাজটি ভালো লাগে আর কোনটি লাগে না।

বেতন নয়, কাজের আনন্দ টার্গেট করতে হয়

যদি আপনি বেতনকে টার্গেট করে আপনার ক্যারিয়ার নির্ধারণ করেন, তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকে যে আপনি সেই কাজটি পছন্দ করতে পারবেন না। প্রফেশনাল স্ট্রেস থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি, সেটা হচ্ছে আপনি যে কাজটি করতে ভালোবাসেন সেটিকে আপনার প্রফেশনে রূপান্তরিত করা।

আমি যখন ২২-২৩ বছর বয়সের ছিলাম, তখন আমি একটা কম্পিউটার লার্নিং সেন্টারে কম্পিউটার শিখতাম। আমি খেয়াল করলাম যে শেখাতে আমার খুব ভালো লাগে। যখন কোন একটা জিনিস আমি কাউকে

বোঝাই বা বোঝানোর চেষ্টা করি, তখন সেটি সে খুব ভালো মতো বুঝতে পারে এবং আমিও সেটাকে খুব এনজয় করি।

আমার তখনই মনে হলো–শিক্ষকতাই আমার প্রফেশন হওয়া উচিত। আমি তখনই বুঝতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমি আমার প্রফেশন নির্ধারণ করি। এখনও পর্যন্ত আমি সেই একই পেশায় আছি। আমি খেয়াল করলাম, আইটি বিষয়টিও আমি খুব এনজয় করি, আমার ভালো লাগে। তো, আমি কী করলাম? আমি আইটি এবং শিক্ষকতাকে একসাথে করে একজন আইটির শিক্ষক হয়ে গেলাম। আশা করি, আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে এটি করতে হয়।

এর আগে কিন্তু আমি আরও অনেক রকমের কাজ করেছিলাম। আমি অনেক রকমের কোর্স করেছিলাম, বিভিন্ন রকমের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলাম। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম যে শিক্ষকতা টাই, মানুষকে বোঝানোর এ ব্যাপারটাই, সবচেয়ে ভালো আমি করতে পারি এবং আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই এই কাজটা করতে–তখনই আমি নিজেকে একজন প্রফেশনাল শিক্ষক হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করি। একটি জাপানিজ টেকনিক আছে যার নাম 'ইকিগাই।' এটিকে ফলো করলে আপনি একটি সুন্দর প্রফেশন নিজের জন্য নির্ধারণ করতে পারবেন। ইকিগাই নিয়ে একটু পর কথা বলছি।

নিজেকে দক্ষ করে তোলা

আপনার প্রফেশনে আপনাকে দক্ষ হতে হবে। আপনাকে খুব ভালোভাবে সেই কাজটি জানতে হবে। অবশ্যই, আপনার যদি আগ্রহ থাকে, তাহলেই আপনি সেটি জানতে পারবেন।

এই সময়ের সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিস হচ্ছে তথ্য। আপনি খুব সহজেই যে কোন জিনিস শিখতে পারেন, যদি আপনি চান। অ্যাকাডেমিক

লেখাপড়ার উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারবেন না। সাথে সাথে আপনাকে অবশ্যই কিছু স্কিল শিখতে হবে। আপনি যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করবেন, সেই স্কিলটি খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে। শুধু জানা থাকলে হবে না। আজকাল কিন্তু সব জ্ঞানই প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত যে নলেজগুলো আছে, সেগুলো। আমাদেরকে প্রযুক্তির আপগ্রেডের সাথে সাথে নিজেকে আপগ্রেড করতে হয়। নতুন কী কী আসছে, সেই সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো ধারণা রাখতে হয়। নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস তৈরি করতে হয়।

'না' বলতে না পারা

প্রফেশনাল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে আরেকটি বড় সমস্যা হয় সেটি হলো *'না'* বলতে না পারা। আপনার বস যদি অনেক বেশি কাজ চাপিয়ে দেন, তখন সুন্দর করে না বলতে হবে। অনেকেই বসকে *'না'* বলতে পারেন না। আবার কেউ কেউ এমনভাবে বলেন যে বসের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, ঝগড়াও হয়ে যায়। বসকে বুঝিয়ে দিতে হবে - আপনাকে এই বাড়তি কাজ দিলে সময়মতো শেষ করা যাবে না। অবশ্যই সেক্ষেত্রে বসের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে, তবেই বলতে পারবেন।

কাজ ভাগ করে নেওয়া

অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলে সেটি সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে নেব। কাজ ভাগ করা মানে চাপ ভাগ করা। লক্ষ্য করুন আপনার বস কীভাবে তার কাজগুলো আপনাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। একই পদ্ধতি আমরাও ব্যবহার করতে পারি।

অফিস পলিটিক্স

অফিসের পলিটিক্স থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়। অফিসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পলিটিক্স আমরা প্রায় সব অফিসেই দেখতে পাই।

এর মধ্যে নিজেকে জড়ানো ঠিক হবে না। আপনাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। অফিস পলিটিক্স থেকে যদি আপনি দূরে থাকতে পারেন, তাহলে আপনার প্রফেশনাল লাইফ অনেক বেশি স্ট্রেস-ফ্রি হবে।

সময়নিষ্ঠা

আপনি সময়মতো অফিসে আসবেন এবং সময়মতো অফিস থেকে বের হয়ে যাবেন। সময়মতো অফিসে আসার এই ব্যাপারটি খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি এমনভাবে ঘর থেকে বের হবেন যাতে সময়মতো আপনি অফিসে পৌঁছে যান এবং কাজ শেষ হলে বা অফিসের টাইম শেষ হলে অফিসে বসে থাকার কোন অর্থ নেই। আপনি অবশ্যই সময়মতো অফিস থেকে বের হয়ে যাবেন। বাসায় আপনার আরও অনেক কাজ আছে যেমন পরিবারকে সময় দেওয়া, বাচ্চাদের সাথে গল্প করা - এটি আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

আপনি যদি ব্যবসা করেন রাত-দিন ব্যবসা করার কিছু নাই। যারা জব করেন তারা ৮ ঘণ্টা জব করেন আর যারা ব্যবসা করেন তারা ২৪ ঘণ্টাই ব্যবসা করেন, মনে হয় ঘুমের সময়ও ব্যবসা করেন। না বন্ধুরা, আপনার কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে সেই সময়ের মধ্যেই আপনি কাজটি করবেন আপনি যদি রাত-দিন কাজ করতে থাকেন তাহলে আপনার অন্যান্য যে সেক্টরগুলো আছে সেখান দিয়েই স্ট্রেস চলে আসবে। আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট হবে পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট হবে।

ইকিগাই

ওকিনাওয়ার এক সকাল - ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। জাপানের ওকিনাওয়ার এক ছোট উপকূলীয় গ্রামে, ৯২ বছর বয়সী একজন জেলে, যার নাম হিরোশি, ছোট কাঠের নৌকাটি নিয়ে শান্ত সমুদ্রের দিকে রওনা হলেন। তার কাঁধের জাল পুরনো, চামড়ায় শত ঋতুর ছাপ, কিন্তু তার চোখেমুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

এক পর্যটক, যিনি এই 'শতবর্ষীদের দ্বীপে' দীর্ঘায়ুর রহস্য জানতে এসেছেন, হিরোশিকে জিজ্ঞেস করলেন, *'এই বয়সেও প্রতিদিন এত ভোরে সমুদ্রে যান কেন? আপনার তো এখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা।'*

হিরোশি মৃদু হেসে আকাশের দিকে তাকালেন। বললেন, *'সমুদ্র আমাকে ডাকে। ভোরের বাতাস, জলের শব্দ, মাছ ধরার জন্য অপেক্ষা–এগুলো শুধু আমার কাজ নয়। এগুলো সকালে আমার ঘুম থেকে ওঠার কারণ। এটাই আমার ইকিগাই'।*

ইকিগাই: শুধু একটি শব্দ নয়

'ইকিগাই' (生き甲斐) শব্দটি আজকের পৃথিবীতে খুব জনপ্রিয় হলেও এর শিকড় অনেক গভীরে। এটি কোনো আধুনিক সেলফ-হেল্প ট্রেন্ড নয়, বরং জাপানি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারণা করা হয়, শব্দটির উৎপত্তি জাপানের হেইয়ান যুগে (৭৯৪ থেকে ১১৮৫ সাল)। এটি দুটি জাপানি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:

ইকি (生き) - যার অর্থ "জীবন" বা "বেঁচে থাকা"।

গাই (甲斐) - যার অর্থ "মূল্য", "যোগ্যতা" বা "ফসল"।

একসাথে এর অর্থ দাঁড়ায়, "বেঁচে থাকার কারণ" বা "জীবনের উদ্দেশ্য"। এটি সেই জিনিস, যা আপনাকে প্রতিদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রেক্ষাপট: কেন এটি আজ এত প্রাসঙ্গিক?

আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যেখানে জীবনকে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। আমাদের কাজ এক জায়গায়, ভালোবাসা বা প্যাশন আরেক জায়গায়, সমাজের প্রতি দায়িত্ব তৃতীয় জায়গায়, আর অর্থ উপার্জন চতুর্থ জায়গায়। এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের মধ্যে এক ধরনের শূণ্যতা ও উদ্দেশ্যহীনতার জন্ম দেয়।

আমরা প্রায়ই ভাবি:

"আমি যা করছি, তা কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ?"

"আমি কি শুধু টাকার জন্যই বেঁচে আছি?"

"আমার জীবন কি এর চেয়েও বেশি কিছু হতে পারত?" এখানেই 'ইকিগাই'-এর আধুনিক ধারণাটি একটি শক্তিশালী সমাধান হিসেবে উঠে আসে। এটি জীবনের এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্রিত করে একটি অর্থপূর্ণ সমগ্র তৈরি করার একটি নকশা।

ইকিগাই খুঁজে পাওয়ার নকশা: চারটি বৃত্তের সংযোগ

আধুনিক বিশ্বে 'ইকিগাই'-কে চারটি প্রধান প্রশ্নের সংযোগস্থলে খুঁজে পাওয়া যায়। এই চারটি বৃত্ত যখন একে অপরকে ছেদ করে, তখনই জন্ম নেয় সত্যিকারের ইকিগাই।

১. আপনি যা ভালোবাসেন (What you LOVE):

- কোন কাজটি করতে আপনি সময় ভুলে যান? যা আপনার প্যাশন?

২. আপনি যা ভালো পারেন (What you are GOOD AT):

- আপনার দক্ষতা বা প্রতিভা কী? কোন কাজটি আপনি অন্যদের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারেন?

৩. পৃথিবীর যা প্রয়োজন (What the WORLD NEEDS):

- আপনার কোন কাজটি সমাজের বা অন্যদের উপকারে আসতে পারে? কোন সমস্যার সমাধান আপনি করতে পারেন?

৪. যার জন্য আপনি অর্থ পেতে পারেন (What you can be PAID FOR):

- কোন দক্ষতার জন্য মানুষ বা সমাজ আপনাকে টাকা দিতে প্রস্তুত?

এই চারটি বৃত্তের সংযোগস্থলেই লুকিয়ে থাকে আপনার ইকিগাই।

যখন এই চারটি–ভালোবাসা, দক্ষতা, পৃথিবীর প্রয়োজন এবং অর্থ–একসাথে মিলিত হয়, তখনই আপনি আপনার ইকিগাই খুঁজে পান। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে আপনি পরিপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সন্তুষ্ট জীবনযাপন করতে পারেন।

ইকিগাই কোনো গন্তব্য নয়, একটি যাত্রা

ওকিনাওয়ার সেই জেলে হিরোশির মতো, ইকিগাই কোনো বড় পুরস্কার বা জীবনের শেষে খুঁজে পাওয়া কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এটি প্রতিদিনের ছোট ছোট আনন্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এটি সেই প্রক্রিয়া, যা আপনার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

ইকিগাই খুঁজে পাওয়া মানে perfect চাকরি খুঁজে পাওয়া নয়; এর অর্থ হলো নিজের জীবনের প্রতিটি অংশকে–কাজ, পরিবার, সমাজ ও আত্মা একই সুতোয় গাঁথা, যাতে প্রতিটি দিন উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে হয়।

ইকিগাই

প্রশান্ত জীবনের জাপানি ধারণা

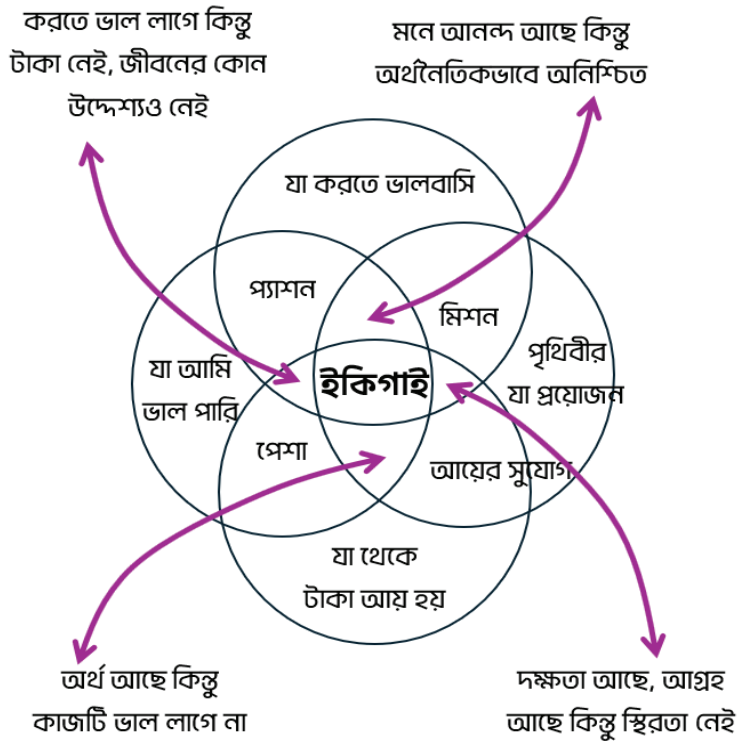

নোট –

অর্থ ব্যবস্থাপনা

এটা কোন ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার না যে, কত টাকা আপনি ইনকাম করেন বা কত টাকা আপনার কাছে আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, কত কম বা কত বেশি টাকা হলেও আপনি সেটাকে ম্যানেজ করতে পারেন, সেটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারেন। অনেক কম আয় করেও অনেক মানুষ ভালো থাকতে পারে। আবার অনেক বেশি টাকা আয় করেও মানুষ স্ট্রেসে বা অভাবে থাকতে পারে।



অর্থ' সম্পর্কে ধারণা

আমার একজন বন্ধু - ডাক্তার সাহেব, অনেক বিখ্যাত একজন কার্ডিওলজিস্ট, ইন্ডিয়ায় চেম্বার করেন। তিনি বলছিলেন আমাকে এই গল্পটা। তাঁর একজন রোগী চেম্বারে আসেন। সে খুব স্ট্রেসড। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে একটা এবং আরেকটা হবে হবে করছে। তিনি ডাক্তার সাহেবকে বললেন যে, *'ডাক্তার সাহেব, স্ট্রেসের চোটে, টেনশনে, ঘুম-টুম কিছু হয় না। খুবই স্ট্রেসে আছি, খুবই টেনশনে আছি।'* ডাক্তার সাহেব আমাদেরকে বলছেন যে, এই লোকটার এত পরিমাণ সম্পদ, টাকা-পয়সা যে উনার নিজেরই কোন হিসাব নাই। এই মানুষটা কেন এত স্ট্রেসে পড়ে আছেন!

'কী নিয়ে এত চিন্তা আপনার' এটা যখন ডাক্তার সাহেব ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, *'আমার দুই কোটি রুপি লস হয়ে গেছে হঠাৎ করে বিজনেসে।'* ডাক্তার সাহেব বললেন - *'তো এটা তো ঠিকই আছে, বিজনেসে এ রকম লস হতেই পারে, তাই না?'*

একটা শিপমেন্ট ছিল। শিপমেন্টের টাইম মতো উনি দিতে পারেন নাই। পুরো জিনিসটা ক্যানসেল হয়ে গেছে এবং জাহাজ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ী চিন্তা করলেন কোন অসুবিধা নাই। চলে আসলে এটাকে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে দেবেন। সমস্যা নাই। কিন্তু বিধি বাম - আসার সময় জাহাজে পানি ঢুকে ওই জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, জাহাজও ডুবে গেছে।

জাহাজ ডোবার পরও আশা ছিল। ওটা ইন্স্যুরেন্স করা ছিল, তিনি ভাবলেন যে, ইন্স্যুরেন্স থেকে নিয়ে নেবেন। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কথা বলে জানা গেল, এটা শুধু যাওয়ার সময়ের জন্য ইন্স্যুরেন্স করা ছিল। ফেরত আসার সময় যদি নষ্ট হয়, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কাভার করবে না। তো পুরো টাকাটাই এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। উনি তখনই হার্ট অ্যাটাক করে ফেলেছেন। তো এই যে ঘটনা, এত বিশাল বিজনেসম্যান, এত বেশি পয়সা নিয়ে ডিলিংস এবং এই যে তিনি হার্ট অ্যাটাক করলেন। স্ট্রেসের চূড়ান্ত একটা লেভেলে গেলেই পরে মানুষ হার্ট অ্যাটাক করে।

ডাক্তার সাহেব আমাকে আরেকজন মানুষের গল্প বললেন, *'আমার অফিসের বাইরে একজন লোক, ড্রাইভার। সে গাড়ি চালায় এবং সে খুব হাসিখুশি। আমি তাকে দেখি, খেয়াল করি, সে খুব আনন্দে থাকে, খুব উৎফুল্ল থাকে। তো আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'তুমি এত মজায় কীভাবে থাকো? তোমার কোন প্রবলেম নাই?' তো সে বলছে, 'না, ডাক্তার সাহেব, আমার কোন সমস্যা নাই। আমি এই যে ট্যাক্সি চালাই, দিনে পাঁচ-ছয়শ টাকা কামাই। তো অর্ধেক আমি খরচ করি, মওজ করি, মাস্তি করি। বাকি অর্ধেক আমি জমাই।' তারপরে ধরেন মাসে একবার আমি বাড়িতে যাই। বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই আমার পুরো মাসে খাবার টাবার যা লাগে সেগুলো কিনে দিই। তারপরে আস্তে আস্তে কয়েক বছর টাকা জমিয়ে, আমি এক টুকরা জমি কিনি। তারপর আমি আবার চলে আসি, আমি আবার আগের মতো চলতে থাকি। তো আমার কোন সমস্যা নাই। আমার ব্যাংকেও অনেক টাকা জমা আছে।'*

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন যে, *'কত টাকা তোমার জমা আছে?' 'পাঁচ হাজার টাকা জমা আছে আমার।'* ডাক্তার সাহেব বললেন যে, *'পাঁচ হাজার টাকা!'* মানে, ডাক্তার সাহেবের চেহারা দেখে ওই লোকটা বুঝতে পারল যে এই টাকার অংকে ডাক্তার সাহেব সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বললেন যে, *'আমি এমনকি লোন পর্যন্ত দিই মানুষকে। আপনার ড্রাইভারও আমার থেকে লোন নিয়েছে। আমি সবাইকে লোন দিয়ে বেড়াই। এই দুই, চার, পাঁচ শ টাকা, হাজার টাকা। সবার থেকে টাকা পাই।'*

এই যে দুইজন মানুষ। একজনের অনেক অনেক টাকা আছে, কিন্তু তিনি টাকার স্ট্রেসে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত করে ফেললেন। আরেকজনের মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা আছে, কিন্তু সে খুবই হ্যাপি। এই দুইজন মানুষের মধ্যে বেসিক তফাত টা কী হলো? তফাতটা হলো যে, একজন টাকাটাকে ম্যানেজ করতে পারছেন ঠিকমতো, আরেকজন পারছেন না।



এটা কোন ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার না যে, কত টাকা আপনি ইনকাম করেন বা কত টাকা আপনার কাছে আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, কত কম বা বেশি টাকা হলেও আপনি সেটাকে ম্যানেজ করতে পারেন, সেটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারেন। অনেক কম আয় করেও অনেক মানুষ ভালো থাকতে পারে। আবার অনেক বেশি টাকা আয় করেও মানুষ টাকার স্ট্রেসে বা অভাবে থাকতে পারে। 'কৌন বনেগা কড়োড়পতি' অনুষ্ঠানের বেশীরভাগ কোটিপতিদের টাকা দু'বছরেরও কম সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

এটাই হচ্ছে মানি ম্যানেজমেন্টের সাবজেক্ট। এই পর্বের সবচেয়ে মজাদার ঘটনা হচ্ছে যে, যেই ট্রেইনার আপনাদেরকে এই মানি ম্যানেজমেন্ট আজকে শেখাচ্ছি, তার মানি ম্যানেজমেন্ট খুব খারাপ ছিল। আমার নিজের এই মানি ম্যানেজমেন্ট অংশটা সাংঘাতিক রকমের খারাপ এবং আমি যখন করোনা মহামারীর মধ্যে পড়লাম, তখন আমার এই টাকা-পয়সার কনসেপ্টে বড় পরিবর্তন এসেছে।

আমি খুব বাজে মানি ম্যানেজার ছিলাম। আমি একটা খুব ভালো জব করতাম। খুব ভালো মানে, খুব ভালো জব করতাম এবং অনেক বছর ধরে আমি জব করছিলাম। আমি ২০০১ সাল থেকে আইটি ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে শুরু করেছি। এটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ট্রেনিং সিস্টেম ছিল, স্যালারি খুব ভালো ছিল। আমি মনের আনন্দে টাকা-পয়সা খরচ করছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে, এ রকম করে চলতেই থাকবে।

২০১৪ সালের দিকে আমি একটা জব শিফট করে একটা নতুন জবে আসি। সেখানে স্যালারি আগের চেয়ে প্রায় তিন গুণ হয়ে গেল। ছয় বছর কাজ করার পর প্যান্ডেমিক চলে আসলো। হঠাৎ করে এবং সবকিছুই বদলে গেল। পুরা কাহিনি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি মোটামুটি একটা অর্থকষ্টে পড়ে গেলাম। ক্লাসগুলো বন্ধ হয়ে গেল, আমার জবটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়ার মতোই অবস্থা হলো এবং আমাকে জব ছেড়ে দিতেই হলো।

ইনকাম নেই, একদিন মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য অফিসে গেলাম। আমার ম্যনেজার জিজ্ঞেস করলেন, *'আপনার টাকা-পয়সা জমা নাই?'* আমি বললাম যে, 'না স্যার।' তিনি খুব অবাক হলেন। আমাকে বললেন *'হাউ কাম'? এটা কীভাবে সম্ভব যে, আপনার টাকা-পয়সা জমা নাই?'* আমি বললাম যে, *'স্যার, আমি জানি না কেন জমে নাই। আমি তো আমার জানামতে, কোন অপচয় করি নাই। আমি কোন বেজায়গায় টাকা খরচ করি নাই, খুব বেশি এক্সট্রাভ্যাগেন্ট আমি না।'কখনো আমি আমার টুকটাক শখের জিনিস কিনেছি, কিন্তু আমি বলতে পারি না আসলে টাকাগুলো কীভাবে চলে গেছে।'* তিনি আমাকে একটা হিসাব করে দেখালেন। *'দেখেন স্যার, গত ছয় বছরে আপনি যা আয় করেছেন, তার থেকে যদি আপনি একটু হিসাব করে খরচ করতেন। হিসাব করে বলতে আপনার যা হবি টবি আছে সবকিছুর জন্য আপনি খরচ করার পরেও আপনি কত টাকা জমাতে পারতেন, আপনি জানেন?'*

সমস্ত হিসাব তিনি আমাকে করে দেখালেন। হিসাব শেষে তিনি আমাকে একটা এমন এক ফিগার বললেন - আমি হতবাক হয়ে গেলাম। *'আপনি যদি এভাবে করে জমাতেন, প্রতি মাসে এত টাকা করে (যা আমি খুব সহজেই জমাতে পারতাম) তাহলে আপনার এখন ২১ লক্ষ টাকা জমা থাকার কথা।'* আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। *'২১ লক্ষ টাকা! নট এ জোক!!'*

তার মানে এই টাকাটা আমি রোজগার করেছি। এই টাকাটা আমার হাতে এসেছে। কিন্তু এখন কোন টাকাই নাই। ২১ লক্ষ দূরের কথা, ২১ হাজার টাকাও নাই! এটা একটা লার্নিং। আপনি বুঝতে পারছেন যে, কীরকম একজন থেকে আপনি মানি ম্যানেজমেন্ট শিখতে যাচ্ছেন, যার নিজের মানি ম্যানেজমেন্টের অবস্থা খুবই করুণ।

সে যা-ই হোক, এখান থেকে আমি শিক্ষাটা নিয়েছি। লার্নিং টা নিয়েছি এবং আমি আজকে এই চ্যাপটার-টা লিখছি আপনাদের জন্য।

আসুন দেখি টাকা-পয়সা বিষয়ক যে ভুলগুলো আমরা সাধারণত করে থাকি, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করি। এই ভুলগুলো আপনি নিজের জীবনের সাথে মেলাতে পারেন এবং দেখতে পারেন কতটা মিলে।

এক : আমাদের ব্যয়ের কোন প্ল্যানিং থাকে না। আমরা কোথায় খরচ করি বা না করি, এগুলো আমরা ট্র্যাক করি না বা হিসাব রাখি না।

দুই : আমরা যা ইনকাম করি, তার থেকে বেশি খরচ করি।

তিন : আমরা ইমোশনালি কেনাকাটা করি। আমরা যখন কেনাকাটায় লেগে যাই, তখন কত টাকা চলে যাচ্ছে, সেটি আমরা হিসাব রাখি না। বরং মনে করি, 'ইট্স ওকে।' আবেগ দিয়ে আমরা কেনাকাটা করি।

চার : আমাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা থাকে না। আমরা ভাবি না যে আমাদের জমাতে হবে বা কালকে একটি রেইনি ডে হতে পারে।

আগামী দিনে আমার ইনকাম বন্ধ হতে পারে, এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করি না বা পাত্তা দিই না।

পাঁচ : আমরা কোথাও ইনভেস্ট করি না। বিনিয়োগ করি না।

ছয় : কারণে-অকারণে ঋণ নিই।

এই কয়টা কারণ আমার চোখে পড়েছে। আপনাদের চোখে যদি আরও কিছু পড়ে, তাহলে আপনারা সেটাও নোট নিতে পারেন।

আমরা আমাদের টাকা-পয়সা সম্পর্কিত ভুলগুলো জানলাম। এখন, কেন আমরা এই ভুলগুলো করি, কারণগুলো জেনে নেব।

যেকোনো প্রবলেমের সলিউশনে যাওয়ার জন্য আগে আমাদেরকে সেই কারণগুলো জানতে হয়, কেন আমরা এই ভুলগুলো করি।

ব্যয়ের প্ল্যানিং না থাকা - প্রথম কারণ হচ্ছে অবহেলা। আমরা ভাবি, *'কালকে থেকে করব প্ল্যানিং।'* এটি অন্যান্য প্ল্যানিংয়ের মতোই – যেমন আমরা এক্সারসাইজ শুরু করি না, যেমন আমরা নামাজ শুরু করি না। এই 'কালকে থেকে শুরু করব' মনে করে আসলে কিছুই করি না। তাই ব্যয়ের প্ল্যানিংটা কালকের জন্য রেখে দিই এবং অবহেলা করি।

আয় থেকে ব্যয় বেশি করা। এটি মূলত লোকদেখানো মানসিকতা (ফুটানি) থেকে আসে। আমরা মানুষকে দেখাতে চাই যে আমরা কত 'প-শ।' আমাদের মধ্যে একটি লোকদেখানোর মানসিকতা কাজ করে। এটি করতে গিয়ে আমরা দামি গাড়ি কিনি, দামি শাড়ি কিনি, বা দামি অনেক জিনিস কিনি, শুধুমাত্র 'চোখের শখ বা মনের হাউশ' মেটানোর জন্য বিয়েতে অসম্ভব অবিশ্বাস্য ধরনের খরচ করে ফেলি, যেগুলো আসলে আমাদের কেনার বা করার দরকার নেই। একজনের কথা জানি যিনি তার বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে 'রাজকীয়' দেখানোর জন্য নিজের বাড়ি (যেটিতে তিনি থাকতেন) বন্ধক দিয়েছিলেন, এবং টাকা ফেরত দিতে না পেরে সেটি হারিয়েছেন!

আবেগতাড়িত হয়ে কেনাকাটা করা - আমরা কিনি কারণ ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই কিনি। আর এখন ইমোশনাল কেনাকাটার জন্য অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। আমরা এগুলো নিয়ে সামনে কথা বলব, তাই এখন বিস্তারিত বলছি না।

সঞ্চয়ের মানসিকতা না থাকা - আমার নিজের মধ্যে এই সমস্যা ছিল। আমি ভাবতাম, 'কী হবে সঞ্চয় করে? কাল তো থাকবই না, মরেই তো যাব। চলছে তো ভালোই। তাই না? চলুক ভালো।' এ রকম চিন্তা থেকে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হয় না। এটি একটি বড় কারণ যে আমরা এই ভুলটি করি।

কোথাও বিনিয়োগ না করা - প্রথমত, আমরা ভাবি, *'কোথায় বিনিয়োগ করব? যদি টাকা হারিয়ে ফেলি তাহলে কী হবে?'* এর থেকে মনে হয় জমা থাকুক, তাই না? সেফ মানি। কিন্তু মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, সেফ মানি হচ্ছে সবচেয়ে আনসেফ মানি। ব্যাংকে যদি আপনি টাকা রেখে দেন, তাহলে সেটি আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এ টাকা অবধারিতভাবে কমতে থাকে।

কারণে-অকারণে ঋণ নেওয়া - এটি একটি বদভ্যাস। পিওর বদভ্যাস। এর পেছনে অনেক সময় ফুটানি দেখানোর কারণ কাজ করে। এই ফুটানি দেখানোর মানসিকতার কারণে আমরা এটি করি।

তাহলে আমরা এই কারণগুলো বের করলাম। এবার আমরা সমাধানের দিকে যাচ্ছি। আমরা প্রবলেম কী, তা জানলাম। সেই প্রবলেম আমরা এনালাইজ করলাম। এবার আমরা সলিউশনের দিকে যাচ্ছি।

তিনটা সেকশনে আমরা এই পুরো চ্যাপটারটি ভাগ করেছি।

বাজেটিং

বাজেটিং মানে হচ্ছে কী পরিমাণ আমরা খরচ করব। বাজেট করা মানে ভাগ করে ফেলা। নাম্বার টু হচ্ছে ব্যয়। কীভাবে ব্যয় করব? বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা ব্যয় করব।

কীভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যয় করব, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেকশন। থার্ড সেকশন যেটা নিয়ে কথা বলব সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ। এটা কীভাবে করতে হবে? তাহলে শুরু করি।

মানি ম্যানেজমেন্ট এ আপনার সমস্যা চিহ্নিত করুন।
ক্রমানুসারে সাজান

মানি ম্যানেজমেন্ট সেক্টর	আপনার সমস্যা (ক্রমানুসারে)
ব্যয়ের প্ল্যানিং নেই	১.
আয় থেকে ব্যয় বেশি	২.
ইমোশনালি কেনাকাটা করা হয়	৩.
সঞ্চয়ের মানসিকতা নেই	৪.
কোথাও বিনিয়োগ করা হয় না	৫.
কারণে-অকারণে ঋণ নেওয়া হয়	৬.

প্রথম পদক্ষেপ - সবার আগে আপনার যে নিশ্চিত আয় গুলি আছে, যেখান থেকে আপনার ইনকাম আসছে সেগুলোকে আপনি লিখে ফেলবেন। নিশ্চিত আয় মানে এক্সাক্টলি যে টাকাটা আপনি নিশ্চিতভাবে পাচ্ছেন। বিজনেস থেকে হোক, জব থেকে হোক, যেখান থেকেই হোক না কেন। নিশ্চিত কিছু আয় আপনার আছে। তো সে আয় গুলি আমরা লিখে ফেলবো। নিশ্চিত মাসিক আয় লিখে ফেলব, কত টাকা আপনি পাচ্ছেন। এর মধ্যে আপনি অনিশ্চিত আয় আনবেন না। বোনাস লিখবেন না, ওভারটাইম লিখবেন না, বকশিশ লিখবেন না। এই জিনিসগুলো বাদ দিয়ে নিশ্চিত মাসিক আয় গুলি সবার আগে লিখে ফেলবো। বাজেটিং এর এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ - প্রতি মাসের যে খরচগুলো আমরা করি, সেই খরচগুলোর রেকর্ড রাখবো। কীভাবে রেকর্ড রাখব? নিশ্চিত মাসিক খরচগুলোর একটা লিস্ট করব। নিশ্চিত মাসিক খরচের মধ্যে আছে খাবার-দাবার, মুদি বাজার, কাঁচাবাজার। সমস্ত বিল, ঘর ভাড়া, কর্মচারী-দের বেতন। এগুলো যদি আমরা ক্যাশ খরচ করি, তাহলে সেটার রিসিট রাখব অথবা লিখে রাখবো। এই লেখার কাজটা আপনাকে সারা বছর করতে হবে না। কয়েক মাস করলে আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। পাঁচ-ছয় মাস যদি করতে পারেন, তাহলে আপনার এই জিনিসটা সিস্টে-মের মধ্যে চলে আসবে। রিসিট অথবা লিখে রাখতে পারেন। অনেকে রিসিট রেখে দেন, অনেকে লিখে রাখেন।

এখন সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে আপনি অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। এ রকম প্রচুর অ্যাপ আছে। ইংরেজিতে তো আছেই বাংলায়ও আছে। প্লে স্টোরে Money Manager দিয়ে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। আপনি আপনার পছন্দমতো একটা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। আমি 'মানি ম্যানেজার' নামে একটা অ্যাপ ব্যবহার করেছিলাম কিছুদিন। খুব ভালো কাজ করে। মানি ম্যানেজার অনেকগুলো আছে। কোন কোনটা একদম বেসিক, কোন কোনটা ডিটেইল। আপনি আপনার পছন্দমতো একটা ব্যবহার করতে পারবেন। একটু রিসার্চ করলেই আপনি পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের একটা অ্যাপ।

তৃতীয় পদক্ষেপ - ব্যয়গুলোকে আমরা ভাগ করে ফেলবো। কী কী আমরা খরচ করব, সেই ব্যয়গুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলবো।

প্রথম ভাগ হচ্ছে নিশ্চিত অপরিবর্তনযোগ্য ব্যয়। নিশ্চিত এবং অপরিবর্তনযোগ্য, যেমন ঘর ভাড়া। আপনাকে একটা নির্দিষ্ট ঘর ভাড়া

দিতেই হচ্ছে। এটা আপনাকে আলাদা করে রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে লোন। লোন পরিশোধ করা। যেমন আপনি যদি ই.এম.আই দিয়ে গাড়ি কেনেন বা বড় কিছু কেনেন, সেটার লোন আপনাকে দিতে হচ্ছে প্রতি মাসে। এটা অবশ্যই দিতে হবে এবং একটা Fixed amount আপনাকে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ প্রয়োজনীয় ব্যয়, যেগুলো বাড়াতে বা কমাতে পারেন। যেমন বাজার, গাড়ি ভাড়া এই জিনিসগুলো। যেমন আপনি যদি ট্যাক্সিতে করে সবসময় যাতায়াত করেন, আপনার আয় যখন কমে যাবে, তখন আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করবেন। তাহলে এটা কমে গেল। আবার যখন আপনার অনেক বেশি টাকা থাকবে, তখন আপনি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন, উবার ব্যবহার করতে পারেন।

তৃতীয় ভাগ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়। আমরা কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করি, যেমন প্রায়ই রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাই। তাই না? এটা আমরা টের পাই না যে খরচটা কীভাবে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে হয়ে যাচ্ছে। অনেক খরচ কিন্তু হয়ে যায়। ফ্রিকোয়েন্টলি বেড়াতে যাওয়া। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। এই জিনিসগুলো আরেকটা অংশে লিখবেন। তাহলে ব্যয়গুলোকে আপনি ভাগ করে ফেলেন।

আমার কাজ হচ্ছে থিওরি দেওয়া। আপনাদের কাজ হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা। বারে বারে বলছি - তথ্য জেনে নেওয়া মানে সমস্যা সমাধান নয়, কাজে লাগানো হচ্ছে আসল কথা। আমরা প্রথম সেকশনটা শেষ করলাম।

খরচ

খরচ - এক্সপেন্সেস। যেটা করতে আমরা খুবই সিদ্ধহস্ত। আমরা খরচ করব ব্রেইন ব্যবহার করে, হার্ট ব্যবহার করে না। আমরা ব্যয় করব

বিবেক দিয়ে, আবেগ দিয়ে না। এই যে ইমোশনাল মার্কেটিং, আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই। ইমোশনাল মার্কেটিং-টা করা হয়, যাতে মানুষ আবেগ দিয়ে কিনে ফেলে। আমরা আবেগ দিয়ে না কিনে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিনব, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খরচ করে কিনব।

ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে বাজেটের মধ্যে আমরা থাকব। ওই যে আমরা ভাগ করেছিলাম, কোন টাকাটা কোথায় খরচ করব। লাইফস্টাইল, এটা ভাগ ছিল। লাইফস্টাইল ভাগে যে টাকাটা আছে, ওইটাই আপনি আপনার নিজের জন্য, মানে নিজের আনন্দের জন্য খরচ করবেন। নিজের সাথে নিজের একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে যে, আমি এই টাকার বেশি কিছুতেই খরচ করব না। আমরা খরচ করার সময় চিন্তা করব যে, আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কোনটা, কোনটার জন্য আমাকে আসলেই খরচ করতে হবে।

যেমন, আমি পার্সোনালি, আমার বেশি খরচ হয় লার্নিং এ। লার্নিং এ কোন জিনিস শিখতে, আমি কোন কোর্স কিনলাম বা কোথাও ট্রাভেল করলাম শিখার জন্য। এই জায়গাটাতে আমি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিই। কখনো কখনো দেখা যায় যে, আমার ফ্যামিলিতে যে টাকাটা খরচ করতে হবে, তার থেকেও অনেক সময় বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে ফেলি, যদিও সব সময়ের জন্য এটা ভালো প্র্যাকটিস নয়, কিন্তু তারপরও আমি করে ফেলি। যার যার একেকটা প্রায়োরিটি আছে, একেকজন একেক জিনিসে গুরুত্ব বেশি দেবে। এটা আপনাকে বের করতে হবে। এটা বের করে, তারপর আপনি সেই হিসাবে বাজেটটি করবেন।

সবচেয়ে দামি যে এডভাইসটা এখন আপনাদেরকে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে - Need to have or Nice to have - এটা একটা মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, আমরা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলি।

'Do I really need to have this or it's nice to have' এই জিনিসটা আমার জন্য আসলেই দরকার, নাকি এই জিনিসটা কিনলে ভালো হতো?

এই প্রশ্নটা আপনি যদি করেন, যেকোনো জিনিস কেনার ক্ষেত্রে, তাহলে আপনি আর ইমোশনালি কিনতে করতে পারবেন না। *'এটা কি আসলেই আমার লাগবে নাকি এটা পেলে ভালো হতো।'* এটা মনে রাখলেই হবে।

ক্রেডিট কার্ড - ক্রেডিট কার্ড এমন একটা জিনিস যেটা আপনি খরচ করার সময় মনে হয় না যে, আপনি খরচ করছেন। কারণ, ক্রেডিট কার্ডটা ক্ষয় হয় না। আপনি পকেট থেকে যখন টাকা বের করে গুনে গুনে দেন, তখন কিন্তু আপনার মাথায় থাকে যে, আমার কাছে দশটা নোট ছিল, এখান থেকে তিনটা নোট খরচ হয়ে গেছে। আর সাতটা নোট আমার কাছে আছে। এ রকম একটা ফিলিং হয়, শেষ হয়ে যাওয়ার একটা ফিলিং হয়। ক্রেডিট কার্ডের বেলায় এই ব্যাপারটা হয় না। ক্রেডিট কার্ড আপনি যখন মেশিনে দেন, ক্রেডিট কার্ডটার সাইজ যে রকম থাকে, মেশিন থেকে বের হওয়ার পরও সাইজ ওই রকম থাকে। খরচ হয়ে যায় ব্যাংকের ভেতর থেকে, যেটা দৃষ্টিসীমার বাইরে। মানুষের ব্রেইন এই জিনিসটা দেখতে পারে না। সেজন্য প্রায়ই অনেক বেশি খরচ করে ফেলে।

এটা হচ্ছে এমন টাকা, যেই টাকাটা আসলে আপনার না। ব্যাংক আপনাকে লোন দিচ্ছে, চড়া সূদে। কিন্তু লোন দিচ্ছে এবং সে কিন্তু সেটা আপনার থেকে ঠিক ঠিক আদায় করবে। এই ব্যাপারটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। ক্রেডিট কার্ড 'নট রেকমেন্ডেড।' কিন্তু যদি আমরা ব্যবহার করি, তাহলে এটার কিছু রুল্‌স আছে। এটা আমরা কীভাবে ব্যবহার করব, সেই ব্যাপারটা আমরা আপনাদেরকে এখানে বলছি। ক্রেডিট কার্ড সবার জন্য না। ইমোশনাল ক্রেতাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড না। খুব হিসাবি ক্রেতা যারা, তাদের জন্য এ কার্ড।

এটা একটি ফাঁদও হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এটা ফাঁদ হয়। অবধারিতভাবে মানুষ এই ফাঁদে পড়ে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, এই মাসে আপনি যা পরিশোধ করতে পারবেন, শুধু সেইটুকুই ব্যবহার করবেন। মানে, আপনার এই কাজে খরচ করার জন্য যে বাজেটটি আছে, সেই পরিমাণেই আপনি খরচ করবেন। এর বেশি না। ক্রেডিট কার্ডের যে শর্তগুলো আছে, এগুলো খুব ভালো করে পড়বেন এবং ভালো করে বুঝে নেবেন। জিজ্ঞেস করে করে বুঝে নেবেন। যদি আপনি আসলেই ক্রেডিট কার্ড নিতে চান।

এই জিনিসগুলো আমরা করি না। অনেকের একাধিক ক্রেডিট কার্ড থাকে। একাধিক ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে মরণফাঁদ। একটা ক্রেডিট কার্ড থেকে নিয়ে, আরেকটা ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট দেওয়া হয়। এভাবে আপনি অবধারিত সূদের চক্করে পড়ে যাবেন। আমি এ রকম দেখেছি, একজনের কাছে আটটা, দশটা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড। খুবই বাজে প্র্যাকটিস।

মিনিমাম পেমেন্ট করতে হয় বলে ক্রেডিট কার্ডের সব লোন একসাথে চুকিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করি না। এই মিনিমাম পেমেন্ট অনন্তকাল ধরে চলতে পারে। আমি একজনের কথা শুনেছি - যিনি সাত লক্ষ ডলার ক্রেডিট কার্ডে খরচ করে বাইশ লক্ষ ডলার পেমেন্ট করেছেন!

এটা খুব সাবধানতার সাথে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। কেন আমরা কিনি? ক্রেতার সাইকোলজির উপর লেখাপড়া আছে, আমরা সবাই জানি। বিজনেসম্যানরা, যারা লেখাপড়া করে বিজনেসম্যান হচ্ছি, তারা জানি যে, ক্রেতার সাইকোলজির উপর সেলাররা শুধু মাস্টার্স না, পিএইচডি পর্যন্ত করে। কী করলে মানুষ কিনবে? অপ্রয়োজনীয় কিনবে। একটা জিনিসের সাথে আরও দশটা জিনিস কিনে নিয়ে আসবে। এই সাইকোলজি তারা খুব ভালো করে জানে এবং সেভাবেই তাদের অ্যাড এবং অফারগুলো প্রস্তুত করে আমাদের জন্য।

লিস্ট করে বাজার করা - আমরা একটা লিস্ট করব, বিশেষ করে সুপারশপ বা শপিং মলগুলোতে আমরা যখন যাব, তখন। আপনি জানেন - শপিং মলগুলোতে যেই জিনিস সাজানো থাকে, সেটা মানুষের ক্রয়ের সাইকোলজি ব্যবহার করে করা হয়। মানুষ কোন দিকে তাকাবে, এরপর কোথায় যাবে, তারপর কোথায় যাবে। লাস্টে দেখবেন চকলেট সাজানো থাকে, এবং সেটা বাচ্চার eye level এ, তাই না? বাচ্চারা সাথে থাকলে তো কোন কথাই নাই। এক গাদা চকলেট আপনাকে কিনিয়ে ছাড়বে।

আপনি একটা লিস্ট নিয়ে বাজারে যান। কিন্তু কিনে নিয়ে আসেন লিস্টের বাইরে আরও প্রচুর, প্রচুর জিনিস। অনেকগুলো জিনিস কিনে নিয়ে আসেন। এগুলো কিন্তু আসলে আপনার দরকার ছিল না। আপনার কাছে সুন্দর লাগে বা কম দামে বা বিভিন্ন অফারে আপনি পান বলে কেনেন, ইমোশনালি কিনে নিয়ে আসেন। তাহলে আমরা যখন মলগুলোতে যাব, বিশেষ করে আমরা একটা লিস্ট করব এবং লিস্টের বাইরে আমরা জিনিস কিনব না। এক গাদা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের কোন কাজে লাগবে না। শেষ পর্যন্ত বাসায় আনার পর দেখা যায়, সেগুলো পড়েই আছে এবং একটা সময় ফেলে দিতে হয়েছে। এখানে বড় একটা অংশ আমরা অপচয় করে ফেলি।

বড় কোন খরচ যখন আমরা করব, গাড়ি কিনতে চাই বা বাড়ি কিনতে চাই, এ রকম বড় কোন খরচ, তার আগে আমরা রিসার্চ করব। গাড়ি, জমি, ফ্ল্যাট। এই জিনিসগুলোর আগে সময় নিয়ে আমরা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করব। চটকদার কথা শুনে বা বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে অনেক সময় ফ্রড কেসে পড়ে যাই বা অনেক ইমোশনালি কিনে ফেলি। কেনার পরে দেখা যায় যে, আমরা ঠকে গেছি। কেনার সময় ইমোশনাল হলে ঠকে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।



বাল্ক বাই - মানে হচ্ছে বড় জিনিস একসাথে কেনা - যেমন, টুথপেস্টের সবচেয়ে বড় যে টিউবটা আছে, সেটা কেনা, কর্নফ্লেক্স কিনলে বড় প্যাকেট বা ডায়াপার কিনলে অনেকগুলো ডায়াপার একসাথে কেনা। যেটা আসলেই কাজে লাগবে। এটা কিন্তু ভালো। প্রথম বেশি খরচ হলেও, আসলে টাকা সাশ্রয় হয় এটাতে। যখনই সম্ভব হবে, এভাবে কিনতে পারেন তবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জিনিস। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনবেন না।

অনলাইন থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেশি কেনা হয়। এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এমনভাবে তারা অ্যাডগুলো বানায় যে দেখলেই কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে। এভাবে আমরা অনেক টাকা অপচয় করে ফেলি। বেশীরভাগ জিনিসই অত্যন্ত নিম্নমানের হয় সেটা আরেকটা আলাদা পেইন।

সেভিং এ যদি সমস্যা হয় - এই সমস্যাটি আমার হতো। এই প্র্যাকটিসটা আমি একসময় করতাম। আগেই টাকাগুলোকে আলাদা আলাদা এনভেলপে রেখে দিতাম। কয়েকটি এনভেলপ নিতাম। এই এনভেলপটা বাচ্চাদের স্কুলের জন্য। এইটা হচ্ছে ঘরের খরচের জন্য। এটা হচ্ছে আমার হবির জিনিস কেনার জন্য। এ রকম করে আট-দশটা এনভেলপে আমি টাকাগুলোকে, নোটগুলোকে ভাগ করে করে রেখে দিতাম। এটাও কিন্তু কাজ করে। বেশ ভালো কাজ করে। সেভিং এর সমস্যা হলে আগে থেকে টাকা আলাদা করে ফেলবেন।

টাকাটা পাওয়ার পরেই প্রথমে ফিক্সড করে ফেলবেন। মানে ব্যাংকে রেখে দেবেন। তারপর বাকি টাকা খরচ করবেন। ব্যাংকেরটা মনে করবেন এটা নাই। দরকার হলে আলাদা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে রাখবেন। সেটার কার্ড বা চেক বই কিছুই তুলবেন না। মনে করবেন যে, ওই ব্যাংক একাউন্টটাই নাই। আসলে সবই মাইন্ড গেম। আপনি মাইন্ডকে চেঞ্জ করে সবকিছুই পারেন। আগে সঞ্চয় করবেন, তারপর খরচ করবেন। এটা একটা ভালো বুদ্ধি। আলাদা আলাদা খামে টাকা ভাগ করে রাখেন।

সঞ্চয়

আগামী তিন থেকে ছয় মাসের খরচ আমরা সঞ্চয় করব, জমা করে রাখবো। এটা হলো আমাদের প্রাথমিক গোল। তার মানে হচ্ছে - এই যে আমি প্রসেসটা বললাম এই প্রসেসে জমা করতে করতে একটা টাইম আসবে যখন আপনার তিন মাস ইনকাম বন্ধ থাকলেও আপনি চলতে পারবেন। তিন, চার, পাঁচ বা ছয় মাস এ রকম একটা আমরা গোল সেট করব কত টাকা আমি জমাতে পারি। আমার গোল হচ্ছে তিন মাসের খরচ আমি জমিয়ে ফেলব যেভাবে হোক। ওকে? একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করলে কাজটা কিন্তু হয়ে যায়। অর্থনীতির যে পরামর্শকরা আছেন, তারা ৯ থেকে ১২ মাসের পরামর্শ দেন। ভালোই পরামর্শ দেন কারণ আমরা এখন বুঝতে পারলাম - যে এই যে প্যান্ডেমিকে আমরা এসে পড়লাম। কতদিন পর্যন্ত আমাদের ইনকাম ব্যহত হয়েছে। আমাদের ইনকামের পুরা কাহিনি আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? এবং অনেকের ইনকাম বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছে, তাদের মধ্যে আমি একজন।

আগামী তিন মাসের জন্য তো আপনাকে জমা করতেই হবে। ইমারজেন্সি খরচ, যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, মেডিকেল ইমারজেন্সি হতে পারে, লকডাউন – এই জিনিসগুলোতে খুব কাজে আসে। এটা আপনি কখনো বলতে পারবেন না যে আমি কত টাকা জমাতে পারব বা কত টাকা জমালে আমি একদম সেফ।

এ রকম কোন রুল নাই। ধরেন, আপনি সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য জমালেন। কিন্তু লকডাউন তো দুই বছর হয়ে গেল। তাই না? সেটা ব্যাপার না। কথা হচ্ছে যে আপনার একটা গোল থাকবে যে কতদিনের ক্রাইসিস পিরিয়ডের জন্য আপনি টাকা জমা করবেন এবং সেটা কত টাকা।

সঞ্চয়ের যে পরিকল্পনা, সেটা আমরা লিখে রাখবো। সঞ্চয়ের পরিকল্পনা মানে হচ্ছে এই যে আমি টাকাটা জমাচ্ছি। এটা কীসের জন্য জমাচ্ছি?

হতে পারে আমি ডিসেম্বরের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাব। তাহলে আমি সারা বছর ধরে বেড়ানোর জন্য একটা আলাদা জায়গাতে টাকা জমাতে পারি, অল্প অল্প। তাহলে বেড়ানোটা আমার গায়ে লাগবে না। হঠাৎ করে এতগুলো টাকা আমি বেড়ানোর জন্য বের করা একটু মুশকিল হতে পারে। সেজন্য জমাতে পারি। যেমন বড় কিছু আমি কিনতে চাই, গাড়ি কিনতে চাই। গাড়ির জন্য একটা বক্স আমি বানাব, সেখানে জমাতে পারি। রিটায়ারমেন্টে আমি চলে যেতে পারি। তার জন্য একটা আলাদা অ্যাকাউন্টে আমি কিছু টাকা জমাতে পারি। সঞ্চয় পরিকল্পনা লিখে রাখা। তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্রেডিবল হয়, আরও সহজে করা যায়।

ভবিষ্যতের জন্য যখনই সম্ভব ইনভেস্ট করব। ইনভেস্ট টা হচ্ছে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার থেকে অনেক বেশি ভালো। কারণ ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে টাকা কমতে থাকে, মান কমতে থাকে। তার মানে আসলে টাকাই কমতে থাকে। যখন ইনভেস্ট করবেন কোথাও, তখন কিন্তু টাকা বাড়বে। ওকে? বাড়ি কেনার জন্য, জমি কেনার জন্য, গাড়ি কেনার জন্য বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য যখনই সম্ভব ছোট ছোট ইনভেস্ট আমরা করতে পারি। অবশ্যই রিস্ক ক্যালকুলেশন করে- নইলে পুরোটাই হারিয়ে যেতে পারে। সাবধান! আগে লোন পরিশোধ করবো নাকি আগে সঞ্চয় করব? দুইটাই একসাথে করব। বাড়তি টাকাটা ভাগ করে ঋণ পরিশোধও করব, সঞ্চয়ও করব।

ঋণগ্রস্ত কোটিপতি কোন কাজের জিনিস না। আপনি আপনার আশপাশে অনেককে দেখবেন যে বিশাল গাড়ি হাঁকাচ্ছে, অনেক বড় বাড়ি, সব বিশাল বিশাল। কিন্তু ঋণগ্রস্ত। কোটি কোটি টাকা ঋণ এবং ওই ঋণটি পরিশোধ করার কোন মানসিকতাও অনেক সময় থাকে না। যেকোনো ভাবে সবার আগে আপনাকে ঋণমুক্ত হয়ে যেতে হবে। ঋণমুক্ত হওয়া এটা সবচেয়ে প্রাইম গোল। প্রাথমিক গোল হচ্ছে ঋণমুক্ত হওয়া।

কোন ঋণের কথা বলছি? যে ঋণে আপনাকে সূদ দিতে হয় না, সে রকম ঋণ। ওই রকম ঋণ হলে আপনি দুটোই একসাথে করবেন, জমানো এবং ঋণ শোধ করা। দুইটা একসাথে করবেন। আর যদি সূদের ঋণ হয়, তাহলে অবশ্যই ব্যতিক্রম। আগে ঋণ পরিশোধ করবেন। আমরা সূদের চক্করে এমনভাবে পড়ি যে এটা চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়তে থাকে এবং এটা একটা 'জীবনেও শেষ না হওয়া' জার্নি। এটা কখনো শেষ হয় না। সে রকম একটা অবস্থা তৈরি হয়।

সূদের ঋণের ক্ষেত্রে - আগে ঋণ পরিশোধ করবেন। সূদের চক্কর থেকে আগে বের হয়ে আসবেন। এটা খুব অশুভ একটা চক্র হয়ে যায়। একটা অশুভ চক্করে আমরা পড়ে যাই, যেখান থেকে জীবনেও কখনো বের হতে পারি না। এমনকি আমি গ্রামে দেখেছি, গ্রামের চাষী যারা আছে তারা এই যে মহাজন থেকে যে টাকা ধার নিয়ে আসে, জীবনেও শোধ করতে পারে না। কখনোই শোধ করতে পারে না। বারবার তাদের নতুন নতুন প্রয়োজন আসে। তারা আবার টাকা ধার নেয়, আবার সূদের বোঝা বাড়ে। তাদের সারা বছরের যে পরিশ্রমের ধান, সেগুলো পর্যন্ত তারা তাদেরকে রেগুলারলি দিতে থাকে এবং সারাজীবন ধরে দিতে থাকে। বংশ পরম্পরায় দিতে থাকে। অনেকবার করে বলছি, এটা সবার আগে শেষ করবেন। যে করে হোক, আগে শেষ করবেন।

বাড়তি লাভ এবং বাড়তি বেতন - হঠাৎ করে এই মাসে আপনার বিজনেস অনেক বেশি হয়ে গেল। ধরেন, বেশি টাকা চলে আসলো। তো সেই বেশি টাকা আপনি কী করেন? খরচ করে ফেলি। তাই না? খরচ করবেন না। আপনার লাইফস্টাইলে খরচ বাড়াবেন না। লাইফস্টাইলে যা খরচ ছিল, সেটাই রাখবেন। ওই টাকাটা আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন বা অন্তত সেভ করতে পারেন। সেভ করবেন অথবা বিনিয়োগ করবেন কোথাও। খরচ না। কারণ এটা আন এক্সপেক্টেড ছিল।

এফডি অথবা বীমা : Fixed Deposit অথবা বীমা ম্যাচিউর হওয়ার আগে তুলে ফেলবেন না। ম্যাচিউর হতে দেবেন, তারপর তুলবেন। অল্পস্বল্প প্রয়োজনে তুলে ফেলবেন না। নিজের একটা গল্প বলবো।

২০০৩ সালের কথা। একটা এফডি করেছিলাম, যেখানে আমাকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হতো। অল্প একটু টাকা জমা দিতে হতো। এটা দুই বছর পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তো এক বছর নয় মাসের মাথায় - এক ঈদে, আমি ইন্ডিয়া বেড়াতে যাব। জীবনে প্রথমবার দেশের বাইরে বেড়াতে যাব। আমি বেমালুম, মানে কোন সংকোচ ছাড়া, কোন হেজিটেশন ছাড়া, সোজা গিয়ে সেই টাকাটা তুলে নিয়ে আসছি। তো এই জিনিসগুলো করব না। এ রকম অল্পস্বল্প প্রয়োজনে আমরা এই কাজটা করব না। ম্যাচিউর হলে, সেই টাকা দিয়ে কী করব, সেটা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া আমাদের থাকতে হবে।

দান - প্রাচুর্যের চাবিকাঠি

জীবনের নানা বাঁকে আমরা প্রায়ই এক অদ্ভুত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হই - আমরা যা কিছু সঞ্চয় করি, তা কি কেবল আমাদের নিজেদের জন্যই? এই পৃথিবী, এই জীবন, এই প্রাপ্তিগুলো - এ কি কেবলই নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখার জন্য? কিন্তু গভীর থেকে গভীরে তাকালে আমরা এক অন্য সত্যের মুখোমুখি হই। যখন আমরা আমাদের সাধ্যমতো কিছু অন্যের সাথে ভাগ করে নিই, তখন কেবল আমাদের হাতই শূন্য হয় না, বরং হৃদয় ভরে ওঠে এক অনাবিল তৃপ্তিতে। এই তৃপ্তি কোনো পার্থিব মূল্যে কেনা যায় না। আর এখানেই লুকিয়ে আছে সেই প্রাচীন প্রজ্ঞা, যা বলে - দান করলে সম্পদ বাড়ে। এই বৃদ্ধি কেবল বস্তুবাদী নয়, এ হলো আত্মিক, মানসিক এবং অনেক ক্ষেত্রে কর্মের মাধ্যমে ফিরে আসা এক অমোঘ প্রাপ্তি।

ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এ দান অনেকগুনে ফিরে আসে - অনেক সময় আমরা মনে করি, আমার যা আছে তা যদি আমি অন্যকে দিই,

তবে আমার নিজেরই অভাব দেখা দেবে। এই ভয়টিই আমাদের অনেক সময় কৃপণ বা আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। কিন্তু যারা জীবনকে কাছ থেকে দেখেছেন, যারা উদারতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তারা জানেন যে এই ভয় অমূলক। যখন আপনি আপনার সামান্য অংশটুকুও নিঃস্বার্থভাবে অন্য কারো প্রয়োজন মেটাতে দান করেন, তখন কেবল সেই একটি মুহূর্তের জন্য নয়, বরং আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক ঢেউ তৈরি হয়। এটি যেন প্রকৃতির এক অলিখিত নিয়ম - আপনি যা দেবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আপনার কাছে ফিরে আসবে, হয়তো ভিন্ন রূপে, ভিন্ন সময়ে, কিন্তু তা আসবেই। হতে পারে সেটা কোনো নতুন সুযোগ, হতে পারে সেটা অপ্রত্যাশিত কোনো সাহায্য, অথবা হতে পারে সেটা আপনার মনকে শান্তি ও স্থৈর্যের এক গভীর অনুভূতির মাধ্যমে।

স্ট্রেস ম্যানেজ করতে দান - এই 'সম্পদ বৃদ্ধি'র ধারণাটি আসলে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক অনুবন্ধ। যখন আমরা দান করি, তখন আমরা অবচেতন মনে এই বার্তা দিই যে, আমার জীবনে প্রাচুর্য রয়েছে এবং আমি তা ভাগ করে নিতে সক্ষম। এই ইতিবাচক মানসিকতা এবং কর্ম আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, আমাদের দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করে এবং নতুন সম্ভাবনাকে আকর্ষণ করে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যখন আমরা অন্যের ভালোতে আনন্দিত হই, যখন আমরা নিজের সাধ্যমতো সহায়তা করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে সুখের হরমোন (যেমন- ডোপামিন, সেরোটোনিন) নিঃসৃত হয়, যা আমাদের মনকে শান্ত করে, উদ্বেগ কমায় এবং আমাদের এক ধরণের আত্মতৃপ্তি দেয়। তাই, দান করা কেবল অন্যের জন্য নয়, এটি নিজের মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য সুরক্ষারও এক শক্তিশালী উপায়।

উদারতার চাবিকাঠি - জীবনে প্রাচুর্য্যের আগমন

আসুন, আমরা এই "দান করলে সম্পদ বাড়ে" এই তত্ত্বকে কেবল কথায় সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে আমাদের জীবনের একটি সক্রিয় অভ্যাসে পরিণত করি। এই অ্যাকশন প্ল্যানটি আপনাকে ধাপে ধাপে এই যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করবে।

ধাপ ১: 'উদারতার বাজেট' নির্ধারণ করা (প্রথম সপ্তাহ)

- **একটি ক্ষুদ্র শুরু:** প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে আপনার আয়ের বা সম্পদের একটি ক্ষুদ্র অংশ (যেমন: ১% বা ০.৫%) দান করার জন্য আলাদা করে রাখুন। এটি হতে পারে আপনার প্রতিদিনের এক কাপ চা বা একটি ছোট কেনাকাটার খরচ বাঁচিয়ে।
- **সময়ের হিসাব:** যদি আর্থিক দান সম্ভব না হয়, তবে সপ্তাহে অন্তত একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন: ১-২ ঘন্টা) অন্যের উপকারে লাগানোর লক্ষ্য স্থির করুন।
- **জ্ঞানের দান:** আপনি যে বিষয়ে পারদর্শী, তা অন্যকে শেখাতে বা তার সম্পর্কে তথ্য দিতে ব্যবহার করুন।

ধাপ ২: 'ছোট্ট দানের' তালিকা তৈরি করা (দ্বিতীয় সপ্তাহ)

- **দৈনিক ক্ষুদ্র দান:**
  - √ আজ কাকে একটি আন্তরিক হাসি উপহার দেবেন?
  - √ আজ কাকে একটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন?
  - √ আজ কাকে একটি ইতিবাচক মন্তব্য দিয়ে উৎসাহিত করবেন?

  - √ আজ আপনার আশেপাশে কাউকে (যেমন: বাসার দারোয়ান, গাড়িচালক, সহকর্মী) অপ্রত্যাশিতভাবে ছোট উপহার বা সাহায্য করবেন।
- **কৃতজ্ঞতা লিখে রাখা:** প্রতিটি ছোট দান বা উদারতার পর আপনার কেমন লাগছে, তা একটি জার্নালে লিখে রাখুন।

ধাপ ৩: সময় ও সম্পদকে ভাগ করে নেয়া(তৃতীয় সপ্তাহ)

- **স্বেচ্ছাসেবী কাজ:** আপনার পছন্দের কোনো দাতব্য সংস্থা বা সামাজিক কাজে সপ্তাহে অন্তত একবার কিছু সময় দিন। এটি হতে পারে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া, পথশিশুদের সাথে সময় কাটানো, বা পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নেওয়া।
- **সম্পদের পুনর্বন্টন:** আপনার অব্যবহৃত জিনিসপত্র - (যেমন জামাকাপড়, বই, খেলনা) তাদের দান করুন।
- **পরামর্শ বা দক্ষতা দান:** আপনার পেশাগত জ্ঞান বা কোনো বিশেষ দক্ষতা যদি অন্য কারো উপকারে আসে, তবে নিঃস্বার্থভাবে তা দিয়ে সাহায্য করুন।

ধাপ ৪: প্রভাব মূল্যায়ন ও অভ্যাস তৈরি (চতুর্থ সপ্তাহ)

- **অনুভূতির জার্নাল:** গত কয়েক সপ্তাহে আপনার উদারতার কাজগুলো আপনার মানসিক অবস্থা, স্ট্রেস লেভেল এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর কী প্রভাব ফেলেছে, তা পর্যালোচনা করুন।
- **কীভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পেল?** দেখুন, আপনার জীবনে কোনভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন বা সুযোগ এসেছে কিনা - হতে পারে তা অপ্রত্যাশিত কোনো সাহায্য, নতুন কোনো সম্পর্ক, অথবা কেবলই মানসিক শান্তি।
- **স্থায়ী অভ্যাস:** এই দান বা উদারতার অভ্যাসটিকে আপনার জীবনের একটি অংশ করে তুলুন। এটিকে কেবল একটি কাজ নয়, বরং আপনার জীবনের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করুন।

মনে রাখতে হবে -

- দান কেবল অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়। আপনার সময়, জ্ঞান, ভালোবাসা, সহানুভূতি - এগুলোও অমূল্য দান।
- দান করার সময় প্রত্যাশা রাখবেন না। নিঃস্বার্থভাবে যা পারেন, তাই করুন।
- এই কাজটি যেন আপনার উপর কোনো চাপ সৃষ্টি না করে, বরং আনন্দদায়ক হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

এই অ্যাকশন প্ল্যানটি অনুসরণ করে আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন যে, উদারতার মাধ্যমে কীভাবে আপনার জীবনে প্রকৃত সম্পদ - শান্তি, আনন্দ এবং সমৃদ্ধি - বৃদ্ধি পায়।

আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলব, যেটা দিয়ে আমি এই পর্ব শেষ করতে চাই। এই যে আমার এতগুলো টাকা বেমালুম খরচ হয়ে গেল, কোথায় যে খরচ করেছি, সেটা আমার কোন আইডিয়া নাই। এটা আমি জানিনা। এটা যেমন জানি না - এই যে আমার এত ভালো একটা জব বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার পর যে রেগুলার ইনকাম যেটা ছিল, সেটাও যে বন্ধ হয়ে গেল। এরপর যে এতদিন পর্যন্ত জবলেস। বিশাল দারুণ একটা জব। এটা কিন্তু নাই হয়ে গেল। কীভাবে চলছিল? এটাও আসলে আমরা জানিনা। এটাও জানি না কীভাবে যে চলছে, কীভাবে যে হয়ে যাচ্ছে ব্যবস্থা। এটা একধরনের অটোমেটিক।

এটাই হচ্ছে অলৌকিক একটা ব্যাপার। সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে একটা বিশাল রহমত। একটা বিশাল নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে কিন্তু রিজিক দিয়ে যাবেন। কোত্থেকে আসবে? এটা একেবারেই আনপ্রেডিক্টেবল। একেবারেই অকল্পনীয়। অকল্পনীয় ভাবে রিজিক আসে। মহান সৃষ্টিকর্তা, একইসাথে আমাদের পালনকর্তাও।

যাই হোক। আমাদের দরকার হচ্ছে সাবধান থাকা। মানুষ হিসেবে আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, সেটুকু সাবধানতা আমাদেরকে নিতে হয়। মানি ম্যানেজমেন্ট আপনাদের স্ট্রেস কমাতে পারে। এটা হচ্ছে গিয়ে বটম লাইন। এই সাথে মানি ম্যানেজমেন্ট এর এই পর্ব শেষ করছি। যথারীতি অ্যাকশন প্ল্যানিং এর জন্য ছক করে দেওয়া আছে, আশা করি সবাই সেটাকে কাজে লাগাবেন।

অ্যাকশন প্ল্যানিং

স্টেপ ১: বাজেট প্ল্যানার

মাসিক বাজেট পরিকল্পনা

ক্যাটাগরি	আনুমানিক বাজেট (%)	পরিমাণ (৳)	মন্তব্য
মাসিক আয় (৳)	১০০%		নিশ্চিত মাসিক আয় ধরে তৈরি।
অপরিহার্য খরচ (৫০%)	৫০%		বাসা ভাড়া, বিল, খাবার।
প্রয়োজনীয় খরচ ২০%)	২০%		বাজার খরচ, স্বাস্থ্য।
সঞ্চয় (২০%)	২০%		ভবিষ্যতের জন্য।
অপ্রয়োজনীয় খরচ (১০%)	১০%		বিনোদন, বাইরে খাওয়া।

স্টেপ ২: সঞ্চয়ের পরিকল্পনা

স্বল্পমেয়াদি সঞ্চয় (১০%)

মাসিক _____ টাকা, ছোট ছোট লক্ষ্যের জন্য (বেড়ানো, ইমারজেন্সি)।

দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় (১০%)

মাসিক _____ টাকা, রিটায়ারমেন্ট বা বড় কিছু কেনার জন্য।

ইমারজেন্সি ফান্ড:

প্রথম ৬ মাসে তিন মাসের খরচের সমপরিমাণ জমা করার লক্ষ্য রাখুন।

নোট –

নোট –

মাইন্ডফুলনেস

মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যার একটি সচেতনতা আছে। মানুষ যে কোন বিষয়ে বিস্তারিত ভাবতে পারে এবং সেই বিষয়ে নিজের মতামত দিতে পারে এবং অ্যাকশন নিতে পারে। মানুষের নিজস্ব একটা ইচ্ছাশক্তি আছে, নিজস্ব একটি সচেতনতা আছে, যা আর কারও নেই।

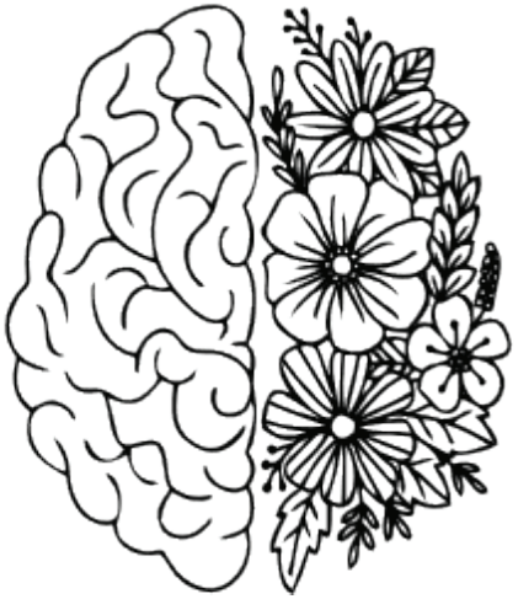

'মাইন্ডফুলনেস' এর ধারণা

এই পর্বে আমরা আত্মসচেতনতা Mindfulness বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের একটি অনেক বড় অংশ হচ্ছে এই মাইন্ডফুলনেস। আপনি কী ভাবেন, আপনি কীভাবে ভাবেন?

মানুষ দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে তৈরি, এটা আমরা সবাই জানি। একটি হচ্ছে মানুষের শরীর, এই দেহটি। আরেকটি হচ্ছে মানুষের মন।

আমাদের অনুভূতিগুলো বহির্মূখী - পৃথিবীতে চলার জন্য আমরা যে অনুভূতিটুকু ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে সবসময় বহির্মূখী। আমাদের বাইরে যা কিছু চলছে, এই জিনিসগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করি। যেমন, এখন যদি একটু গরম পড়ে তাহলে আমরা ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছি। আমাদের শরীর অনুভব করছে যে এখন গরম লাগছে বা এখন যদি একটা মশা কামড়ায়, তাহলে আমরা কি করি? সাথে সাথে খুঁজতে থাকি মশাটি কোথায়, সেটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করি, তাই না? আমরা অনুভব করি শরীর দিয়ে। অথবা বাইরে যদি একটা সাউন্ড হয় কোথাও, বা আমাদের শরীরের উপর দিয়ে যদি পিঁপড়াও হেঁটে যায়, আমরা কিন্তু সেটা অনুভব করি এবং সেই জিনিসটা সম্পর্কে সচেতন হই।

কিন্তু মানুষের মন শরীরের ভেতরে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, যদি সেই ব্যাপারগুলো আমাদের ডিস্টার্ব না করে, তাহলে আমরা কিন্তু সে ব্যাপারে সচেতন হই না। যেমন, আমাদের সবার শরীরের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে - এটি আমরা অনুভব করতে পারি না। এটা আমাদের অনুভবের বাইরে। আমাদের যে অনুভব, সেটি স্বাভাবিকভাবে বহির্মূখী। আমাদের মন বাইরের দিকে বেশি নজর দেয়, ভেতরের দিকে তত বেশি নজর দেয় না। এই যে আমাদের হার্ট চলছে, সারাদিন এক লক্ষ বারেরও বেশি এই হার্ট-টি বিট করে যাচ্ছে। এটি কিন্তু আমরা অনুভব করি না, তাই না? আমরা কি ততক্ষণ হার্টের ব্যাপারে চিন্তা করি যতক্ষণ সেটি ঠিকভাবে চলছে? করি না।

আমরা শান্তি কোথায় হারিয়েছি?

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা-কে আমরা সবাই চিনি। এক সন্ধ্যায় নাসিরুদ্দিন হোজ্জার এক বন্ধু দেখলেন, তিনি ল্যাম্প পোস্টের নিচে কী যেন খুঁজছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, *'কী হারিয়েছ? কী হয়েছে? কী খুঁজছ?'*

তখন হোজ্জা বললেন, *'আমার চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না।'* বন্ধু বললেন, *'আচ্ছা, ঠিক আছে, খুঁজে দেখো, হয়তো তুমি পেয়ে যাবে।'* তারপর তিনি চলে গেলেন। ঘণ্টা তিনেক পর যখন তিনি ঐ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনও দেখলেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা খুঁজেই যাচ্ছেন।

তখন বন্ধু বললেন, *'তুমি এতক্ষণেও খুঁজে পাও নাই'?* নাসিরুদ্দিন বললেন, *'বন্ধু, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাচ্ছি না'।*

তখন বন্ধু তাকে সাহায্য করার জন্য চাবিটা খুঁজতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

তখন বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, *'আচ্ছা, তুমি এক্সাক্টলি চাবিটা কোথায় হারিয়েছিলে'?*

তখন নাসিরুদ্দিন বললেন, *'ঘরের ভেতরে'।*

বন্ধু অবাক হয়ে বললেন, *'তুমি ঘরের ভেতরে হারিয়েছ, আর এখানে খুঁজছ কেন? এখানে খুঁজলে তো তুমি কখনো পাবে না'!*

তখন নাসিরুদ্দিন বললেন, *'ভেতরে তো অন্ধকার। সেখানে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে একটু আলো আছে, তাই এখানে এসে খুঁজছি'।*

যদিও এই গল্পটা অনেক হাস্যকর এবং বোকা বোকা টাইপের মনে হয়, আমরা কিন্তু এই বোকামিটাই সারাক্ষণ করে যাচ্ছি।

আমাদের শান্তি যেখানে হারিয়েছি সেখানে না খুঁজে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মতো অন্য সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, সারাজীবন খুঁজলেও কি পাবো?



শান্তি কোথায় হারিয়েছি? বাইরে নাকি ভেতরে? আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, শান্তি থাকে কোথায়? শান্তি আসলে ভেতরে হারিয়েছি। আমাদের ভেতরের যে শান্তিটা, সেটাই আমরা হারিয়েছি।

কিন্তু আমরা খুঁজছি কোথায়? বাইরে। মেটেরিয়ালিজমের ভেতরে, টাকা-পয়সার ভেতরে। আমরা শান্তি খুঁজে চলেছি শারীরিক সুখের মধ্যে। আসলেই শান্তি খুঁজতে হবে কোথায়? যেখানে আমরা হারিয়েছি – আমাদের ভেতরে, আমাদের মনের মধ্যে।

কিন্তু আমরা সাধারণত কী করি? ভেতরে তাকাই না, ভেতরের দিকটা দেখি না, ভেতরের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করি না। আমরা সবসময় বাইরের দিকে তাকাই। বাইরে আমাদের শান্তিগুলো খোঁজার চেষ্টা করি। বাইরের জিনিস আমরা সল্‌ভ করার চেষ্টা করি। আমরা মনে করি, বাইরের জিনিস সল্‌ভ হয়ে গেলেই ভেতরের শান্তি আসবে।

বন্ধুরা, আমরা এই পর্যায়ে ভেতরের শান্তি কীভাবে খুঁজে বের করা যায়, আমাদের ভেতরের দিকে কীভাবে তাকানো যায়, সেই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো। এটি খুবই চমৎকার একটি টপিক। সাথে থাকতে হবে কিন্তু !

সচেতনতার সূত্র

সচেতনতা এটি এমন একটি চমৎকার জিনিস যেটি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। অন্য কোন প্রাণী মানুষের মতো সচেতন নয়। তারা অটোমেটিক সিস্টেমে প্রবৃত্তিগতভাবে সমস্ত কাজ করতে থাকে। যেমন, একটি গরু জন্মের পর থেকে কোন সময় কী করবে বা করবে না, সে কোন বয়সে উঠে দাঁড়াবে, কোন সময় হাঁটবে, কোন সময় ঘাস খাবে, কোন সময় সে বাসায় যাবে–এই সমস্ত জিনিসগুলো তার ব্রেইনের মধ্যে সেট করে দেওয়া আছে। এই সেট প্রোগ্রামের বাইরে সে আর কিছুই করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা প্রবৃত্তির বশে সব কাজ করে।

মানুষ কিন্তু সে রকম নয়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যার একটি সচেতনতা আছে। মানুষ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, সেই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবতে পারে এবং সেই বিষয়ে নিজের মতামত দিতে পারে এবং অ্যাকশন নিতে পারে। রাইট? মানুষের নিজস্ব একটা ইচ্ছাশক্তি আছে, নিজস্ব একটি সচেতনতা আছে।

মানুষ এই ব্যাপারটা দিয়ে অনেক বেশি ব্লেসড, অনেক বেশি সৌভাগ্যবান যে সে এই ব্যাপারটা করতে পারে। মানুষের আজকের যে উন্নতি, এটি এই সচেতনতার কারণে। মানুষ যখন বুঝতে পেরেছে যে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা দরকার, তখন সে সেখানে ফোকাস দিতে পেরেছে এবং সেটি নিয়ে এগোতে পেরেছে। সেটি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছে এবং জ্ঞান তৈরি করতে পেরেছে।

সত্যিকারের উদাহরণ - এই যে আমরা আমাদের লাইফস্কিল প্রোগ্রামটি শুরু করলাম, এই যে soft skill শেখানোর যে প্রোগ্রাম – এটির ব্যাপারে যখন চিন্তা করলাম, প্রথম আমরা খেয়াল করলাম যে আশপাশের মানুষ এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বেশি ক্রাইসিসে আছে কিন্তু আবার একই সাথে এ ব্যাপারে অনেক উদাসীন। তখন ভাবলাম যে আচ্ছা, এ বিষয়ে কিছু করা যেতে পারে। আমাদের ভেতরে একটা সচেতনতা তৈরি হলো। তখন আমরা এই বিষয়ে কিছু লেখাপড়া করতে শুরু করলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করলাম এবং এটাকে একটা ফরম্যাটে নিয়ে আসতে শুরু করলাম যে এটা কীভাবে করলে মানুষের মধ্যে এই সচেতনতাটুকু ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এটির ফলাফল কিন্তু আজকে যে আপনারা এই বইটি পড়ছেন, সেটি। এই বইটি পড়ার কারণে আপনার জীবনে অনেক চাপ কমে যাবে, আপনি যদি অবশ্যই এটাকে অ্যাকশনে রূপান্তরিত করেন এবং এটি আপনার জীবনে একটা অনেক মূল্যবান, অমূল্য একটি ভ্যালু অ্যাড করবে।

এটি কিন্তু অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব না। একটা গরু বা কুকুর কখনো নিশ্চয়ই 'স্ট্রেস ম্যানেজ' করার জন্য বই পড়বে না বা কোর্স করতে পারবে না। এটি শুধুমাত্র মানুষই করতে পারে। মানুষের কাছেই শুধু এই ব্লেসিংটি রয়েছে।

এই যে আমরা শ্বাস নিচ্ছি প্রতি মুহূর্তে - আমরা শ্বাস নিচ্ছি। আমরা যদি শ্বাস না নেই, কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখি, তাহলে কেমন হয়? চলেন তো আমরা একটু ট্রাই করি। কতক্ষণ আমরা শ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারি? আপনি একটু ঘড়ি বা স্টপওয়াচের দিকে তাকান। আপনি কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখেন। কতক্ষণ থাকতে পারেন? যখন এই নিঃশ্বাস শেষের দিকে চলে আসে, তখন আপনার কেমন লাগে না? একটুখানি অক্সিজেনের জন্য আপনার ফুসফুস হাহাকার করতে থাকে।

এই যে নিঃশ্বাস আমাদের চলছে, এটি সম্পর্কে কি আমাদের কোন সচেতনতা আছে? নেই। কারণ এটি অটোমেটিকভাবে চলছে এবং কোন ঝামেলা করা ছাড়া চলছে। ঝামেলা করার আগ পর্যন্ত আমাদের এ বিষয়ে কোন সচেতনতা থাকে না। একই রকমভাবে আমাদের মনের ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা বেশ কম।

যখন কোন মানুষ এসে আমাদেরকে আক্রমণ করছে বা আমাদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করছে, আমরা স্বাভাবিকভাবে একটা রি-অ্যাকশন দেখাচ্ছি, এবং এই রি-অ্যাকশন দেখানোর সময় আমরা ভাবি না। যেমন একজন মানুষ আমাকে গালাগালি দিল বা খারাপ কিছু বলল, ওই সময় আমরা ভাবতে পারি না, বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করতে পারি না। কেমন? অটোমেটিক একটা রি-অ্যাকশন আমাদের মধ্যে চলে আসে।

আপনি যদি আপনার স্ট্রেস-টিকে কন্ট্রোল করতে চান, এই রি-অ্যাকশন দেওয়াটা বন্ধ করতে হয়। এই বিরূপ যে অবস্থাটা তৈরি হয়, আমাদের

বিপক্ষে যে অবস্থাটা তৈরি হয়, সেই সময় আপনি ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারেন কিনা, মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন কিনা–এটি আসলে ম্যাটার করে। যেই মানুষ যত ভালোভাবে এই কাজটা করতে পারবে, সে তার স্ট্রেস তত ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারবে।

ইন্দ্রিয়ের ওপর সচেতনতা - আমরা কী কী শুনব এবং কী কী শুনব না, সে বিষয়ে কি আপনার কোন সচেতনতা আছে? আপনি বলবেন যে, কী শুনব বা শুনব না, সেটা আমরা কীভাবে ঠিক করব? সেটা আমরা ঠিক করতে পারব না। আশপাশের মানুষ আমাদের সম্পর্কে ভালো বলবে এবং আমাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলবে। কেউ কেউ আমাদেরকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করবে, কেউ কেউ আমাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দেবে। এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। যতটুকু আমরা আমাদের আচরণ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি, সেটাই আসলে সব। সব জিনিস আমরা আসলে কন্ট্রোল করতে পারব না।

কে কী বলবে না বলবে, কে আমাদের ফেসবুক বা পোস্টে কী কমেন্ট করবে, কীভাবে আক্রমণ করবে–এই জিনিসটা অনেকটা আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যখন কেউ আক্রমণ করে বসবে, তখন সেটা আমরা কীভাবে নেব, এই কথাটাকে আমরা কীভাবে নেব–এটা কিন্তু আমাদের হাতে। রাইট বন্ধুরা? আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি।

তো কী কী আমি দেখব বা কী কী দেখবো না, এটি কে ঠিক করবে? সেটা আমি ঠিক করব। ধরেন, আমরা একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কোন একটা খারাপ ব্যাপার ঘটছে সেখানে। আমরা সেদিকে তাকাতেও পারি, অথবা না-ও তাকাতে পারি। আমরা ব্যাপারটাকে আমাদের ভেতরে নিতেও পারি, অথবা না-ও নিতে পারি। নেব কি নেব না, সেটা কে ঠিক করবে? অবশ্যই আমরা ঠিক করব।

বন্ধুরা, এটি হচ্ছে সচেতনতার সূত্র। সচেতনভাবে আমরা কোন জিনিসটা দেখব এবং কোন জিনিসটা দেখবো না। আমরা সচেতনভাবে কোন কথাটা শুনব এবং কোন কথাটা শুনব না।

বাইরে নয়, ভেতরে তাকাতে হয় - আমরা বাইরের সব বিষয় অনেক বেশি সচেতন। এই কথাটা আমরা আগেই বলেছি। কোন মানুষ কী পোশাক পরেছে, কোন মানুষ কীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, কোন মানুষ ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছে কিনা, কোন মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে কিনা–এ ব্যাপারগুলো আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করি। কিন্তু আমাদের ভেতরে, মনের ভেতরে আমরা কীরকম–সেটা আমরা তেমন একটা খেয়াল করি না। ঠিক? নিজেদের বাহ্যিক ব্যাপার সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি সচেতন। কিন্তু নিজেদের শরীরের ভেতরের ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা অনেক কম। একইভাবে নিজের মনের ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে, আমাদের আবেগ সম্পর্কে, আমাদের চিন্তা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা অনেক অনেক কম।

এই ব্যাপারটাকে উন্নত যদি আমরা করতে পারি, নিজের ভেতরে কী চলছে এই সম্পর্কে যদি আমরা আমাদের awareness নিয়ে আসতে পারি, আমাদের সচেতনতা তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা অনেক ভালোভাবে আমাদের স্ট্রেস গুলোকে ম্যানেজ করতে পারব।

ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা

ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তা করতে থাকি–কী হবে না হবে, তাই না? এ রকম কেন হচ্ছে? ভবিষ্যতে আমরা কী করব? আমাদের ছেলেমেয়েরা কী করবে? তারা কীভাবে বেঁচে থাকবে? আমরা কীভাবে সারভাইভ করব? বুড়ো হয়ে গেলে আমরা কী করব? শক্তি চলে গেলে আমরা কী করব? অসুখে পড়ে গেলে আমরা কী করব? যেই জিনিসগুলো এখনও আসে নাই, ভবিষ্যৎ সেগুলো নিয়ে আমরা অনেক বেশি কিন্তু চিন্তা করি। আরেকটু স্পেসিফিকালি বলতে গেলে, আমরা বেশি দুশ্চিন্তা করি।

বন্ধুরা, আমরা আসলে থাকি কোথায়? আমরা কি অতীতে থাকি, নাকি আমরা ভবিষ্যতে থাকি? আমরা থাকি বর্তমানে। বর্তমান সময়টাকে নিয়ে আমরা সবচেয়ে কম চিন্তা করি। কিন্তু বর্তমান সময়টাকেই কিন্তু আমরা আসলে কাজে লাগাতে পারি। অতীত–এই ব্যাপারটাও আমাদের হাতে যেমন নাই, ভবিষ্যতেও আসলে তেমন আমাদের হাতে নাই।

আমাদের হাতে যে সময়টি আসলেই আছে, সেটি হচ্ছে বর্তমান সময়, এই মুহূর্ত, This very moment - এই মুহূর্তটাকে যদি আমরা কাজে লাগিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে এবং আমাদের অতীত-ও ভালো হবে। কীভাবে অতীত ভালো হবে? আমরা যখন ভবিষ্যতে যাব, আজকের দিনের কথাটা চিন্তা করে আমি বলতে পারব – 'হ্যাঁ, আমি আমার এই সময়টাকে কাজে লাগিয়েছিলাম।'

আর আজকের দিনটা যদি ঠিকভাবে কাজে লাগাই, তাহলে সেটার একটা রেজাল্ট তো ভবিষ্যতে অবশ্যই আসবে। তাহলে বর্তমান সময়টাকে নিয়ে যদি আমরা সচেতন থাকি, তাহলে আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুইটাই কিন্তু ভালো হতে যাচ্ছে। আমাদের awareness-টা বাড়াতে হবে আমাদের বর্তমান সময়টি সম্পর্কে।

অতীত বলে আসলে কিছু নাই। মানে, অতীত আপনার কন্ট্রোলে নাই। অতীত হচ্ছে কতগুলো স্মৃতি – ব্রেইনে পড়ে থাকা কতগুলো স্মৃতি, কতগুলো ঘটে যাওয়া ঘটনা। যেটা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না, যেটার উপর আমাদের কোন হাত নাই। আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে কল্পনা, আমাদের চিন্তার অনুকূলে যেতেও পারে, না-ও যেতে পারে, আমরা জানি না। প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎ চিন্তা হচ্ছে একেকটা কল্পনা। এই কল্পনাটা সত্যি হতে পারে অথবা কল্পনা সত্যি না-ও হতে পারে। রাইট?

বর্তমান যে সময়টা, এটি হচ্ছে আপনার জীবন। তাহলে আমরা মনোযোগটা কোথায় দেবো? কোন জায়গায় আমরা সচেতন হব? বর্তমানে। এই সময়টাতে আমরা যে কাজটা করছি, সেখানেই।

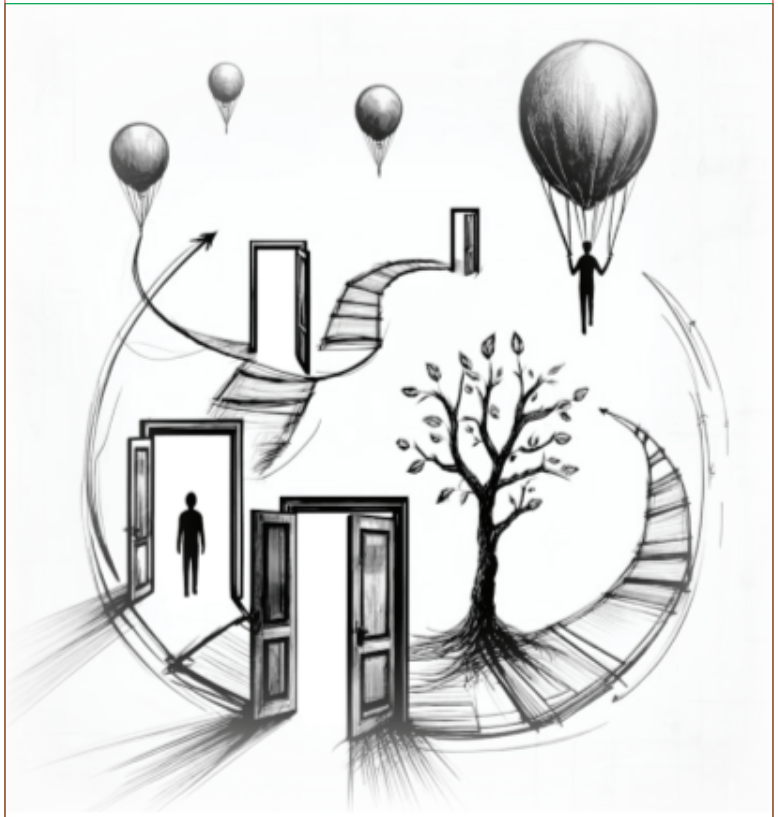

আমরা যে এই সময়ের পথটি ধরে হেঁটে যাচ্ছি, এই হেঁটে যাওয়ার যে রাস্তা, সেটা সম্পর্কে আপনি কতটুকু কনফিডেন্ট? সেটি সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বা এই সম্পর্কে আপনি কতটুকু সচেতন?

আপনি যদি আপনার রাস্তা সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে সেই রাস্তায় আপনি সাবলীলভাবে হাঁটতে পারবেন না। কোন একটি অচেনা রাস্তায় আপনি যদি হাঁটতে থাকেন, তাহলে আপনার মধ্যে সন্দেহ থাকে। এই সন্দেহ যত বেশি ঘনীভূত হবে, যত বেশি সন্দেহপ্রবণ আপনি হবেন, তত আপনি আসলে কম হাঁটতে পারবেন। তত কম আপনি ওই রাস্তায় চলতে পারবেন।

তাই, আপনি যদি আপনার রাস্তা সম্পর্কে কনফিডেন্ট হন, আপনি যদি জানেন যে দুই বছর পর এই রাস্তা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে, এটা যত বেশি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে, তত বেশি ওই রাস্তায় হাঁটা আপনার জন্য সহজ হবে। আশা করি, আপনারা ব্যাপারটা রিলেট করতে পারছেন।

লক্ষ্য থাকতেই হবে - তার মানে আমাদের গোল থাকতে হবে–কোথায় আমরা পৌঁছাতে চাই। যে রাস্তায় আপনি হাঁটছেন, সেই রাস্তা আপনাকে সেই গোলে পৌঁছে দেবে কি না, এই ব্যাপারে আপনি কতটুকু সচেতন? কতটুকু কনফিডেন্ট? এটি কিন্তু আসলে ম্যাটার করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে–আমরা এখন যে সময়টাতে বসে আছি, এখানে বসে আপনি আসলে কতটুকু দেখতে পারেন আপনার ভবিষ্যৎ? কতটুকু আপনি বিল্ড করতে পারেন? যতটুকু আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পারবেন, ততটুকু স্ট্রেস ফ্রি হতে পারবেন। দেখতে পারবেন বলতে–যতটুকু আপনি আন্দাজ করতে পারবেন, ততটুকুই সাবলীল হবেন।

ব্যাপারটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। ঘুম ভেঙে চোখ খুলে দেখলেন যে আপনি একটা চেয়ারে বসে আছেন। একটা চেয়ারে বসে আছেন এবং চারদিকে অন্ধকার। শুধু একটুখানি আলো আছে যেখানে আপনি বসে আছেন, ওই চেয়ারটার উপরে।

আপনি কিন্তু এই অবস্থায় বসে কল্পনা করতে পারবেন না যে আপনি যেখানে বসে আছেন, সেটা আসলে কত বড় একটা জায়গা। আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আপনি একটা ছোট্ট রুমের মধ্যে বসে আছেন। একটা রুমের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে আছেন, যে রুমটা অন্ধকার।

যখন একটু পর কিছু আলো জ্বালানো হলো আশেপাশে, তখন আপনি আরও একটু জায়গা দেখতে পেলেন। আপনার কাছে মনে হলো যে এটি বেশ বড় একটা রুম। এটা এত বড় রুম যে আপনি আসলে চিন্তা করেন নাই। আরও কিছু আলো জ্বালানোর পরে আপনার কাছে মনে হলো এটা একটা বিশাল অডিটোরিয়াম।

কিছুক্ষণ পর আরও কিছু আলো জ্বালানো হলো। আপনার কাছে মনে হলো যে আপনি একটি স্টেডিয়ামের মাঝখানে বসে আছেন। স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইটগুলো এখন জ্বলছে। পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এখন পরিষ্কার। আপনার কাছে মনে হচ্ছে–ওয়াও, আমি তো বিশাল একটা স্টেডিয়ামের মাঝখানে বসে আছি।

এই যে দেখুন, আপনি কিন্তু সারাক্ষণ একটা চেয়ারেই বসে আছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আলো জ্বলে নাই, আপনি কিন্তু বুঝতে পারেন নাই যে আপনি কত বড় একটি জায়গায় বসে আছেন। এই যে আলোর কথা বলছি, এটি হচ্ছে আপনার সচেতনতার আলো। আপনার শিক্ষার আলো। আপনি কতটুকু শিখলেন, আপনি কতটুকু ইনফরমেশন পেলেন, আপনি কতটুকু শিক্ষা নিজের ভেতরে ধারণ করলেন। যত বেশি আপনি শিখতে থাকবেন সময়ের সাথে সাথে, এবং যত বেশি আলো আপনার ভেতরে ধারণ করবেন, আপনার পৃথিবী তত বড় হয়ে যাবে। এটি আসলে স্টেডিয়াম না, এটি আরও বড় একটি খোলা জায়গা। আপনি বসে

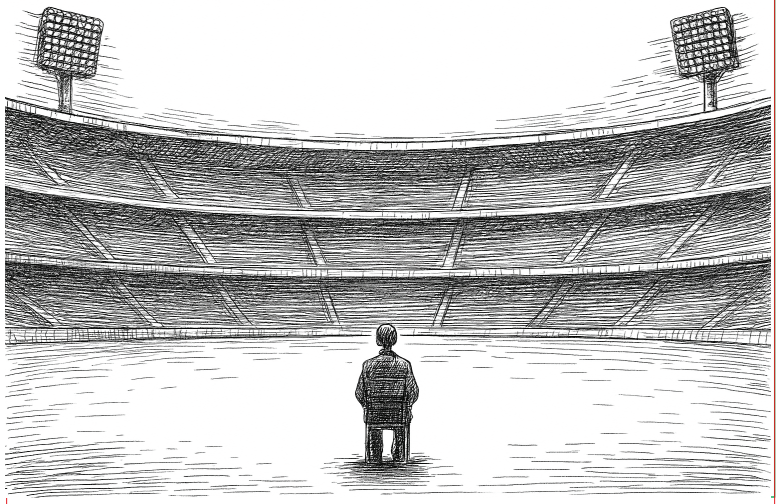

আছেন, আলো এখনও জ্বলছে না বলে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না। যখন আলো জ্বলবে, যখন সকাল হবে, দিনের আলোয় আপনি দেখবেন যে আপনি বিশাল এক মহাদেশের মাঝখানে বসে আছেন এবং এখানে কোন বাউন্ডারি নেই। আপনি বাউন্ডারি ছাড়াই একটা জায়গায় বসে আছেন।

তাহলে আমরা কোথায় বসে আছি? যতটুকু আমাদের সচেতনতা, সেইটুকুই আমরা আসলে দেখি। আমরা যদি আমাদের লাইটগুলো বন্ধ করে রাখি, আপনি খুব বেশি দেখতে পারবেন না। রাইট? তাই ভবিষ্যৎ এবং অতীত নয়, আমরা সচেতন হব আমাদের বর্তমানটাকে নিয়ে। কারণ আপনি ভবিষ্যতে গিয়ে কোন লাইট জ্বালাতে পারবেন না। অতীতে গিয়েও কোন লাইট নেভাতে বা জ্বালাতে পারবেন না। আপনি লাইট জ্বালাতে পারবেন বর্তমানে, এই সময়টাতে। রাইট নাউ।

এখন, আপনি যত আলো জ্বালাবেন, যত আপনি জ্ঞান আহরণ করবেন এবং সেই জ্ঞানকে ইন্টার্নালাইজ করবেন, নিজের ভেতরে ধারণ করবেন এবং তা পালন করবেন, আপনার আচরণে সেটার প্রতিফলন ঘটবে। আরেকটি কথা আবার বলে দিচ্ছি, আগেও বলেছি এবং বারবার বলে যাব – শুধু জ্ঞান কোন কাজের জিনিস নয়। জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের জীবনে কাজে না লাগাবেন, ওই জ্ঞান কোন কাজের নয়, ওটা আপনার ব্রেইনের জন্য একটা ফালতু বোঝা।

বিচ্ছিন্নতার সূত্র

এই পর্বে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব–আমি এই যে মানুষটা, আমি আসলে কে? Who am I? এই প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। যত দার্শনিক এসেছিলেন, তারা সবাই এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করেছেন –

আমি আসলে কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কোথায় ফিরে যাব? এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এর থেকে বেশি গবেষণা, মনে হয়, আর কোনো কিছুতেই হয়নি।

আমি কে? চলুন এটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি - খুবই লজিক্যাল ভাবে এবং insightfully, খুবই সচেতনতার সাথে।

একটি উদাহরণ: আপনাকে খুব জরুরি কাজে ঢাকায় যেতে হচ্ছে। এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলেন এবং যথারীতি জ্যামে পড়লেন। আপনি জানতেন জ্যামে পড়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এই জ্যাম যে এত সাংঘাতিক হবে এবং এত লম্বা সময় ধরে চলবে, এটা চিন্তা করেননি। আপনার স্ট্রেস, আপনার টেনশন আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। স্ট্রেস চরমে উঠল যখন আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনি সময়মতো পৌঁছাতে পারবেন না। এই জ্যাম দেখে মনে হচ্ছে আজকের প্লেনটি আপনি মিস করবেন।

আপনি একদম শেষ মুহূর্তে সেই জ্যাম থেকে মুক্তি পেলেন। আপনি নিশ্চিত যে আজকের প্লেনটা মিস করবেন। তারপরেও আপনি ভাবলেন, 'বাই চান্স যদি প্লেনটা পাই, যেহেতু এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছি, একটু চেষ্টা করি।' আপনি এয়ারপোর্টে ঢুকলেন এবং দেখলেন, লাস্ট কল! প্লেনটা লেট করেছে এবং আপনার জন্য এখনও অপেক্ষা করছে। আপনি দৌড়াদৌড়ি করে প্লেনে উঠে বসলেন। অনেক শান্তি নিয়ে ভাবলেন – 'যাক, মিস করিনি।'

প্লেনটি টেক-অফ করার পর আপনি উপর থেকে জ্যামটি দেখলেন, আপনি যেখানে আটকে ছিলেন। প্লেনটি সেই জ্যামের উপর দিয়ে যাচ্ছে। এখন আপনার মনের অবস্থা কেমন? জ্যামের মধ্যে থাকা আর বাইরে থেকে জ্যাম দেখা এ দু'টি অবস্থার পার্থক্য আপনি কি টের পাচ্ছেন?



যখন আপনি জ্যামের ভেতরে ছিলেন, তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন ছিল? আর এখন, প্লেন থেকে বাইরে থেকে সেই জ্যাম দেখার সময় আপনার মনের অবস্থা কেমন?

দুটো নিশ্চয়ই একরকম নয়। জ্যাম কিন্তু একই আছে। কিন্তু আপনি এখন সেই জ্যামের বাইরে। আপনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন। এটা আমাদের শেখায় 'বিচ্ছিন্নতার সূত্র' (Rule of Separation)

ঘটনার ভেতর থেকে নিজেকে মানসিকভাবে বের করে আনার সূত্র।

উদাহরণ : একজন সার্জন প্রতিদিন অনেক অপারেশন করেন। কিন্তু পারতপক্ষে তিনি নিজের সন্তানের কোন অপারেশন করেন না, করতে চান না। কেন জানেন? কারণ ওই মানুষটির সাথে তার আবেগ জড়িত। যখন আবেগ জড়িয়ে যায়, তখন আমরা কাজ ঠিকমতো করতে পারি না।

ঘটনার ভেতর থেকে নিজেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়। এটি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শেখা যায়। প্র্যাকটিস করার আগে জানতে হয় কীভাবে এটি করতে হয়।

ঘটনার বাইরে থেকে সেটিকে দেখা

যেকোনো ঘটনা, যেটি আপনার জীবনের সাথে ঘটে যাচ্ছে, সেটার সাথে আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলি। যদি কোনোভাবে সেই ঘটনা থেকে মানসিকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন, তখনই আপনি আসলে ম্যাজিকটা শিখে ফেলবেন।

এটাকে বলা হয়–নিজের শরীর, চিন্তা, এবং আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

প্রো-অ্যাকটিভ হওয়া: যখন আপনি এই বিচ্ছিন্নতার সূত্র রপ্ত করবেন, তখনই আপনি প্রো-অ্যাকটিভ হতে পারবেন। প্রো-অ্যাকটিভ হওয়া মানে যেকোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা করা এবং সে অনুযায়ী অ্যাকশন নেয়া।

আমি আসলে কে?

আপনি কি আপনার শরীর? যখন আমরা বলি, *'এই শরীরটা আমার'*, তখনই আমরা বুঝতে পারি, শরীরটা আসলে আমি নই। কারণ, 'আমার শরীর' মানে হচ্ছে–এই শরীরটা আমার, কিন্তু আমি নই।

শরীরের বেশির ভাগ অংশই আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যেমন, আপনি ইচ্ছা করলেই হার্টবিট বন্ধ করতে পারেন না।

তাহলে আমি কি আমার মন? আপনার মনকেও আপনি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যখন আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন মনের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

তাহলে আমি কে? আপনি আপনার শরীর নন। আপনি আপনার মনও নন। বরং আপনি এই দু'টিকে ব্যবহার করেন।

শরীর এবং মন এই দু'টি শক্তিশালী উপকরণকে বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আবেগের উপর ছেড়ে দিলে মন এবং শরীরই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন এটি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

আমরা শিখছি বিচ্ছিন্নতার সূত্র। নিজের শরীর এবং মনের বাইরে থেকে নিজের আবেগকে আলাদা করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারা – এই হলো বিচ্ছিন্নতার সূত্র। আশা করি, আমি আপনাদের এই সূত্রটি বোঝাতে পেরেছি। এখন আমরা আরও গভীরে যাব।

আমরা আমাদের নিজেদের কাজ এবং চিন্তা - অ্যাকশন এবং থিংকিং এই দুইটা জিনিসের ওপরে কন্ট্রোল রাখতে চাই। আপনি যদি জীবনের ভুল অঙ্ক করতে থাকেন পাতার পর পাতা ভুল হতেই থাকবে। অঙ্ক সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে যে শুদ্ধ হচ্ছে তা কিন্তু না। ভুল অংক-ও কিন্তু সামনে এগোতে পারে - এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু চেক দিতে হবে।

নেতিবাচক ইনপুট যদি আপনি দেন এবং নেতিবাচক পরিবেশে রাখেন

তাহলে এটার আউটপুটও নেগেটিভ আসবে। আপনার থেকে যা মানুষ পাবে - আপনি যা কিছু মানুষকে দেবেন সেটাও নেগেটিভ দিতে থাকবেন। আমরা যা ভাবি এবং করি তা কি আমরা চেক দিই? উত্তর হচ্ছে - বেশির ভাগ সময়ই 'না।'

এই চেক দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন থেকে যা কিছু ভাবব যা কিছু বাইরে থেকে ঢুকবে সেখানে একটা চেক দেবো যেন নেগেটিভ জিনিস না ঢুকে আমাদের মস্তিষ্কে। এই যে আমাদের ব্রেইন যেখানে চিন্তাভাবনার এ প্রসেসিংটা হচ্ছে যেখানে আমরা ইনফরমেশন স্টোর করছি সেখানে কিন্তু পরিবেশটা খুব ভালো রাখতে হবে - সেই জায়গাটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে সেই জায়গাটা যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে।

আমরা এবার দেখব কোন কোন জিনিস আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নেতিবাচকতা নাকি ইতিবাচকতা। আমরা নেতিবাচকভাবে চিন্তা করি অথবা ইতিবাচকভাবে চিন্তা করি। ইতিবাচকভাবে যখনই আমরা চিন্তা করব, তখন সেটার ফলাফল সবসময় ইতিবাচক হবে। আর নেতিবাচকভাবে চিন্তা করলে নেতিবাচক ফলাফলই আসবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি।

আপনি গত সপ্তাহে বাজার থেকে কিছু মাছ কিনে ফ্রিজে রেখেছিলেন। আজ সেই মাছটা আপনি খুব সুন্দর করে মসলা দিয়ে ম্যারিনেট করলেন। তারপর ওভেনে মাছ রান্না করলেন। রান্না করার পর যখন খেতে গেলেন, তখন দেখলেন খাবারটা খেতে পারছেন না–এত জঘন্য, এত বিচ্ছিরি লাগছে! আপনার মনে হচ্ছে, বমি হয়ে যাবে। কী ব্যাপার? কেন এমন হলো? চলুন একটু ভেবে দেখি। কেন এমন হতে পারে?



প্রথমত, যে মাছটি আপনি বাজার থেকে কিনে আনলেন, সেটি নষ্ট হতে গিয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, আপনি যে ফ্রিজে রেখেছিলেন, সেই ফ্রিজটি নষ্ট হতে পারে। তৃতীয়ত, আপনি যে ওভেনে দিলেন, সেই ওভেনটা ঠিকভাবে কাজ করছে না। অথবা, রান্নার প্রসেসে কোথাও ভুল ছিল।

এখন এই রান্নার উদাহরণটি আমরা আমাদের কথাবার্তা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মিলানোর চেষ্টা করি।

কীভাবে নেতিবাচক চিন্তা আমাদের ক্ষতি করে? আমরা যে চিন্তাগুলো আমাদের মাথায় ঢুকাই, সেগুলো যদি বাজার থেকে কিনে আনা মাছের মতো হয়, তাহলে কী হবে? যদি সেই চিন্তাগুলো নেতিবাচক হয়, তাহলে খাবার যেমন খারাপ হবে, তেমনই আমাদের মনের আউটপুটও নেগেটিভ হবে।

যদি আমরা নেগেটিভ চিন্তা বেশি করি, তার মানে হচ্ছে, আমরা আমাদের ব্রেইনে পচা বাজার ঢুকাচ্ছি। পচা জিনিস রাখতে রাখতে আমাদের চিন্তার প্রসেসও নষ্ট হবে। ভালো ইনপুট দিলেও আউটপুট নেগেটিভ হবে।

আর যদি ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যায়? যে পরিবেশে আমরা থাকি, সেই পরিবেশ যদি দূষিত হয়, তাহলে সেখানে ভালো জিনিসও খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই, খারাপ পরিবেশে পড়ে আমাদের চিন্তাভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

খারাপ চিন্তা আমাদের মনকে দূষিত করে, আমাদের পরিবেশ নষ্ট করে, আমাদের নিজের ক্ষতি করে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যও এতে খারাপ হয়।

নেতিবাচক চিন্তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথমেই, আমরা যা শুনি বা দেখি, সেগুলো ফিল্টার করব। কোন কথা মন থেকে গ্রহণ করার আগে আমরা ভাবব, *'এই কথাটা কি পজিটিভ, না নেগেটিভ?'* যদি নেগেটিভ হয়, আমরা সেটাকে গ্রহণই করব না।

ফ্রিজ এবং ওভেন ঠিক রাখতে হবে। আমাদের মন এবং পরিবেশকে ফ্রিজ এবং ওভেনের মতো মনে করি। এগুলো যদি আমরা পরিষ্কার রাখতে পারি, তাহলে খাবারটা অর্থাৎ আমাদের মনের আউটপুটও ভালো হবে।

চিন্তার দাস না হয়ে আমরা যদি চিন্তাকেই আমাদের দাস বানাতে পারি তবে আমাদের অভ্যাসের উপর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ আসতে শুরু করবে। আমরা যেন আমাদের অভ্যাসের দাস হয়ে না যাই।

সবসময় এটি সম্ভব না হলেও, বেশির ভাগ সময় এই নিয়ন্ত্রণটা আমাদের হাতেই থাকতে হবে। তাহলেই আমাদের চিন্তাভাবনা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

প্রো-অ্যাকটিভ বনাম রি-অ্যাকটিভ আচরণ

এখন আমরা প্রো-অ্যাকটিভ এবং রি-অ্যাকটিভ বিহেভিয়ার বিষয়ে কথা বলবো। মাইন্ডফুলনেস যে আমরা প্র্যাকটিস করছি, এই প্র্যাকটিস করার আসল যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে এই প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ারে নিজেকে নিয়ে যাওয়া এবং তাতে অভ্যস্ত করে তোলা।

রি-অ্যাকটিভ আচরণ - চলুন জেনে নেওয়া যাক এটি আসলে কী? প্রথমত, আমরা বাই ডিফল্ট ছোটবেলা থেকে শিখেছি সেটা হচ্ছে রি-অ্যাকশন দেখানো। যেকোনো ঘটনার আমরা সাথে সাথে একটা রি-অ্যাকশন দেখিয়ে ফেলি। যেমন কেউ একজন আমাকে একটা বকা দিল, কেউ একজন আমার সাথে একটু বাজে ব্যবহার করল। আমরা সাথে সাথে কী করি? সেটিকে বাড়িয়ে আরও বড় করে তাকে ফেরত দিই এবং আমরা মনে করি যে আমি জিতে গেলাম।

এটি কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবে করি। একজন রিকশাওয়ালা যদি আপনাকে একটা গালি দিয়ে বসে, আপনি কিন্তু তাকে চরম জবাব দেবেন। আর সে আপনাকে চড় মেরে বসলে, আপনি কী করবেন?

নিশ্চয়ই আর সেটি বলে বোঝাতে হবে না, আপনি মোটামুটি রেসলিং শুরু করে দেবেন, ঠিক? WWF দেখার জন্য আর স্পোর্টস চ্যানেল দরকার হবে না।

এই ব্যাপারটা আমরা কিন্তু সাধারণভাবে করি। এই যে আমরা করলাম, এই ব্যাপারটা এটাকে আমরা বলছি রি-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার। আমরা রি-অ্যাকশন দেখালাম।

স্ট্রেসটাকে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করার জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি, সেটি হচ্ছে প্রো-এ্যাক্টিভ বিহেভিয়ার। প্রো-অ্যাকটিভ বিহেভিয়ার কী রকম?

প্রো-অ্যাকটিভ আচরণ - প্রো-অ্যাকটিভ বিহেভিয়ার হচ্ছে আগে থেকে চিন্তা করে রাখা, আগে থেকে ভেবে রাখা যে, এই রকমের কোন সিচুয়েশন যদি আমার সাথে হয়, তখন আমি কী করব। যত আমরা মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করব, তত বেশি আমরা এই ব্যাপারটা করতে পারব।

আপনি একটু চেষ্টা করে দেখেন। খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা, যেটাতে আপনি রেগে যান। যেমন আপনার ওয়াইফ যদি এসে আপনার সাথে চিৎকার করে কথা বলে, তখন আপনি কী করেন? বা কেউ একজন আপনাকে যদি দোষারোপ করে- অফিসে বা বাসায় বা অন্য যেকোনো জায়গায়, তখন আপনি কী করেন? এটা আপনি একটু বসে ভাবেন।

এই যে ভাবার প্র্যাকটিসটা, এটাই হচ্ছে 'মাইন্ডফুলনেস'।

আমরা কোন একটা জিনিস না ভেবে সাথে সাথেই করব না, সাথে সাথে রি-অ্যাকশন দেখাব না। আমরা আগে থেকে সিচুয়েশন ভেবে রাখব যে, এরকমের যদি সিচুয়েশন আমার লাইফে হয়, তখন আমি কী করব।

এই জিনিসটা এবার আপনি ইমপ্লিমেন্ট করেন আপনার জীবনে, করে দেখেন কী হয়। কোন জ্ঞানই আসলে জ্ঞান না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা না হয়। এগুলো সব হচ্ছে তথ্য। তথ্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোন

কাজে লাগে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা আপনি নিজের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করবেন এবং একটা রেজাল্ট সেখান থেকে বের করে আনবেন।

তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোনটা প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার এবং কোনটা রি-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার। আমরা সাধারণত রি-অ্যাকশন দেখিয়ে থাকি। তৎক্ষণাৎ, আমরা কোনো কিছু না ভেবে একটা রি-অ্যাকশন দিয়ে ফেলি, প্রতিক্রিয়া দেখাই।

আর আমরা এখন যেটা করতে চাচ্ছি, আমাদের এই মাইন্ডফুলনেস দিয়ে, সেটা হচ্ছে প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার।

প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার মানে হচ্ছে আগে থেকে ভেবে রাখা সিচুয়েশন যে, এরকমের ঘটনায় আমি কী করব। সব সিচুয়েশন আবার যেগুলো আপনি আগে থেকে ভাবতে পারবেন না, সিচুয়েশনে পড়ে ভাবতে হবে, তবে ভাবতে আপনাকে হবেই, হঠাৎ একটা রি-অ্যাকশনে চলে যাওয়া কোন কাজের কথা না, যে কাজটা আমরা অহরহই করি।

ওকে, তো ওইটাও আগে থেকে ভেবে রাখেন যে, এমন কোন সিচুয়েশন যদি আমার লাইফে আসে, যেটা আমি আগে থেকে ভেবে রাখতে পারি নাই, তখন আমি কী করব? তখন ভাবার জন্য একটু সময় নেবেন।

ওই মুহূর্তে না ভেবে কখনো আমরা কিছু করব না। ওই মুহূর্তে চিন্তা মাথায় এনে, ভেবে, তারপরে একটা অ্যাকশন আমরা নেব।

রাগের মাথায় অ্যাকশন নেব না। রাগের মাথায় নেওয়া অ্যাকশন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুল অ্যাকশন হয়ে থাকে। বন্ধুরা, তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম প্রো-এ্যাকটিভ এবং রি-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার কাকে বলে।

এবার আমরা আমাদের নিজেদের জীবন থেকে একটি ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেখানে আমি নিজেকে রি-এ্যাকটিভ না করে অনেক বেশি প্রো-এ্যাকটিভ রেখেছিলাম এবং ফলাফল হাতে হাতে পেয়েছিলাম।

আবেগ বা ইমোশন

বন্ধুরা, ইমোশন মানুষের মনের অনেক বড় একটা জায়গা দখল করে থাকে। এই ইমোশন দিয়েই মানুষ আসলে পরিচালিত হয়। আপনি কাকে কতটুকু পছন্দ করেন বা কতটুকু ঘৃণা করেন এই ব্যাপারগুলো সবকিছু আপনার এই ইমোশন কন্ট্রোল করে থাকে। আমরা সাধারণত মনে করি যে ইমোশন আমাদের কন্ট্রোলে থাকে না, ইমোশনকে কন্ট্রোল করা যায় না। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, ইমোশনকে কন্ট্রোল করা যায়। আপনার ইমোশন বেশি নাকি কম সেটির থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, সময়মতো আপনি এই ইমোশনের লাগাম টেনে ধরতে পারেন কিনা।

ইমোশন নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা - অটোমেটিক্যালি এটা হবে না। এটা আসলে অনেক প্র্যাকটিসের একটি ব্যাপার। আপনি যখন সচেতন হবেন নিজের সম্পর্কে, আপনি যে রকম নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন, আপনার মন সম্পর্কে যখন আপনার সচেতনতা বাড়বে, তখন আপনি আপনার ইমোশনকে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং আপনার ইমোশন কীভাবে কাজ করে, এটা কীভাবে আসে এবং কীভাবে অপারেট করে এই জিনিসগুলো যত বেশি বুঝতে থাকবেন, তত বেশি আপনি এটার উপর কন্ট্রোল আনার চিন্তা করতে পারবেন।

চিন্তা এবং আবেগ দু'টি ভিন্ন প্রসেস - আপনার একটা চিন্তা হঠাৎ করে আসতে পারে। কিন্তু ইমোশন ব্যাপারটা অনেক গভীর। আপনি আপনার চিন্তা হঠাৎ করে বদলে ফেলতে পারেন, কিন্তু ইমোশনকে হঠাৎ করে বদলে ফেলতে পারেন না। আপনার কোনো একজন প্রিয় মানুষ যদি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলে, আপনি কিন্তু সেটা সহজে ভুলতে পারেন না। সেটি ঠিক করতে অনেক লম্বা একটা সময় এবং অনেক পরিশ্রম করার দরকার হয়।

বন্ধুরা, আবেগের উপর কন্ট্রোল আনতে পারা - এটি সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। আবেগ দুই রকমের হতে পারে–নেগেটিভ আবেগ হতে পারে অথবা পজিটিভ আবেগ হতে পারে। আবেগ নেগেটিভ হোক বা পজিটিভ, এটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন কিনা আপনি, সেটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার। আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ এর অর্থ হচ্ছে আপনার স্ট্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ। এই আবেগ থেকেই কিন্তু স্ট্রেসের উদ্ভব হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি, নেগেটিভ আবেগ দ্বারা আমাদের স্ট্রেসের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায়। আবেগকে যদি আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার স্ট্রেসকেও খুব সহজে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন।

তবে এটি অর্জন করা এত সহজ না। আগেই বলেছি, আমি আমার নিজের জীবনের একটা এক্সাম্পল এখানে আপনাদেরকে দেবো। এটি একটি চরম উদাহরণ extreme example এটি করতে গিয়ে আমাকে অনেক বছর প্র্যাকটিস করে যেতে হয়েছে। তারপরেও আমার অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই।

জীবন দিয়ে জীবন থেকে শেখা - আমি আমার জীবনের এই ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার তিনটি মেয়ে সন্তান। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি (সাবিহা মিরাজ ইউসরা - বয়স ৪ বছর ৪ মাস) আমার সবচেয়ে আবেগের একটা জায়গায় থাকে। সে অনেক বেশি কথা বলে আমার সাথে, অনেক বেশি কানেক্ট করে। আমার মনের সবচেয়ে কাছের, অনেক বেশি প্রিয় একটা মানুষ সে।

২০২১ সালের নভেম্বর। সে হঠাৎ করে একটু জ্বরে পড়ে। তো আমরা স্বাভাবিকভাবে বাচ্চাদের জ্বর হলে দুই-তিন দিন পর্যন্ত তেমন একটা কেয়ার করি না। আমরা জানি এটা অটোমেটিকলি ভালো হয়ে যাবে। আর সেটা একটা স্বাভাবিক ফ্লু'র একটা সিজন ছিল। তিন দিনের মাথায় আমি

আমার ফ্যামিলি ডাক্তারকে বললাম যখন এটা কমছে না। আমার ফ্যামিলি ডাক্তার বললেন যে, তাদের বাসায়ও চার পাঁচটা বাচ্চা এ রকম জ্বরে ভুগছে। এটা ফ্লু টাইপের জ্বর। ভাইরাল ফিভার। ঠিক হয়ে যাবে।

জ্বরের চতুর্থ দিন পার হওয়ার পর দেখা গেল, সে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং কিছু খেতে পারছে না। তো এরপর দিন আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। আমরা হসপিটালে নিয়ে গেলাম। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরপর অবস্থা খুব দ্রুত অবনতি হতে শুরু করল। ডাক্তার তাকে দেখার পর চোখ কপালে তুলে বললেন, *'এ তো shock - এ চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি আইসিইউতে নিতে হবে।'*

বন্ধুরা, ওই মুহূর্তে আমার মনে একটা আশঙ্কা হয়েছিল যে, এটা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে এবং চূড়ান্ত যে পরিণতি সেদিকে চলে যেতে পারে। এই কথাটা আমার মনে উদয় হলো যখনই ডাক্তার বললেন, *'মেয়েটা shock - এ চলে যাচ্ছে এবং তাকে আইসিইউতে নিতে হবে।'* ওই মুহূর্তে আমার নিজের মনের অবস্থাটা কী, সেটা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বলে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু একজন মাইন্ড ট্রেইনার হিসেবে আমি নিজেকে তখন বোঝালাম যে, আমার এটা একটা পরীক্ষা চলছে আমার নিজের সাথে। মুহূর্তে আমি নিজের ভেতর থেকে বের হয়ে, বাইরে থেকে সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করলাম। নিজেকে প্রস্তুত করলাম এটা বলে যে, এটা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে এবং এমনকি বাচ্চাটার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ওই মুহূর্তে আমি ওইটা ভাবতে পেরেছিলাম এবং সেই সিচুয়েশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পেরেছিলাম, মেয়েটির মা-কে এই পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টাও করতে পেরেছিলাম।

আশঙ্কা সত্যি হলো - সাবিহা মিরাজ ইউসরা আল্লাহর কাছে ফিরে গেল। চার বছর চার মাস বারো দিনে তার বয়স থেমে গেল। তার মৃত্যু সংবাদ যখন আমরা পেলাম তখন আমি নিজেকে পুরোপুরি কন্ট্রোলে রেখেছি। ওই মুহূর্তে চিন্তা করে দেখেন, আবেগের অবস্থাটা কী তখন। তখন ওই সাংঘাতিক রকমের আবেগের মুহূর্তে আমি হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত করতে পারতাম। স্ট্রোক পর্যন্ত করতে পারতাম। কিন্তু ওই মুহূর্তে আমি নিজেকে ওই সিচুয়েশন থেকে আলাদা রেখে নিজেকে শান্ত রাখতে পেরেছি। একদম শান্ত রাখতে পেরেছি। আমার যে বন্ধুরা সেদিন আমার কাছে ছিলেন তারা এ ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখেছেন।

আপনার কাছে এ ব্যাপারটা অনেক বেশি অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বন্ধুরা, এটা সম্ভব। এটা যে সম্ভব, সেটা আমি আমার নিজের জীবন থেকে উপলব্ধি করেছি। যে চলে যাওয়ার সে তো যাবেই। সত্যি সত্যিই চলে যাবে। আমরা যতই কান্নাকাটি করি না কেন, যতই আবেগ আপ্লুত হই না কেন, আমরা কিন্তু এটাকে থামাতে পারব না। যে জিনিসটা লেখা হয়ে গেছে, সেটা অবশ্যই হবে।

আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটার জন্য তৈরি থাকব - এইটা হলো গিয়ে বটম লাইন। এই ব্যাপারটা ভালো করে ধরে নেন যে, আমরা আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ট্রাই করব। সবচেয়ে ভালোভাবে চেষ্টা করব। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তটার জন্য, সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকব। আবেগকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

আশা করি আপনারা এই প্র্যাকটিসটা শুরু করতে পারবেন। আশা করি আমার জীবনের এই ঘটনাটা আপনাদের জীবনে সামান্য হলেও উপকার নিয়ে আসতে পারবে। পথটি মোটেও সহজ নয়, আগেই বলেছি। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে তো আর সব সহজ ঘটনা বেছে বেছে হয় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বললাম তা থেকেই বুঝতে পারলাম, স্ট্রেস ম্যানেজ করার একটি অব্যর্থ 'টুল' হচ্ছে 'মাইন্ডফুলনেস' যা দিয়ে আপনি নিজের সাথে সংযোগ, প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার এবং নিজের ইমোশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবেন।

মাইন্ডফুল ব্রিদিং - কীভাবে এই মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা যায়? আমরা একটা কাজ করতে পারি। একটি নির্জন জায়গায় বসব, যেখানে কেউ আমাদেরকে ডিস্টার্ব করবে না। তারপর আমরা চোখ বন্ধ করব। চোখ বন্ধ করে শ্বাস নেব, দম নেব এবং দম ছাড়ব। দম নেব এবং দম ছাড়ব। আমাদের মনোযোগ এই দমের দিকে থাকবে। এই দমের দিকে আমরা মন দেবো, মনে মনে বলব, 'আমি জানি যে আমি দম নিলাম, আমি জানি যে আমি দম ছাড়লাম।'

বডি স্ক্যান মেডিটেশন - এরপর আমরা আমাদের শরীরের ভেতরে কী কী ঘটনা ঘটছে–এই যে হার্ট বিট করছে, এই যে রক্ত চলাচল করছে–এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব। কীভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে, মনোযোগটা সেদিকে দেবো। তার মানে, এই কাজটা যখন করব, তখন কিন্তু আশপাশের বাইরের জিনিসগুলো থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ভেতরে মনোযোগ দিতে পারব। এই জিনিসটাকে আমরা বলছি মাইন্ডফুলনেস এর প্র্যাকটিস।

প্রতিদিন যদি আপনি পাঁচ মিনিট এটা করতে পারেন, আপনি দু-এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখবেন যে, আপনি অনেক ভালোভাবে নিজের সাথে কানেক্ট করতে পারছেন, নিজের সম্পর্কে ভাবতে পারছেন। আমরা কিন্তু সাধারণত নিজের সম্পর্কে ভাবি না।

তারপর আমরা আমাদের মনের ভেতরে তাকাব - *'আমার মনে এখন কী চলছে? আমি এখন কী ভাবছি'?* যখনই আপনি ভাববেন, তখন সচেতনতা প্র্যাকটিস হবে। আমরা কিন্তু সারাদিন ভাবি। আমাদের মনে

৯০-৯৫ হাজার চিন্তা ঢুকে আর বের হয়। কিন্তু আমরা সচেতন নই যে, কী কী ঢুকছে কী কী বের হচ্ছে, কী কী নিয়ে আমরা ভাবছি।

এই প্র্যাকটিসটাতে আমরা যে কাজটা করব, সচেতনতা টাকে নিয়ে আসব। এই পাঁচ মিনিট, আমি কী কী ভাবলাম? কী কী জিনিস আমার মাথায় আসলো? কী কী জিনিস আমার মাথা থেকে বের হলো? এই ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা দেখব। *'আমার মনের ভেতরে কী চলছে? অন্য মানুষ সম্পর্কে আমি কেমন চিন্তা করছি?'*

এই চিন্তাগুলো বাইরে থেকে দেখব, ভেতর থেকে না - নিজের ভেতর থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে জিনিসটাকে দেখব। কবিগুরুর ভাষায় - *'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া; বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।'* আপনি খেয়াল করেন, আপনার কাছে অন্য কেউ যখন কোন পরামর্শের জন্য আসে, আপনি খুব সহজে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে যখন কোন ডিসিশন নিতে হয়, আপনি কিন্তু কনফিউজড হয়ে যান। কারণ, আপনি অন্যকে যখন পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন বাইরে থেকে জিনিসটা দেখছেন।

একই রকম ভাবে, আপনি যখন পাজ্‌লড হয়ে যান যে, 'এখন কী করবেন?' তখন কিন্তু আরেকজনের কাছে যান। কারণ, সে আপনার ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখতে পারে।

এই কাজটা ঠিকমতো করার জন্য আমাদের আরও কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে। তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে, 'একবারে একটা জিনিস করা।'

শুধু কাজ করা নয়, সেটিকে উপভোগ করা - একবারে একটা জিনিস করা - আপনি শেষবার কবে আপনার 'স্নান করা'টা উপভোগ করেছেন? প্রতিদিন আমরা স্নান করি, কিন্তু এটাকে উপভোগ করি কি?

ঐ সময় মন কোথায় থাকে? আমরা ভাবতে থাকি অফিসের গাড়ি মিস করব কিনা, অফিসে গিয়ে কী কী করব ইত্যাদি। আমাদের ব্রেইন কিন্তু বর্তমানে থাকে না। সে মাল্টিটাস্কিং মুডে থাকে। অনেকগুলো কাজ একসাথে ভাবতে থাকে। এটি আমাদের মাইন্ডফুলনেসের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমাদের যে কাজটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে, যখন একটা কাজ শুরু করব, তখন ওই কাজটাতেই মনোযোগটা রাখবো। হ্যাঁ, আমাদের মাইন্ডে অনেক জিনিস চলে আসতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা কনসাশলি, সচেতনভাবে সেই জিনিসগুলো সরিয়ে রাখবো। অন্য কোন কাজ এই মুহূর্তে চিন্তা না করতে চেষ্টা করব। এটি অটোমেটিকলি হবে না। এটি আপনাকে একটু চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আগামী ১৫ মিনিট আমি যে কাজটি করছি, আমি চেষ্টা করব সবসময় এই কাজটিতে মনোযোগ রাখতে।

এটি হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস আনার, মাইন্ডফুলনেস বাড়ানোর একটি পূর্বশর্ত। 'একবারে একটা জিনিস করা।'

তাহলে আমরা যখন এই ব্যাপারটাতে সচেতন হব, তখন এই সম্পর্কিত কিছু লেখাপড়াও করব। আমি আপনাদেরকে একটা বইয়ের নাম দিচ্ছি। এই বইটি হচ্ছে 'Things you can see only when you slow down' আমাদের কাজগুলোতে যখন আমরা একটু স্লো হয়ে যাব, তখন আমরা অনেক জিনিস দেখতে পাব যেগুলো আমরা আগে দেখতাম না, আগে খেয়াল করতাম না। সচেতন হলে, আপনি অনেক জিনিস দেখতে পাবেন। আপনি নিজের মনের ভেতরে ডুব দিতে পারবেন। আপনি নিজের সম্পর্কে জানতে পারবেন। অপরের সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

আপনি আপনার জীবনের পরিস্থিতি কখনো বদলাতে পারবেন না। যেই ঘটনা আপনার সাথে হওয়ার, সেটি অবশ্যই হবে, নিশ্চয়ই হবে। আপনি ঘটনা বদলাতে পারবেন না। আপনি যেটি বদলাতে পারবেন, সেটি হচ্ছে, ঘটনা সম্পর্কে আপনার আচরণ। ঘটনা সম্পর্কে আপনার ভাবনা।

আপনার মাইন্ডফুলনেস দিয়ে সেই কাজটা করতে পারবেন। পরিস্থিতি যত জটিল হবে, মাথা ততো ঠান্ডা হবে।

আবার বলছি, ভালো করে শুনেন। পরিস্থিতি যত জটিল হবে, মাথা ততো-ই ঠান্ডা হবে।

এ রকম একটি মানসিক অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চাই। বন্ধুরা, আপনি যখন স্লো হয়ে যাবেন, তখন আপনার কাছে অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনি যখন মাইন্ডফুলনেস নিয়ে আসবেন, প্রত্যেকটা জিনিসকে বাইরে থেকে ভাবতে পারবেন, বাইরে থেকে দেখতে পারবেন, তখন আপনার জন্য পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বললাম তা থেকে বুঝতে পারছি যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করে পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া সম্ভব।

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের অবিশ্বাস্য গল্প

এই পর্ব শেষ করছি আমার খুব প্রিয় একজন মানুষের গল্প বলে, যিনি আমার জীবনে সাংঘাতিক রকমের পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো দেখি নাই, দেখার কোন সম্ভাবনাও নাই। কারণ, আমার এই অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগেই তিনি পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। সম্ভবত, আমি আমার জীবনের যে ঘটনাটি বললাম, আমি যেভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি সেটি আমি করতে পারতাম না যদি এই গল্প আমি না জানতাম।

চলুন দেখি আমার এই ট্রেইনারের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই। ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল, যিনি একজন ডাক্তার এবং সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন, হিটলারের

নাৎসি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প মানে ভয়াবহ এক জায়গা, যেখানে আসলে মেরে ফেলার জন্যই নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখানে প্রচণ্ড রকমের অত্যাচার করা হতো। এমন এমন অত্যাচার করা হতো যেটি আমরা চিন্তাই করতে পারি না, যা আমাদের কল্পনার অনেক বাইরে।

সেখানে অকারণে মানুষকে বিভিন্ন রকমের অত্যাচার করা হতো, তাদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত বের করা হতো, ভয়ংকর ঠাণ্ডার মধ্যে তাদেরকে উলঙ্গ করে একটি রুমে সারাদিন ধরে রেখে দেওয়া হতো। ওখানে আসলে বেঁচে থাকাটাই ছিল ভয়ানক কষ্টের এবং ভয়ের ব্যাপার।

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল, প্রথম দিকে খুব ভয় পেয়ে গেলেন, যা স্বাভাবিক। কিন্তু এরপর তিনি যখন কনফার্ম হলেন, বুঝতে পারলেন যে জীবনের শেষ সময়গুলো এখন তিনি কাটাচ্ছেন - তখন তিনি একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এখন অস্থিরতা করে কোন লাভ নেই। এখানে যতই দুশ্চিন্তা করি না কেন, যাই করি না কেন, মৃত্যু থেকে বাঁচা সম্ভব না। তিনি শান্ত হয়ে গেলেন এবং পুরো ব্যাপারটিকে বাইরে থেকে দেখার চেষ্টা করলেন।

তিনি সবাইকে অবজার্ভ করতে শুরু করলেন। প্রত্যেকটি বন্দী এবং গার্ড যারা সেখানে ছিল, তাদের আচরণ নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন এবং যখন যেখানে পারতেন, তিনি লিখে রাখতেন।

তিনি খেয়াল করলেন, যে মানুষগুলো ভয় কম পায় বা রি-অ্যাকশন কম দেখায়, তাদেরকে গার্ডরা কম অত্যাচার করে। কারণ, যদি রি-অ্যাকশন না পাওয়া যায়, তাহলে অত্যাচার করে আসলে মজা নেই। তিনি কী করলেন? নিজেকে আস্তে আস্তে এমনভাবে মোটিভেট করলেন যে, তাকে অত্যাচার করা হলে তিনি মুখ বুঁজে সহ্য করতেন, কিন্তু রি-অ্যাকশন দেখাতেন না। চুপচাপ থাকতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার না করে থাকা

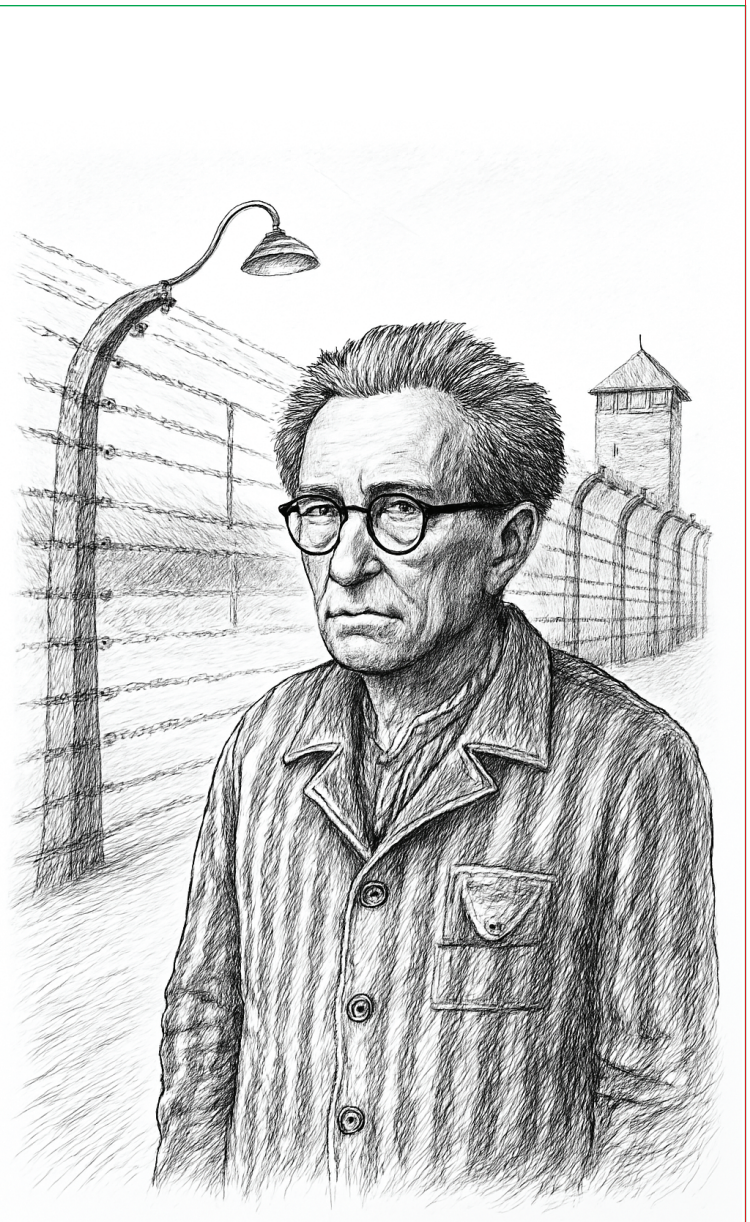

যায়, ততক্ষণ চিৎকার করতেন না। এইভাবে তিনি খেয়াল করলেন যে আস্তে আস্তে তার ওপর অত্যাচারের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে।

এই ঘটনা বুঝতে পারার পর তিনি আশপাশের বন্দীদের সাথে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে শুরু করলেন। তাদের এই টেকনিক শেখালেন – কীভাবে ভয় না পেলে অত্যাচারের পরিমাণ কমে যায়। কিছু বন্দী তার সেই কথা শুনল এবং তারা ভয়কে জয় করতে শুরু করল।

স্বাভাবিকভাবেই, যেটি হওয়ার কথা ছিল - সেটিই হলো, তাদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ কমে গেল। ধীরে ধীরে তার দল ভারী হতে শুরু করল। তার ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তিনি একটা বই লিখার সংকল্প করলেন। সেই বই তিনি ইউনিভার্সিটিতে পড়াবেন - স্বপ্ন দেখলেন। তিনি তার বই লেখার জন্য উপাদান জোগাড় করতে শুরু করলেন।

ওই ক্যাম্পের গার্ডরা খেয়াল করল যে কিছু বন্দী সে রকম ভয় আর পাচ্ছে না। তারা গোয়েন্দা লাগাল এবং বুঝতে পারল যে এরা ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের ছাত্র। তখন তারা ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলকে ডেকে নিল। তাকে জিজ্ঞেস করল, *'তুমি এমন কী কথা বলো যাতে করে এই মানুষগুলো ভয় পাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, মৃত্যুভয় থেকে উঠে আসছে? তুমি কী বলো তাদেরকে'?*

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল তাদের সাথেও তার এই কথাগুলো শেয়ার করলেন। বললেন, *'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তোমরা কী করবে?''*এই সৈন্যগুলোর মাথায় এই প্রশ্নটা ছিল না। তারা কখনো ভাবতে পারেনি যে যুদ্ধ কখনো শেষ হবে। তারা খুবই ডিমোটিভেটেড ছিল এবং মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় ছিল। তখন তারা ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলকে তাদের টিচার হিসেবে মেনে নিল এবং তার থেকে লেসন নিতে শুরু করল।

এভাবে আস্তে আস্তে, তারা অত্যাচারের পরিমাণ কমিয়ে দিল। তারা তাদের মনে একটি স্বপ্ন তৈরি করল। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল তাদের মনে একটি স্বপ্ন বুনে দিলেন। *'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তোমরা*

কী করবে? তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। কে কী করতে চাও বেঁচে থাকার জন্য'? এইরকম একটি স্বপ্ন তাদের মনে বুনে দিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে, এই স্বপ্ন তাদের মধ্যে জাগ্রত করলেন।

ওপরের দিকের কর্মকর্তারা ওই ক্যাম্পের গার্ডদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন দেখতে পেলেন। তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল নামের একজন ডাক্তার তাদেরকে ট্রেইন করছেন। তখন তারা ফ্র্যাঙ্কলকে বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠাতে লাগলেন তাদের সৈন্যদের মনোবল পুনরুদ্ধার করার জন্য।

এই ঘটনার মাত্র দেড় বছরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়েই তিনি তার বইটি লিখলেন। যে বইটির কথা আমি আপনাদের বলছি তার নাম হচ্ছে 'ম্যান'স সার্চ ফর মিনিং।' আমরা আপনাদের বলব যে, ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের জীবন এবং সেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সময়টিকে যদি আপনি উপলব্ধি করতে চান, তাহলে এই বইটি পড়ে নিতে পারেন। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল তার স্বপ্ন অনুযায়ী সেই বইটি লিখে শেষ করেছিলেন এবং সেই বইটি ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছিলেন।

এই গল্পটি থেকে আমরা কী শিখতে পারি? এটিতে একটি সাংঘাতিক লার্নিং আছে। এর প্রধান লার্নিং হলো যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনি চাইলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন। আমি নিজে যখন বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ি, তখন আমি নিজের বর্তমান পরিস্থিতিকে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের সেই সময়ের সাথে তুলনা করি।

বিশ্বাস করেন, আমার সমস্ত উদ্বেগ এবং স্ট্রেস মুহূর্তের মধ্যে চলে যায়। কারণ, আমি তখন নিজেকে বলি, *'আমি তো ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের মতো অবস্থায় নেই। আমি তো অনেক ভালো অবস্থায় আছি। আমি তো বন্দী অবস্থায় নেই। আমার সামনে তো তাৎক্ষণিক মৃত্যুভয় কাজ করছে না'।*

তাহলে, আমার হাতে অনেক সুযোগ আছে। সেই সুযোগগুলো আমি কাজে লাগাতে পারি।

আশা করি, এই গল্প আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আপনাদের জীবনে কাজে লাগবে। ভালো থাকবেন। অ্যাকশন প্ল্যানিং দিচ্ছি।

মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করার জন্য দারুণ একটি জিনিস।

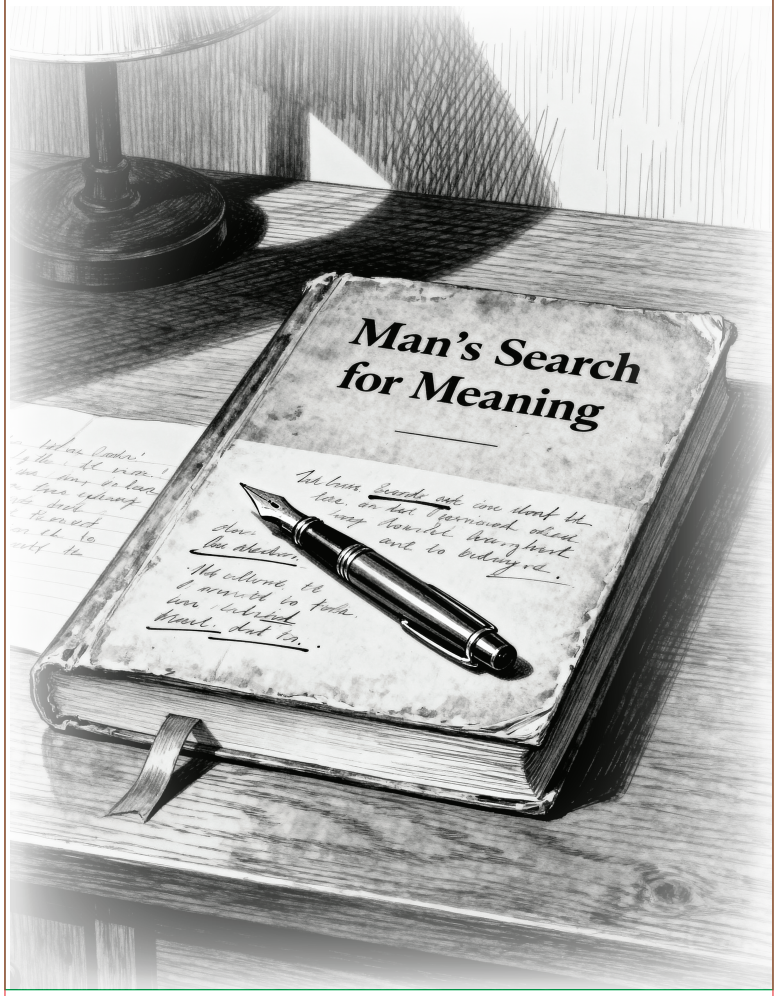

অ্যাকশন প্ল্যানিং

মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিসের সামারি

১ম দিন : মাইন্ডফুল ব্রিদিং

প্রথম দিন আপনার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার অনুশীলন করুন। নাক দিয়ে ধীরে শ্বাস নিন এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়-ন। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় মনোযোগ দিন। এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং বর্তমানে মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

২য় দিন : ধীরগতিতে হাঁটা (Walking Meditation)

একটি শান্ত পরিবেশে ধীরে ধীরে হাঁটুন এবং প্রতিটি পদক্ষেপের অনুভূতিতে মনোযোগ দিন। পায়ের মাটি স্পর্শ করা, শরীরের ভারসাম্য এবং আশেপাশের পরিবেশকে উপলব্ধি করুন। এটি আপনাকে বর্তমান মুহূর্তে টেনে আনবে এবং স্ট্রেস কমাবে।

৩য় দিন : বডি স্ক্যান

শরীরের প্রতিটি অংশের দিকে মনোযোগ দিন। শুয়ে বা বসে ধীরে ধীরে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অংশ অনুভব করুন। শরীরের কোথাও কোনো চাপ বা অস্বস্তি অনুভূত হলে সেটিকে মেনে নিন। এটি শরীর এবং মনের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে।

৪র্থ দিন : ৫ মিনিট জার্নালিং

একটি নোটবুকে ৫ মিনিট ধরে লিখুন আপনার অনুভূতিগুলো। কী ভালো লেগেছে, কী খারাপ লেগেছে, এবং আজকের দিনটি কেমন গেল তা সংক্ষেপে লিখুন। এটি মানসিক চাপ হালকা করতে এবং নিজেকে বোঝার সুযোগ দেয়।

৫ম দিন : "থ্যাংকফুলনেস" প্র্যাকটিস

তিনটি জিনিস লিখুন যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। এটি হতে পারে মানুষ, ঘটনা, বা কোনো অভিজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসিক শান্তি বাড়ায় এবং ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে।

৬ষ্ঠ দিন : ধ্যান এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন

একটি নিরিবিলি স্থানে বসুন এবং ধ্যান করুন। নিজেকে এমন একটি শান্তিপূর্ণ জায়গায় কল্পনা করুন যা আপনাকে স্বস্তি দেয়। এটি আপনার মনকে শান্ত এবং ফোকাস্ড রাখতে সাহায্য করবে।

৭ম দিন : নীরবতা পালন

৩০ মিনিটের জন্য সমস্ত প্রযুক্তি (ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার) এবং কথা বলা বন্ধ রাখুন। নিজেকে একটি নিরিবিলি পরিবেশে রাখুন এবং নিজের চিন্তা, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শরীরের অনুভূতিগুলো অনুভব করুন। এটি মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করে এবং আত্মোপলব্ধির জন্য সময় দেয়।

নোট –

সময় ব্যবস্থাপনা

সময় আসলে হচ্ছে জীবন। এই যে সময় কেটে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। টাকা আপনি জীবনে কামাতে পারবেন। টাকা হারিয়ে গেলে আবার কামাতে পারবেন। কিন্তু সময়? সময় কামাতে পারবেন না। আজকের যে মুহূর্তটি চলে যাচ্ছে, এই মুহূর্ত কখনোই আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না।



কেন সময় ব্যবস্থাপনা জানা দরকার?

বন্ধুরা, সময় এটি অনেক বড় একটি স্ট্রেসের কারণ হতে পারে আমাদের জীবনে। আমরা সবাই একই পরিমাণ সময় পাই। রাস্তার একজন ভিক্ষুক যে পরিমাণ সময় পান, বিল গেটস বা ইলন মাস্ক-ও একই পরিমাণ সময় পান। পৃথিবীর যেকোনো প্রেসিডেন্ট বা রাজা বাদশা একই পরিমাণ সময় পান।

তাহলে কেন কেউ ফকির আর কেউ রাজা? অন্যান্য অনেকগুলো ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে, কিন্তু সময় একটি অনেক বড় ফ্যাক্টর। আমরা সবাই ২৪ ঘণ্টা সময় পাই–একদম সেইম। কিন্তু এই সময়টিকে কেউ কেউ অনেক ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন, কেউ কেউ কাজে লাগাতে পারেন না। কেউ কেউ এই সময়ের ব্যবহারের যে সূত্র, সেগুলো ঠিকমতো জানেন, এবং কেউ বা জানেন না। আবার কেউ আছেন যারা জানার পরেও পালন করেন না। আজকের এই যে সময়টি আমরা পেয়েছি, এটি যদি ঠিকমতো কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে পরবর্তীতে গিয়ে এই সময়টি আমাদেরকে অনেক বেশি স্ট্রেস দিতে পারে।

এই পর্বে আমরা সময় ব্যবস্থাপনা, টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব।

সময়কে আমরা টাকার সাথে কিছুটা তুলনা করতে পারি - আপনি শুনে থাকবেন 'টাইম ইজ মানি' - সময়ই অর্থ কিন্তু টাকা দিয়ে সময় কেনা যায় না। সময় আসলে হচ্ছে জীবন। এই যে সময় কেটে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। টাকা আপনি জীবনে কামাতে পারবেন। টাকা হারিয়ে গেলে আবার কামাতে পারবেন। কিন্তু সময়? সময় কামাতে পারবেন না। আজকের যে মুহূর্তটি চলে যাচ্ছে, এই মুহূর্ত কখনোই আমাদের জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না।

টাকার সাথে সময়ের একধরনের মিল আছে। টাকা যেমন আমরা ইনভেস্ট করতে পারি, খরচ করতে পারি আবার অপচয়ও করতে পারি।

একই রকম ভাবে, আমাদের যে সময়টি আছে, সেটি আমরা চাইলে অপচয় করতে পারি। সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে শেষ করতে পারি বা সারাদিন ফেসবুক স্ক্রলিং করে করে শেষ করে দিতে পারি। আবার আমরা আমাদের সময়কে বিনিয়োগ বা ইনভেস্ট করতে পারি। ইনভেস্ট আমরা কীভাবে করতে পারি? যেমন, নতুন কোন একটা স্কিল আমরা যদি শিখি, সেটি আমাদের পরে কাজে লাগবে। তাহলে এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট। সময়ের ইনভেস্টমেন্ট। আমাদের নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বইগুলি আছে সেগুলো যদি আমরা পড়তে পারি, নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজে লাগাতে পারি, সেটা হবে আমাদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট।

এই যে আপনি এই বইটি পড়ছেন, এতে আপনার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। স্ট্রেস সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কার হচ্ছে। এই জিনিসটি ভবিষ্যতে আপনাকে স্ট্রেস ম্যানেজ করতে সাহায্য করবে। তো এটা কী? এই যে সময়টা আমরা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ।

সময় আমরা ব্যবহার করি - সময়ের ব্যবহার মানে প্রতিদিনের যে রুটিন কাজগুলো আছে, যেগুলো আমাদেরকে করতেই হয়। আমাদেরকে খাওয়াদাওয়া করতে হয়, ওয়াশরুমে যেতে হয়, আমাদেরকে গোসল করতে হয়। প্রতিদিনের যে কাজগুলো আপনাকে করতেই হবে, সেটি হচ্ছে আপনার সময়ের ব্যবহার।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই সময়কে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে সময়কে ব্যবহার করা। আরেকটি হচ্ছে সময়কে ইনভেস্ট করা ভবিষ্যতের জন্য। আরেকটি হচ্ছে সময়কে অপচয় করা। তাহলে এইটুকু ক্লিয়ার হলো। আসেন দেখি আমরা একটু জেনে নেব যে কীভাবে আমরা এই সময়ের অপচয় বন্ধ করতে পারি।

যেভাবে আমরা আসলে সময়ের অপচয় করি - আমরা মাল্টিটাস্কিং করতে গিয়ে সময় নষ্ট করি। অনেকগুলো কাজ যখন আমরা একসাথে নিয়ে ফেলি এবং সবগুলো একসাথে করতে চেষ্টা করি, তখন আসলে কোন কাজই ঠিকমতো হয় না। তখন সবগুলো কাজই আসলে নষ্ট হয়। আবার প্রত্যেকটা কাজ শুরু থেকে ধরে করতে হয়, কাজও সুন্দর মতো হয় না। সময়টিও নষ্ট হয়ে যায়।

এভাবে করে আমরা সময়ের অপচয় করি। আপনার কোনো একজন ফ্রেন্ড এসে আপনাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চাচ্ছে। আপনি কাজটি করতে চাচ্ছেন না। আপনার এর থেকে জরুরি কাজ পড়ে আছে। কিন্তু আপনি তাকে 'না' বলতে পারছেন না। আপনি ভাবছেন যে এই 'না' বললে আমার বন্ধুটা মনে কষ্ট পেতে পারে। তাহলে এই 'না' বলতে না পারার কারণে কিন্তু আমরা সময় অপচয় করি। আমরা একটি কাজ এমনভাবে করলাম যেটি আমরা এনজয় করলাম না। তাহলে ওই কাজটি থেকে আমি কিছু শিখতেও পারলাম না এবং আমার সময়টাও অপচয় হলো।

আমরা অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে আসি। অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে এসে আমরা মনে করি যে আমরা অনেক বেশি কাজ করে ফেলছি। আসলে কিন্তু কাজটা তখন ঠিকমতো হয় না। অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে আসা মানে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট এফিশিয়েন্ট না। অফিসের টাইমের মধ্যে আপনি কাজটি শেষ করতে পারছেন না। অথবা কেউ আপনাকে অনেক বেশি কাজ চাপিয়ে দিয়েছে অফিসে যেটা আপনি তাকে 'না' বলতে পারেন নাই। এভাবে করেও আমরা ফ্যামিলিকে যে টাইমটা দিতে হতো সেই টাইমটা কিন্তু অপচয় করে ফেললাম। তাদের সাথে যে কমিউনিকেশনটা তৈরি হতো, সেটিও আমরা নষ্ট করে ফেললাম।

সোশ্যাল মিডিয়া - সবচেয়ে বেশি সময় আমরা অপচয় করি অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করে। এটি আমাদের আজকাল অনেক বেশি

সময় নষ্ট করে ফেলছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে আপনার কতক্ষণ সময় থাকা উচিত? সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আপনি আছেন, আপনি কি আসলে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন, নাকি সোশ্যাল মিডিয়া যারা তৈরি করেছে, তারা আপনাকে ব্যবহার করছে? এই ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এই প্রশ্নটি যদি আপনি নিজেকে করেন এবং একটা টাইম সেট করেন যে, কতক্ষণ আমার এই জিনিসটা দেখা উচিত, বাকি সময়টা আমি কী করতে পারি? বাকি সময় কি আমরা ইনভেস্ট করতে পারি যাতে পরে গিয়ে আমার উপকার হয়? কিছু কিছু মানুষ এ রকম পাবেন, যারা সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকে এবং তারা আসলেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। তার মানে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তারা ইনকাম করে অথবা কিছু নতুন জিনিস শিখে, যে জিনিসটা তার জীবনে কাজে লাগবে - এবং আসলেই কাজে লাগায়। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ মানুষই সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু ব্যবহার করে না - বরং সোশ্যাল মিডিয়া তাদেরকে ব্যবহার করে। তাদেরকে এ্যাড দেখায়, তাদের কাছে জিনিস বিক্রি করে এবং তারা সারাদিন শুয়ে-বসে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এবং নিজেদের সময় অপচয় করে। আপনি কোন দলে? এটা আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন। তাহলে এতটুকুতে আমরা জানতে পারলাম যে কীভাবে সময়কে টাকার মত করে ব্যবহার করা যায়।

দীর্ঘসূত্রিতায় পড়া - আরেকভাবে আমরা অনেক বেশি সময় নষ্ট করি, সেটা হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতা। দীর্ঘসূত্রিতা মানে হলো যে আমি কোন একটা কাজ অনেক দিন ধরে করব করব বলে ফেলে রেখেছি। যেমন, আমি এক্সারসাইজ শুরু করব। এটি আপনি কতদিন ধরে প্ল্যান করছেন বলেন তো? আপনি যদি বসে একটু চিন্তা করেন, দেখবেন যে আপনি হয়তো ২০ বছর, ২৫ বছর ধরে শুধু প্ল্যানই করে যাচ্ছেন।

কিন্তু এটি শুরু করতে পারছেন না এবং তার জন্য আপনার মনে একটি অপরাধবোধ কাজ করছে, যেটি আপনাকে আরও বেশি নন-প্রোডাক্টিভ, আরও কম প্রোডাক্টিভ করে তুলছে। তো এই ধরনের জিনিস কী কী আছে, সেগুলো আপনি লিখে ফেলবেন।

কীভাবে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হয়?

যেমন, আপনি এক্সারসাইজ করতে পারছেন না অনেক দিন ধরে। তাহলে আপনি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করবেন, যেটি দেখলে আপনার এক্সারসাইজ করার ইচ্ছা হবে। আপনি আগের দিন রাতে প্ল্যান করে রাখবেন যে সকালে উঠে আমি সবার প্রথমেই এক্সারসাইজটা করে ফেলব। 'Bang the nasty job first' এ রকম একটি রুল আছে। ব্রায়ান ট্রেসির একটি বই আছে 'Eat That Frog' যে কুৎসিত ব্যাঙটা আপনার খাওয়ার কথা - প্রতিদিন খাবেন খাবেন করে খেতে পারছেন না, সকালে উঠে সবার আগে সেই কাজটি শেষ করে ফেলুন। আমরা আশা করছি, আপনারা বইটি সংগ্রহ করবেন এবং পড়ে নেবেন। সেখানে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করার অনেকগুলো উপায় খুব সুন্দর করে লেখা আছে।

কোন জিনিসটা আপনাকে ট্রিগার করে - সেই কাজটি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, আপনার কোনো একজন ফ্রেন্ড আছে যার সাথে আপনার হাঁটতে ভালো লাগে। তাহলে আপনার ওই কাজটার সঙ্গে আপনার ফ্রেন্ডকে যুক্ত করতে পারেন। যেমন, আপনি দৌড়ানোর জন্য যে জুতাগুলা আছে, রানিং সু, সেগুলো আপনার বিছানার নিচে রেখে দিতে পারেন। যাতে আপনি বিছানা থেকে নামলেই প্রথমে সেই জুতার উপর পা পড়বে। তাই না? সব রেডি করে রাখুন, পরিবেশ রেডি করে রাখুন। যাতে আপনি সহজে কাজটিতে নেমে পড়তে পারেন।

যেমন, আমি কন্টেন্ট রেকর্ড করি, বিভিন্ন কোর্স এবং ওয়ার্কশপ বানাচ্ছি। আমি ফিল করি যে যদি এ রকম সবকিছু সাজানো থাকে, ক্যামেরাটা যদি আমাকে সেট করতে না হয় প্রত্যেকবার বা মাইক্রোফোনটা যদি সেট করতে না হয়, সব যদি ঠিকঠাক সাজানো অবস্থায় থাকে, আমি যখন-তখন জাস্ট এখানে বসে স্টুডিওর মত করে শুরু করে দিতে পারব। তো এই ব্যাপারগুলো আপনি খেয়াল করুন। খুঁজে বের করুন যে - কোন ব্যাপারগুলো আপনাকে ট্রিগার করে। কীভাবে করে পরিবেশটা তৈরি করলে সহজে আপনি কাজটি শুরু করে দিতে পারবেন। শুরু করে দিলে কিন্তু শেষও করতে পারবেন।

The secret of getting ahead is getting started

এগিয়ে যাওয়ার সিক্রেট হচ্ছে কাজ শুরু করে দেওয়া। শুরু করে দিতে হবে। এই কাজটা যদি অনেক বড় কাজ হয়, তাহলে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলুন। একসাথে সবগুলো কাজ করতে যাবেন না। টায়ার্ড হয়ে যাবেন। কাজগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করে ফেলুন। ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলুন এবং এক দিনে একটা কাজ বা এক দিনে অর্ধেক কাজ। অল্প হোক, কিন্তু তবুও হোক। একটু একটুখানি কাজ যেন প্রতিদিন হয়। সেই জিনিসটা আমাদেরকে পাহারা দিতে হবে।

এভাবে আমরা দীর্ঘসূত্রিতা, এই যে লম্বা সময় ধরে এটাকে আটকে থাকা এবং ক্রমাগত কাজকে পেছনের দিকে ঠেলতে থাকা, এটাকে 'প্রোক্রাস্টিনেশন' বলে, এটি থেকে বের হয়ে আসতে পারি। এত বেশি কাজ কীভাবে একসাথে শেষ করব, এই চিন্তা আমাদেরকে এই কাজ করা থেকে পেছনে ঠেলে দিতে থাকে। আপনি অল্প অল্প করে টাইম নিন।

৩০ মিনিটের বেশি একসাথে বসে কাজ না করা

যখনই ৩০ মিনিট কাজ শেষ হবে, আপনি ৫ মিনিটের জন্য একটা ব্রেক নিয়ে নিন। যখনই আপনি আজকের যে কাজটুকু শেষ করে ফেলতে পারবেন, নিজেকে একটা গিফ্‌ট দিন। নিজেকে পুরস্কৃত করুন।

আপনি নিজে গিয়ে একটা আইসক্রিম খেয়ে আসতে পারেন বা নিজেকে একটা কিছু কিনে দিতে পারেন। আপনি যা পছন্দ করেন, সে রকম কিছু একটা।

যেমন, এই চ্যাপ্টারটি পড়ার পর যদি আপনি নিজের জন্য একটা ওয়ার্কপ্ল্যান বানিয়ে ফেলতে পারেন তবে নিজেকে কিছু একটা গিফ্‌ট দিতে পারেন। এভাবে আপনি বারবার কাজের চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য উৎসাহিত হবেন। এখনই কাজটি লিখে ফেলুন। এখনই, রাইট নাউ। বইটি বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করে এক মিনিট ভাবুন এবং তারপর লিখে ফেলুন, যে - কোন কাজটি আপনি অনেক দিন ধরে করব করব বলে ফেলে রেখেছেন, কিন্তু শুরু করতে পারছেন না। এখনই লিখে ফেলবেন। এটি একটি হোমওয়ার্ক না বলে বরং ক্লাসওয়ার্ক বলুন। এখনই লিখে ফেলবেন, এই চ্যাপটারের শেষে জায়গা দেওয়ার কথা ছিল। আমি সেটা এখানেই এনে দিলাম যাতে এখুনি লিখতে পারেন। এখনই লিখে ফেলুন, আবার বলছি - এক্ষুনি!

কোন কাজগুলো আপনি করবেন বলে বলে অনেক দিন ধরে ফেলে রেখেছেন ? কখন থেকে শুরু করবেন এখানে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লিখেছেন তো ? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কীভাবে কাজের গুরুত্ব বা প্রায়োরিটি নির্ধারণ করবেন এখন সেটি বলছি। আপনি যে কাজগুলো সারাদিন ধরে করেন, সেগুলোকে একটু অবজার্ভ করুন। সেই কাজগুলোর মধ্যে আপনি তিন রকমের কাজ পাবেন।

3D ফর্মুলা

প্রথম যে কাজগুলো পাবেন সেগুলো হচ্ছে Delete যে কাজগুলো আপনাকে মুছে ফেলতে হবে। ঠিক, মুছে ফেলতে হবে। আপনি সাধারণত যেসব কাজ করেন, কিন্তু সেগুলো আসলে তেমন জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, কম ইম্পর্টেন্ট কাজ। যেমন, সারাদিন ফেসবুক ব্রাউজ করা, সারাদিন ইউটিউব বসে বসে ভিডিও দেখা, ফানি ভিডিও দেখা। এগুলো হচ্ছে Low Priority কাজ, মানে No Priority কাজ। আসলে এগুলো আপনার লাইফ থেকে ডিলিট করবেন। ফেসবুক যদি আপনাকে দেখতেই হয়, আপনি একটা টাইম সেট করবেন। কতক্ষণ? এটা হতে পারে ১৫ মিনিট, ২০ মিনিট, আধা ঘন্টা। এর থেকে বেশি হওয়া উচিত না। রাইট? যদি আপনি ফেসবুক থেকে ইনকাম না করেন। ইনকাম করলে সেটা আলাদা কথা। সেটা কিন্তু আপনার ওয়েস্টিং টাইম না। ওটা আপনার কাজের টাইমের মধ্যে পড়বে।

প্রথম Delete - ঠিক আছে, তাহলে আপনি আগে একটা লিস্ট করুন। সেই লিস্টে থাকবে কোন কাজগুলো আপনার লাইফ থেকে ডিলিট করা উচিত। যেগুলো আপনার সময় অপচয় করছে।

দ্বিতীয় Deliver - কোন কাজগুলো আপনাকে Deliver করতে হবে। যে কাজগুলো আপনাকে করতেই হবে। যেমন, আপনার প্রফেশনাল কাজ, আপনার ডেভেলপমেন্টের কাজ, ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো সব A Priority কাজ। সেগুলো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

তৃতীয় - Delegate - সেই কাজগুলো যেগুলো আপনি অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন। ডেলিগেট করতে পারবেন।

তাহলে তিনটা 'D' আমরা খেয়াল রাখব।

নাম্বার ওয়ান ডি হচ্ছে **Delete**

নাম্বার টু ডি হচ্ছে **Deliver**

নাম্বার থ্রি ডি হচ্ছে **Delegate**

গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ ভাগ করে ফেলা

নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কাজের একটা তালিকা তৈরি করা। যে কাজগুলো আপনি আগামীকাল করবেন - আজ রাতেই লিখে ফেলুন। একটি To Do List খুব ভালো কাজ করে এবং যখন এই কাজটি করবেন, আপনার যে কাজগুলো আছে, সেই কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করে ফেলুন।

A Priority কাজ - গুরুত্ব অনুযায়ী মানে যে কাজটা কালকেই করতে হবে, কালকের দিনের মধ্যেই করে ফেলতে হবে এবং আপনাকেই করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে A Priority কাজ, মানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খুব বেশি A প্রায়োরিটির কাজ রাখবেন না, তাহলে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন। দুইটা বা তিনটা এ রকম যে কাজগুলো আপনাকে নিজেকেই করতে হবে এবং কালকের মধ্যেই করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে A প্রায়োরিটি কাজ।

B Priority কাজ - B প্রায়োরিটির কাজ হচ্ছে, যে কাজগুলো কালকে না করলেও চলবে, আরও পরে করলেও হবে – পরশু দিন বা তারপরের দিন করলেও সমস্যা নেই। কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে B প্রায়োরিটির কাজ।

C Priority কাজ - এগুলো হচ্ছে সে কাজগুলো যা আপনি নিজে না করলেও চলবে। আপনি অন্য কাউকে ডেলিগেট করতে পারেন, অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। সেগুলো হচ্ছে C প্রায়োরিটির কাজ।

সব মিলিয়ে মোট ১০ থেকে ১২টা কাজ এ রকম হতে পারে প্রতিদিন। একটু আগেই বলছিলাম, সবার আগে রাখবেন সে কাজগুলো যা আপনি অনেক দিন ধরে ফেলে রেখেছেন এবং এগুলোকে A প্রায়োরিটি দেবেন। তারপর অন্যান্য A প্রায়োরিটির কাজগুলো রাখবেন।

সেগুলো সবার আগে শেষ করে ফেলার চেষ্টা করবেন এবং B প্রায়োরিটির কাজগুলোও করে ফেলার চেষ্টা করবেন। C প্রায়োরিটির কাজগুলো কাকে দেওয়া যায়, সেগুলো আগের রাতে একটু চিন্তা করে রাখবেন কাদের সেই কাজগুলো দেবেন।

যখনই আপনি এই কাজগুলো একটা একটা করে শেষ করে ফেলবেন, প্রত্যেকটি টিক চিহ্ন দেবেন। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, এই টিক চিহ্ন দিতে আপনার অনেক বেশি ভালো লাগছে। আপনার ভেতরে একটা সফলতার অনুভূতি আসছে, মানে অ্যাচিভমেন্টের অনুভূতি আসছে যে আপনি কাজগুলো শেষ করে ফেলেছেন।

সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, রাতের বেলা আজকে সারাদিনে কী কী কাজ করলেন, কয়টি কাজ শেষ করলেন, একটু ভালো করে দেখে নেবেন এবং পরের দিনের জন্য আরেকটি To Do List তৈরি করবেন। এভাবে যদি আপনি এক সপ্তাহ কাজ করতে পারেন, আপনার কাজের কোয়ালিটি অনেক বেশি বেড়ে যাবে। আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেক সুন্দর হয়ে যাবে এবং আপনার হাতে অনেক সময় থাকবে বন্ধুদেরকে দেওয়ার জন্য, আড্ডা মারার জন্য, ফ্যামিলিকে দেওয়ার জন্য।

এ রকম প্রোডাক্টিভিটির জন্য, আপনার নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেকগুলো সময় আপনার বেঁচে যাবে। অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আমাকে জানাবেন কেমন হচ্ছে।



৮০/২০ প্যারেটো রুল

আমরা এখানে একটি রুল সম্পর্কে জানব যেটাকে ৮০/২০ Pareto Rule বলে। এটা খুবই বিখ্যাত একটি নিয়ম, যেখানে বলা হচ্ছে ৮০% কাজ মাত্র ২০% ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এবং মাত্র ২০% কাজ ৮০% ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। এই ৮০/২০ রুল আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

যেমন, এক্সাম্পল দিলে আপনি বুঝতে পারবেন। আপনার যতগুলো কাপড়চোপড় আছে, তার মধ্যে মাত্র ২০% কাপড় আছে যেগুলো আপনি বেশির ভাগ সময় পরেন। আর অনেকগুলো কাপড় আছে যেগুলো আপনি কম সময় ধরে পরেন।

একটি ব্যাংকে যখন টাকা রাখা হয়, তখন মাত্র ২০% কাস্টমার আছে যারা ৮০% টাকা রাখে, অনেক বেশি টাকা রাখে। আর ৮০% কাস্টমার মিলে মাত্র ২০% টাকা রাখে। এখন ব্যাংক ওয়ালারা কী করে? যেই ২০% ভালো কাস্টমার, যারা ৮০% টাকা রাখে, তাদেরকে খুব ভালো করে তারা সার্ভিসটা দেয়। বাকি যে কাস্টমার গুলি আছে, ৮০% যারা তেমন একটা কাজের না, তাদেরকে আস্তে আস্তে ব্যাংক থেকে বের করে দেওয়ার প্রসেস শুরু করে।

একই রকম ভাবে, আপনার কোন ২০% কাজ ৮০% ইম্প্যাক্ট ফেলে? আপনার সারাদিনে যত কাজ করেন, কোন কাজগুলো আপনার বেশি রেজাল্ট নিয়ে আসে, সেগুলোকে লিখে ফেলবেন। আমি আবার বলছি, আপনি খুঁজে বের করবেন কোন ২০% কাজ আপনাকে ৮০% রেজাল্ট দিচ্ছে। সেই কাজগুলোকে আপনি ওপরের দিকে রাখবেন, মানে A প্রায়োরিটির দিকে রাখবেন। আর যে কাজগুলো আপনাকে তেমন একটা ইম্প্যাক্ট ফেলছে না, তেমন একটা রেজাল্ট দিচ্ছে না বা কোন রেজাল্ট দিচ্ছে না, সেগুলোকে আপনি নিচের দিকে রাখবেন এবং আস্তে আস্তে ডিলিট করে দেবেন। ট্রিপল D মনে আছে তো? না? এইভাবে করে আপনি ৮০/২০ প্যারেটো রুল কে আপনার জীবনে ব্যবহার করতে পারেন।

টাইম ম্যানেজমেন্টের শেষ কথা হচ্ছে, সর্বোপরি আপনার জীবনে যদি একটি ভিশন না থাকে এবং সেই ভিশনে পৌঁছানোর জন্য একটি মিশন না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি অনেক বেশি সময় অপচয় করে যাবেন। একদম সবার প্রথমে যে জিনিসটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনার জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করা।

আপনার জীবন থেকে কী চান - আপনি আপনার সারাজীবন ধরে চানটা কী? আপনি কী হতে চান? আজ যদি আপনি মারা যান, আগামীকাল আপনার শোকসভায় আপনার সম্পর্কে কী কথা মানুষ বলবে? আপনি কি সেটা জানেন? সেটি কি আপনি আগে থেকে ঠিক করতে পেরেছেন, বন্ধুরা, যদি ঠিক করতে না পারেন, তাহলে এখনই ঠিক করবেন। কারণ জীবনের সবচেয়ে বড় সময় অপচয়কারী হচ্ছে - যাদের জীবনে কোন ভিশন নেই।

একটি বিশাল ভিশন তৈরি করবেন। যে ভিশনটির জন্য আপনি সারাজীবন ধরে কাজ করে যেতে পারবেন। যেটির জন্য কাজ করলে মৃত্যুশয্যায় আপনি হাসতে হাসতে মারা যেতে পারবেন। এটিই ভিশন।

টাকা কামানো - এটি তো লাইফের একটা পার্ট। এটা তো আপনার জীবিকার জন্য লাগে, আর কিছু না। টাকা কামানো কারও ভিশন হতে পারে না। সেই টাকা মানুষের কল্যাণে খরচ করতে পারা, যতটুকুই আপনার আছে ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, একটি হ্যাপি লাইফ সারাজীবন ধরে কাটিয়ে যাওয়া এবং সত্যিকারভাবে অন্যের জন্য, অন্যের উপকারের জন্য কিছু করতে পারা এটি একটি মহান ভিশন হতে পারে। তাহলে সবার প্রথমে যেই জিনিসটা দরকার, সেটা হচ্ছে ভিশন তৈরি করা। ভিশন আপনার জীবনের লক্ষ্য তৈরী করে তাই এটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।



অ্যাকশন প্ল্যানিং

সময়	কাজের নাম	প্রায়োরিটি (A/B/C)	উপায়/পরিকল্পনা	করা হয়েছে /হয়নি (টিক/ ক্রস দিন)
৬:০০ ৭:০০	দিন শুরুর পরিকল্পনা	A	আগামী দিনের কাজগুলোর তালিকা তৈরি করুন।	☒/ ✕
৭:০০ ৮:০০	স্বাস্থ্যচর্চা	B	যোগব্যায়াম/হাঁটা বা ব্যায়াম করুন।	☒/ ✕
৮:০০ ৯:০০	সকালের নাশতা এবং প্রস্তুতি	C	পরিবারের সাথে সময় কাটানো এবং দিনের প্রস্তুতি।	☒/ ✕
৯:০০ ১:০০	মূল কাজ/প্রজেক্ট	A	আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন।	☒/ ✕
১:০০ ২:০০	দুপুরের খাবার এবং বিশ্রাম	B	হালকা খাবার এবং ছোট বিশ্রাম নিন।	☒/ ✕
২:০০ ৫:০০	সেকেন্ডারি কাজ	B	মিটিং/ইমেইল উত্তর দেওয়া/ কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।	☒/ ✕
৫:০০ ৬:০০	পরিকল্পনা পর্যালোচনা	C	দিনের কাজগুলো পর্যালোচনা এবং আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা।	☒/ ✕
৭:০০ ৯:০০	ব্যক্তিগত সময়	B	পরিবারের সাথে সময় কাটানো/পড়াশোনা/ শখের কাজ।	☒/ ✕
১০:০০ ১১:০০	শোবার আগে রিফ্লেকশন	A	দিনটি কেমন গেল তা নোট করুন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান করুন।	☒/ ✕

নোট –

মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

শারীরিক স্বাস্থ্য যেমন আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানসিক স্বাস্থ্য - মেন্টাল হেল্‌থ আমাদের জন্য সমান বা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বলা খুব মুশকিল। কারণ যদি আপনার মন ভালো থাকে কিন্তু শরীর ভালো না থাকে, আপনি কিন্তু তেমন ভালো কোন কাজ করতে পারবেন না। আবার আপনার শরীর ভালো আছে কিন্তু মন ভালো নাই, মেন্টাল হেল্‌থ ভালো নাই, তাহলেও কিন্তু আপনি অকেজো হয়ে যাবেন।

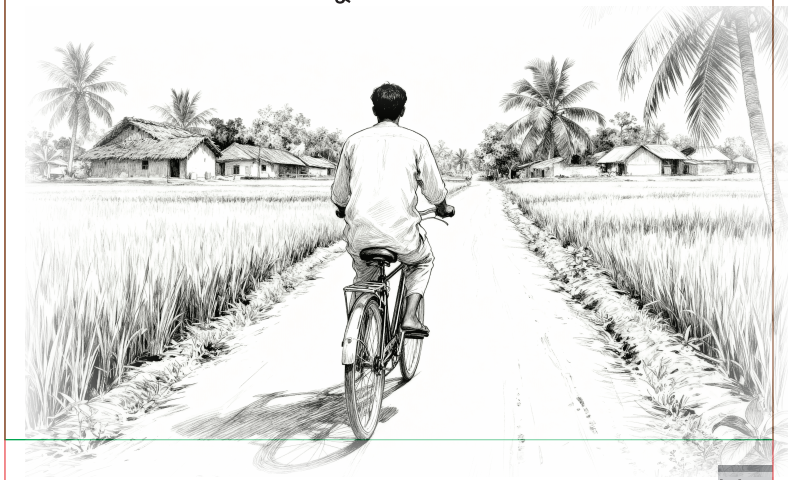

শারীরিক স্বাস্থ্য

শরীর ও পরিবার এ দু'টি জায়গায় আমরা সবচেয়ে বেশি অবহেলা করি। আমাদের জীবনে স্ট্রেস একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চাকরি, সংসার, সামাজিক দায়বদ্ধতা–সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে আমরা প্রায়শই আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করি। অথচ শারীরিক সুস্থতা আমাদের মানসিক প্রশান্তির মূল ভিত্তি। এটি এমন একটি সেতু যা আমাদের শরীর এবং মনকে সংযুক্ত করে। তাই, স্ট্রেস ফ্রি জীবনযাপনের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা জরুরি।

আমাদের প্রতিদিনের জীবন

আমরা আমাদের জীবিকার জন্য একটা নির্দিষ্ট কাজ দিনের পর দিন করে যাই, সেটা চাকরি হোক বা ব্যবসা। আমরা একটা অফিস করি। সকালে ঘুম থেকে ওঠা, দ্রুত অফিস যাওয়া, সারাদিন কাজের চাপে থাকা, এবং রাতে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা–এটাই আমাদের দৈনন্দিন রুটিন। কিন্তু একদিন আমরা টের পাই - মাথা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে, এবং কাজে মনোযোগ দিতে পারছি না। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন না। শরীরকে শুধু কাজে লাগাচ্ছেন কিন্তু তার যত্ন ঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে না, অনেক অনিয়ম করছেন - এবং অবধারিতভাবেই বিভিন্ন রোগ শরীরে জায়গা করে নিচ্ছে।'

শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্ট্রেসের সম্পর্ক

আমরা আগেই জেনেছি - এ অবস্থা আমাদের শরীরে বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেস উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং ওজন বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা মানসিক চাপ বাড়ায়। আবার, মানসিক চাপ শারীরিক অসুস্থতাকে আরও তীব্র করে তোলে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হলো শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া।

স্ট্রেস কমাতে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার কার্যকর উপায়

নিয়মিত ব্যায়াম করা স্ট্রেস হরমোন কমিয়ে শরীরে এন্ডোরফিন বাড়ায়। হাঁটা, জগিং, যোগ বা হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে সক্রিয় রাখতে হয়।

সুষম খাদ্যাভ্যাস মস্তিষ্ককে সচল রাখে। তাজা ফলমূল, শাকসবজি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া মানসিক চাপ কমায়। চিনি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার পরিহার করতে হয়।

পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হয়। প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুম শরীরকে সতেজ রাখে। ঘুমানোর আগে স্ক্রিন টাইম কমানো বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই কার্যকর।

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করলে শরীর হাইড্রেট থাকে এবং ক্লান্তি দূর হয়।

গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত অনুশীলন শরীর এবং মনকে শান্ত করে। দিনে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় নিয়ে গভীর শ্বাস নিন।

অতিরিক্ত কাজের চাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হয়। দিনের পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করলে কাজের চাপ কম হয়।

শরীর এবং মন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। শারীরিক সুস্থতা থাকলে মনের ভারসাম্য বজায় থাকে। শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে জীবনের মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়।

সব হরমোনের খেলা

মহান সৃষ্টিকর্তা মানবশরীরের আনন্দের অনুভূতির জন্য চার চারটি হরমোন দিয়েছেন, আর দুঃখের অনুভূতির জন্য মাত্র একটি হরমোন। সেটি হচ্ছে কর্টিসল। সুখের হরমোনগুলি হচ্ছে - এনডরফিন, ডোপামিন, অক্সিটোসিন ও সেরেটোনিন। যখন আমরা আমাদের জীবনে নেগেটিভিটি - নেতিবাচকতার প্র্যাকটিস করি। যেমন হতাশা,

হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ করা, ঘৃণা ইত্যাদি যে কোন নেগেটিভ চিন্তা করতে থাকি, সবার আগে আমরা আমাদের অজান্তে সুখের হরমোনগুলিকে ধ্বংস করি, এ পর্বে আমরা এই হরমোনগুলির সাথে পরিচিত হবো।

কর্টিসল ও এড্রেনালিন - কর্টিসল ও এড্রেনালিন আমাদের এলার্ট সিস্টেম। যখন আমরা দুঃখে বা বিপদে পড়ি, বিপদের চিন্তা করি বা নেতিবাচকতার চর্চা করি তখন রক্তে কর্টিসল নির্গত হয়। সে আমাদের রক্তে আরেকটি হরমোন এড্রেনালিন এর ফ্লো বাড়িয়ে দেয়। এই এড্রেনালিন আমাদের স্নায়ু-কে সতর্ক করে, উত্তেজিত করে। তখন আমাদের শরীরের অর্গানগুলো প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করতে থাকে। রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়, মস্তিষ্ক সবসময় এলার্ট মুডে থাকে - অস্থির থাকে। যে মানুষ যত বেশী এই অস্থির অবস্থায় তাদের শরীরকে রাখবে তাদেরই ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন বা রক্তচাপের অসুখ, হৃদরোগ, ব্রেইন হ্যামারেজ, ক্যান্সার সহ সব খারাপ খারাপ রোগগুলি হবে। এটা নেগেটিভিটির বিরুদ্ধে প্রকৃতির ব্যবস্থা। এ সমস্ত রোগের ৯৯.৯ পার্সেন্ট কারণ হচ্ছে এই নেগেটিভিটির প্র্যাকটিস।

১. **ডোপামিন (Dopamine)**

- একে reward chemical বলা হয়।
- লক্ষ্য অর্জন, কাজ শেষ করা বা নতুন কিছু শেখার পর ডোপামিন নিঃসৃত হয়।
- এটি মোটিভেশন, আনন্দ ও মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

২. **সেরোটোনিন (Serotonin)**

- একে mood stabilizer বলা হয়।
- পর্যাপ্ত ঘুম, রোদে থাকা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এটি বাড়ে।
- মানসিক শান্তি, সুখ এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখে।

৩. **অক্সিটোসিন** (Oxytocin)

- একে love hormone বা bonding hormone বলা হয়।
- আলিঙ্গন, সামাজিক মেলামেশা বা বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সময় এটি নিঃসৃত হয়। আস্থা, ঘনিষ্ঠতা এবং সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করে।

৪. **এন্ডোরফিন** (Endorphin)

- একে Natural Pain Killer বলা হয়।
- শরীরচর্চা, হাসি বা প্রিয় খাবার খাওয়ার সময় এটি নিঃসৃত হয়।
- ব্যথা কমায়, চাপ হ্রাস করে এবং স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে।
- যখন আমরা শারীরিক পরিশ্রম করি, ব্যায়াম করি বা হাঁটি, স্পোর্টস এ অংশ নেই এ হরমোন নিঃসরিত হয় আমাদের রক্তে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শরীরে যে শান্তির প্রবাহ ঘটে সেটি এই হরমোনের কারণে।

এই চারটি হরমোনই আমাদের মনকে প্রফুল্ল, শান্ত ও উদ্দীপ্ত রাখে।

মাত্র ১৫ মিনিটের শারীরিক এক্টিভিটি আপনার সারাদিনের স্ট্রেস হরমোনের সাথে লড়াই করার সামর্থ্য আপনাকে দিতে পারে। খুব সহজ কাজ। আমরা কি নিজেদেরকে এই সময়টা দিতে পারবো না?

আপনি যখন আপনার মা-বাবা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী পরিজনকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরেন তখন আপনার শরীরে অক্সিটোসিনের বন্যা হয়। ছোট ছোট অসংখ্য সুখের মূহুর্ত খুঁজে বেড়াতে হবে। কাউকে রাস্তা পার করে দিলাম। ঘরের কাজে একটু সাহায্য করলাম, কখনও মেয়েটার সাথে গল্প করলাম - ছেলেটার সাথে একটু লুডো খেললাম। এই ছোট ছোট আনন্দের কাজগুলো আপরার শরীরে সেরেটোনিন উৎপাদন করবে।

আপনার খুব ভাল ঘুম হবে। বাচ্চার মাথায় হাত রাখেন, তার সাথে তার স্কুলের গল্প করেন।

শুধুমাত্র সুন্দরভাবে - প্যাশনেট হয়ে স্বজনের হাত ধরলে - একটা হ্যান্ডশেক করলে আপনার শরীরে যে পরিমান ভাল হরমোন বের হবে - তাতেই আপনার সারাটা দিন ভাল কাটবে। তবে সেটি হতে হবে সচেতনভাবে। এটাকে টাচ থেরাপি বলে। ক্যান্সার এর রোগীদের এই থেরাপি দেয়া হয়।

নিজেকে সময় দেয়া - আমরা 'মি টাইম' ভুলে গেছি। খুব ইম্পর্টেন্ট নিজের শরীর ও মনের যত্ন নেয়া। যা করতে ইচ্ছা করে সেটি করে ফেলা। শিস দিয়ে গান করা, কোথায় ঘুরে আসা, হঠাৎ দূরে কোথাও চলে যেতে পারেন। উদ্দেশ্যহীভাবে হাঁটতে পারেন, একটা আইসক্রীম কিনে খেতে পারেন - অনেককিছুই করা যেতে পারে।

যখন খিদে লাগে - আমরা কী করি? খাবার খাই, যখন ঘুম আসে - ঘুমাই। কীভাবে বুঝি যে খেতে হবে। আপনার ভিতর থেকেই সেই সিগনাল আসে। যখন আপনার ভিতর থেকে সিগনাল আসে যে নিজেকে একটু সময় দিই, গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, আত্মীয়-স্বজনকে একটু দেখে আসি, পুরোনো স্কুলের কথা মনে হয়, বন্ধুদের কথা মনে হয়, তাদের সাথে একটা বিকেল আড্ডা মারতে ইচ্ছা হয় - আমরা যাই না কেন?

আমাদের শরীর জানে কখন আমাদের মন খারাপ - তখন সে আমাদের মনে এই চিন্তাগুলো এনে দেয়। কারণ সে জানে এ কাজগুলো করলেই সেই যে চারটি সুখের হরমোন - সেগুলি সে পাবে। সুখের হরমোনগুলি যখনই আমাদের শরীরে বাড়বে - অটোমেটিকেলি কর্টিসল-এড্রেনালিনের প্রকোপ কমে আসবে।

খুব কঠিন কাজ কি? মোটেই না। আমরা কঠিন বানিয়েছি। আমরা এসব কিছুই করি না। আমরা শুধু বাহানা দেই। অমুক কারণ তমুক কারণ - শত কারণ খুঁজে বের করি। তাই করি না, তাই হয়ে ওঠে না। সে কারণেই পারি না। সব হচ্ছে 'মাইন্ডসেট'।

মেরা এহসাস মেরা ক্বাতিল হ্যায়

সোচকে যখম কিতনে গেহরে হ্যেঁ

ক্যায়া করেঁ কিধর যা-য়ে মনযর

রাস্তে গুঁংগে হ্যেঁ - লোগ বেহরে হ্যেঁ

আমার অনুভূতিই আমাকে হত্যা করে

একথা ভেবে ভেবে যে আমার ক্ষত কত গভীর

কী করবো আমি - কোথায় যাব

এ বোবা পথ ধরে - যেথা সব মানুষ বধির

আশপাশের মানুষ যতই বোবা, অন্ধ, বধির হোক না কেন - ভাল থাকতে হলে আমাদের সবসময় আশাবাদী, ইতিবাচক, নিজের উন্নতি ও নিজেকে গড়ে তোলার জন্য পথ চলতে হবে। আমাদের তো দুনিয়া চালাতে হয় না - সেটা সৃষ্টিকর্তার কাজ। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের ও আশপাশের কিছু মানুষের দিকে একটু খেয়াল রাখলেই হবে। নিজের ওপর, আপন সৃষ্টিকর্তার ওপর, তাঁর তৈরী সিস্টেমের ওপর পূর্ণ ভরসা সবসময় রাখতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য

এখানে আমরা কথা বলব মেন্টাল হেল্‌থ নিয়ে। শারীরিক স্বাস্থ্য যেমন আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানসিক স্বাস্থ্য - মেন্টাল হেল্‌থ আমাদের জন্য সমান বা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বলা খুব মুশকিল। কারণ যদি আপনার মন ভালো থাকে কিন্তু শরীর ভালো না থাকে, আপনি কিন্তু তেমন ভালো কোন কাজ করতে পারবেন না। আবার আপনার শরীর ভালো আছে কিন্তু মন ভালো নাই, মেন্টাল হেল্‌থ ভালো নাই, তাহলেও কিন্তু আপনি অকেজো হয়ে যাবেন। আপনি কোন কাজ করতে পারবেন না। বরং আপনি আপনার শরীরকে আরও বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেবেন। মানসিক সুস্বাস্থ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এজন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এখানে আলোচনা করব আমাদের যে সমস্ত অভ্যাস, যে সমস্ত ব্যাপার আমাদের মেন্টাল হেল্‌থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলো নিয়ে। যথারীতি প্রতিটা সমস্যা আমরা আগে পর্যালোচনা করে সলিউশনের দিকে চলে যাব।

অহংকার বা ইগো

অহংকার বোধ মানে হচ্ছে - আমরা নিজেকে অন্যদের থেকে কিছুটা বড় মনে করি। আমার মনে হয় আমি একটু 'সুপিরিয়র।' আমাকে ছাড়া দুনিয়া চলবে না, এ রকম একটা আইডিয়া, এ রকম একটা চিন্তা আমাদের মধ্যে কিন্তু আছে। এই Ego অনেকটা জাঙ্ক ফুডের মতো। আমরা শখ করে মাঝেমধ্যে জাঙ্ক ফুড খাই, জাঙ্ক ফুড মাঝেমধ্যে ঠিক আছে, কিন্তু যদি আপনি খেতেই থাকেন, তাহলে আপনার শরীর কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। একই রকম ভাবে, আপনি যদি এ রকম ইগোইস্টিক চিন্তা করতে থাকেন, অন্যদেরকে ছোট মনে করতে থাকেন, নিজেকে বড় মনে করতে থাকেন ক্রমাগত, তাহলেও কিন্তু আপনার এই মেন্টাল হেল্‌থটা একসময় ধ্বংসই হয়ে যাবে।

আপনার ইগো একটি বাব্‌লের মত। বাব্‌ল বা বুদবুদের কোন গুরুত্ব আছে? এই যে ছোট বাচ্চারা সাবানের ফেনা দিয়ে যে বুদবুদ তৈরি করে, এই বুদবুদটা কতক্ষণের জন্য বাতাসে থাকে? খেয়াল করেন, একটু পরেই কিন্তু এটা বাতাস থেকে মিলিয়ে যায়। আমরা যে পৃথিবীতে আছি, পৃথিবীর সময়ের যে হিসাব সেইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে আমাদের পুরো লাইফটা কিন্তু এ রকম একটা বুদবুদের মতো, কম্পিউটারের স্ক্রিনের পপআপের মতো। স্ক্রিনে একটা পপআপ আসল, আবার চলে গেল। আপনি ক্রস করে দিলেন, চলে গেল। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। আপনার এই যে জীবনটা, ৭০-৮০ বছরের একটা জীবন, এই জীবনটা মহাকালের তুলনায় কত ছোট। এই জিনিসটা আপনি যদি একটু ভাবেন, তাহলে আশা করা যায় যে আপনার এই ইগোটা কমে আসবে।

এই মহাবিশ্বের তুলনায় কতই-না ক্ষুদ্র একটি স্থান আপনি দখল করে আছেন। যত রাজা-মহারাজার কথা আমরা শুনি, জুলিয়াস সিজারের কথা শুনি, মিশরের ফারাওদের কথা শুনি, বড় বড় রাজা-বাদশাহ, বড় বড় সম্রাটদের কথা শুনি, পারস্যের সম্রাটদের কথা শুনি, তুর্কি সম্রাটদের কথা শুনি, মুঘল সম্রাটদের কথা শুনি, তারা আজকে কোথায় চলে গিয়েছে? যদি তারা নিজেদেরকে বড় বলে মনে করতে চাইত, ইগোইস্টিক হতে চাইত, তাহলে সেটা হয়তো কিছুটা হলেও মানাতো। আমাদের কি আসলে মানায়? একেবারেই মানায় না। তারা যেমন চলে গিয়েছে, আমরাও একইভাবে চলে যাব। আমরা এই পৃথিবীতে অল্প কিছুদিনের জন্য এসেছি। এই অল্প কিছুদিন অসম্ভব সুন্দর একটি পৃথিবী তৈরি করে যাব। এই টাইমের মধ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইগোইস্টিক হওয়া এটা আসলে কিন্তু মানায় না। এটি একটি সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু না বরং এটির কারণে আমাদের মানসিক চাপ অনেক বেড়ে যায়। যখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের পাওয়া মিলে না, তখনই স্ট্রেস বাড়তে থাকে এ কথা আমরা শুরুতেই বলেছি।

আপনি মানুষের মনে কীভাবে থাকতে চান? আপনি কি একজন ইগোইস্টিক বাদশা বা নিজেকে খোদা মনে করা একজন অহংকারী সম্রাট হতে চান? কিংবা একজন আপনার পরিচিত ইগোইস্টিক মানুষ–যে দুনিয়া থেকে চলে গেছে–তাকে কীভাবে স্মরণ করেন? তাকে কীভাবে মনে রাখেন? আপনি কি চান যে আপনার মৃত্যুর পর মানুষ আপনাকে সেভাবে মনে রাখুক? নিশ্চয়ই চান না, তাই না?

আমরা কিন্তু মানুষকে অপমান করার সামান্যতম সুযোগ হাতছাড়া করি না। কেন? এটি বিভিন্ন কারণে তৈরি হয়েছে। এটি আমাদের ছোটবেলায় আশেপাশে যে মানুষদের দেখতাম, তাদের থেকে আমরা শিখেছি। অবচেতনভাবে আমরা আমাদের পরিবেশ থেকে এই জিনিস শিখে নিয়েছি। যা কিছু আমরা শিখেছি, সবই যে ঠিক জিনিস, সেটা কিন্তু না। অনেক ভুল জিনিস শিখেছি। যেমন, কোনো একজন মানুষের শরীরের রং যদি একটুখানি চাপা হয়, একটুখানি কালো হয়, তাহলে আমরা তাকে একটা নাম দিয়ে দিই। তাই না? সেই নামটা অপমানসূচক। সেই নামটা শুনলে তার কষ্ট লাগে। আমরা এই কষ্টটা দিয়ে কেমন যেন খুব আনন্দ পাই, খুব মজা পাই। যাই হোক, যেভাবে হোক, এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। কিন্তু আপনি কী বলেন? এই জিনিসটি কি আমাদের মধ্যে রাখা উচিত? উচিত না। আমরা আরেকজনকে যখন অপমান করি, তখন আমাদের খুব মজা লাগে। কিন্তু আরেকজন যখন আমাদেরকে অপমান করে, তখন কেমন লাগে? নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। আমরা এমন কাজ করব না, যেটা অন্যেরা আমার সাথে করলে আমার খারাপ লাগবে। ঠিক আছে?

অনেক সময় আমরা মৌখিকভাবে অপমান করি না। কিন্তু এমন একটা চেহারা বানাই, যাতে অপমান বোঝা যায়। অথবা একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিলাম কাউকে। আমরা কিন্তু সেন্সিবল হই না। আমরা অপর প্রান্তটা

খেয়াল করি না। অন্য মানুষ এই এক্সপ্রেশনটা দেখে কী মনে করতে পারে? বা কতটুকু তার মনে ব্যথা লাগতে পারে? তাহলে, ইতিবাচক মানুষ হিসেবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আপনার স্ট্রেস অনেকাংশে কমে আসবে যদি এই বাজে জিনিসগুলো আপনার এই ফ্রিজ থেকে বের করে দেন। হ্যাঁ, এটা একটা ফ্রিজ। আপনার ফ্রিজে যদি ময়লা খাবার রাখেন, পচা খাবার রাখেন তাহলে কেমন হবে? সেটা অন্য খাবারগুলোকে যেমন নষ্ট করে দেবে, তেমনই আপনার ব্রেইনে যদি ইগোইস্টিক আইডিয়া রাখেন, নিজের সম্পর্কে অহংকার রাখেন, তাহলে সেই খাবারটা, সেই পচা চিন্তাটা অন্যান্য চিন্তাগুলোকেও দূষিত করে ফেলবে, নষ্ট করে ফেলবে। তাহলে, আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এই জিনিসগুলো বের করে দেবো। নষ্ট চিন্তাগুলো আমাদের ব্রেইন থেকে বের করে দেবো।

কীভাবে করবেন? একদম সহজ। আপনি একটু বসে ভাববেন, আজকে আমি কী কী আচরণ মানুষের সাথে করেছি? আজকে সারাদিনের কাজ শেষে রাতে বাসায় ফেরার পর, আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করবেন। ভাববেন, আজকে সারাদিনে কী কী ঘটনা হয়েছে? কাউকে কি



আমি অপমান করেছি? অনেক সূক্ষ্মভাবে হলেও, কী অপমান করেছি? বা আমি অন্য কারও সম্পর্কে এ রকম খারাপ কোন

আইডিয়া করেছেন, যে সে আমার থেকে নিচু? যেমন একজন রিকশাওয়ালাও সম্পর্কে বা একজন ভিক্ষুক সম্পর্কে। তাই না? এগুলো কিন্তু আমরা সারাক্ষণ করতে থাকি আমাদের মাইন্ডে। আমাদের চেক করতে হবে। আমাদের ফ্রিজের ভেতরে যে ব্রেইনটা আছে, আমাদের এই খুলির ভেতরে যে চিন্তাটা আছে, এই চিন্তাটাকে আমরা একটু পাহারা দিতে পারছি কিনা। আমরা ভালো জিনিসগুলো রাখব। খারাপ জিনিসগুলো বের করে দেবো। খারাপ জিনিসগুলো থেকেই কিন্তু স্ট্রেস তৈরি হয়। আপনি তো এখানে স্ট্রেস ম্যানেজ করা শিখতেই এ বইটি হাতে নিয়েছেন। এইগুলো যদি আমরা বের করে দিতে পারি, তাহলে আমরা অনেকটা স্ট্রেস ফ্রি থাকতে পারব।

সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি ঘৃণা ছড়ানো হয় - আপনি কি খেয়াল করেছেন? আপনি কি সারাদিনে আজকে এমন কিছু কমেন্ট বা এমন কোন পোস্ট করেছেন, যেখানে কাউকে অপমানসূচক কোন কথা বলা আছে? আপনি নিশ্চয়ই এ রকম অনেক পোস্ট দেখে থাকবেন। প্রতিদিন আমরা হাজার হাজার এ রকম পোস্ট দেখি, যেখানে অপমানসূচক কথা বলা হয়। এগুলোকে আপনি দেখবেনও না। এগুলোকে avoid করবেন। এগুলোকে ব্লক করবেন। এগুলো যেন আপনার চোখের সামনে না আসে। আপনি যেই সমস্ত কন্টেন্ট সার্চ করবেন, সেই কন্টেন্টগুলো কিন্তু বেশি বেশি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে ফিরে আসবে। কেমন? তাহলে, এই ব্যাপারগুলো আমরা সতর্কভাবে পাহারা দেব।

ইগোইস্টিক হওয়ার আমাদের একটি বাহানা আছে। বাহানা হচ্ছে যে, 'আমি যদি তাকে অপমান না করি তাহলে আমার আত্মসম্মানবোধ আমি রক্ষা করব কীভাবে?' আত্মসম্মানবোধ এবং ইগোইস্টিক হওয়া এই দুইটা খুব কাছাকাছি জায়গায় থাকে। এই দুইটার মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম একটা লাইন থাকে, যেটা এই দুইটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে।

আত্মসম্মানবোধ - আত্মসম্মানবোধ মানে হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা। আপনি জানেন আপনি কী, সেটি আপনি সঠিকভাবে জানেন। কিন্তু সেটা অন্যের তুলনায় না, অপরের সাথে তুলনা করে না। আপনার নিজের তুলনা শুধুমাত্র আপনি নিজে। আপনি যখন নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করেন এবং তাকে হেয় করার চেষ্টা করেন বা তাকে ছোট মনে করেন, সেটা হচ্ছে ইগো। আর আপনি যখন জানেন আপনার ক্যাপাবিলিটিস কী, আপনার দুর্বলতাগুলো কী এবং আপনি আপনার যে শক্তিশালী দিকগুলো আছে সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেন, সেগুলোকে ডেভেলপ করার দিকে মনোযোগ দেন এবং সেটা সংরক্ষণ করেন, সেটা হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ।

অনেক সময় আমাদের মনে হয়, 'মানুষ যদি আমাকে দু'টা কথা শুনিয়ে দেয় তাহলে আমার আত্মসম্মানবোধ কমে গেল।' ব্যাপারটা ঠিক সে রকম না। অন্য কারও কথায় যদি আমাদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ন হয়ে যায় তবে আমাদের নিজেদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করা উচিত। আপনি যখন নিজেকে নিজে বাজে কথা শোনাবেন, নিজেকে নিজে ছোট করে ফেলবেন, সেটা হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ খর্ব করা।

অন্য মানুষ আপনার আত্মসম্মানবোধ কখনো নষ্ট করতে পারে না

অন্য মানুষ আপনাকে গালি দিতে পারে, কিন্তু আপনি সেই গালিটা নিলেন কিনা সেটাই ইম্পর্টেন্ট। গৌতম বুদ্ধকে একবার একজন লোক এসে অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করে গেল, গালাগালি করে গেল। বুদ্ধ হাসিমুখে পুরো ব্যাপারটা অবজার্ভ করলেন। পুরো জিনিসটা শেষ হলো এবং সেই লোকটা যখন চলে যাচ্ছিল, তখন বুদ্ধ তাকে ডেকে বললেন, *'শোনো, আমি যদি তোমাকে কোন জিনিস দিই এবং তুমি যদি সেটা না নাও, তাহলে সেটা কার কাছে থাকবে'?*

তখন সে বলল, *'তুমি এটাও জানো না? যার জিনিস, তার কাছেই থাকবে।'* তখন বুদ্ধ বললেন, *'তুমি যে এতক্ষণ আমাকে গালাগালি করলে, এগুলো আমি একটাও নেই নাই'!*

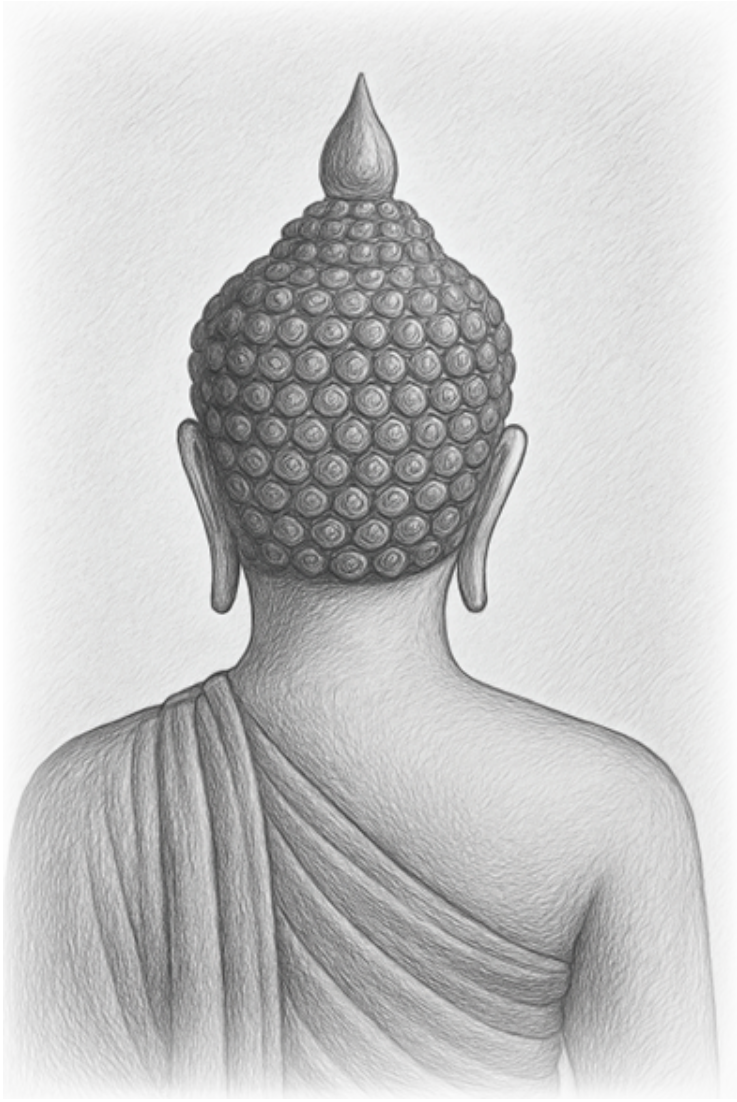

বন্ধুরা, তাহলে এইভাবে করে মানুষ আমাদের কী বলল, সেটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে অপমান করলাম কিনা। আমার নিজের সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা আছে কি না। সেই ধারণা কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

অন্য মানুষ কী মনে করছে, সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সে যা ইচ্ছা মনে করতে পারে এবং যাচ্ছেতাই বলতে পারে। সেটাই তার অধিকার। কিন্তু আমার সম্মান রক্ষা করা আমার কাজ।

আমার সম্মান রক্ষার মানে কী - তাকে বকা দেওয়া? তাকে গালি দেওয়া? তার ওপর আক্রমণ করা? না। নিজের সাথে বোঝাপড়া করা। আপনি এটা হাসিমুখে শুনে যাবেন এবং নিজে নিজে বলবেন, *'আচ্ছা ঠিক আছে, ও আমাকে এটা মনে করছে। করুক গিয়ে, ও ছোটবেলায় ভিটামিন পায়নি তো আমি কী করতে পারি'?* এটা করতে পারা আসলে একটু কঠিন কাজ। এজন্য প্র্যাকটিস লাগবে।

কীভাবে প্র্যাকটিস করবেন - অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করব আমরা। একটু প্রো-অ্যাক্টিভ হলেই কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারব। সাধারণত আমরা এটা করতে পারি না, কারণ আমরা খুব রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাই। আমরা রি-অ্যাকশন দেখিয়ে ফেলি। রি-অ্যাকশন দেখাব না। আমরা প্রো-অ্যাকশন দেখাব। প্রো-অ্যাকশন মানে হচ্ছে, আগে থেকে একটুখানি প্ল্যান করে রাখা। যে এইরকম কিছু যদি কেউ আমাকে এসে বলে, যা যা সিচুয়েশন আপনার হতে পারে, সেই সিচুয়েশন গুলি আপনি নোট করবেন।

কী কী সিচুয়েশন হতে পারে এবং ওই সিচুয়েশনে গিয়ে আপনি ওই কাজটা করবেন যেটা আপনি আগে থেকে ভেবে রেখেছেন। ইনস্ট্যান্ট হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত আমরা নেব না এবং নিজের আত্মসম্মানবোধ রক্ষা করার সাথে সাথে সামনের মানুষটা, অন্য মানুষের আত্মসম্মানবোধটাও রক্ষা করব। সেটাও কিন্তু আমাদের কাজ।

সেন্স অফ হিউমার

সেন্স অফ হিউমার মানে কী? মজা গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং মজা করে কথা বলতে পারার ক্ষমতা। আমরা সাধারণত মনে করি যে আমি যদি একটু মুখ গোমড়া করে রাখি তাহলে সেটা হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ। জি না! হাসিখুশি মানুষকে সবাই পছন্দ করে, হাসিখুশি থাকবেন। হাসিখুশি থাকলে আপনার মেন্টাল হেল্‌থ ভালো থাকবে, অনেক বেশি ভালো থাকবে।

জোক বলেন, মজার গল্প বলেন, মজার গল্প পড়েন, মানুষের সাথে সে গল্প শেয়ার করেন। অবশ্যই আপনি লিমিট রাখবেন, একেবারে হালকা হয়ে যাওয়া মানে কিন্তু সে রকম না। ব্যাপারটা আপনি নিজে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার পার্সোনালিটির সাথে কতটুকু যায় বা কীরকম কথায় বুদ্ধিমত্তা থাকবে।

মানুষ একমাত্র প্রাণী যে হাসতে পারে। আমরা মানুষ। আমরা হাসবই, আমরা মজা করব, আমরা লাইফকে এনজয় করব। বাচ্চাদের সাথে মিশে যান। তাদের সাথে মিশলে আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে সেন্স অফ হিউমারের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। আনন্দে থাকার, মজায় থাকার ব্যাপারটা বাচ্চাদের থেকে আপনি শিখতে পারবেন। মানুষ কিন্তু হাসিখুশি মানুষকে পছন্দ করে বেশি, তাই না? গোমড়ামুখো মানুষের তুলনায় হাসিখুশি মানুষকে বেশি পছন্দ করে।

হাসিখুশি থাকলে যে আপনার পার্সোনালিটি নষ্ট হয়ে যাবে, এই আইডিয়াটা একেবারে ভুল। আপনি ট্রাই করে দেখেন। আপনি যদি একজন গোমড়ামুখো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে হাসলে আপনার আত্মসম্মানবোধ বাড়বে। আপনাকে মানুষ আরও বেশি পছন্দ করবে এবং আপনার মনের ভেতরে যে গুমোট একটা ভাব আছে, সেই ভাবটাও চলে যাবে।

আপনার মেন্টাল হেল্‌থ অনেক ভালো হবে। আপনি ভালো থাকবেন। আমরা বেশির ভাগ সময়ে সেলফ রেস্পেক্টের সাথে এই হিউমার, সেন্স অফ হিউমার–এই দুইটাকে শত্রু বানিয়ে ফেলি। এরা দুইজন শত্রু না। এরা দুইজন খুব ভালো বন্ধু। হাসলে আপনার পার্সোনালিটি উন্নত হবে।

প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া

মাঝে মাঝে বেড়াতে চলে যাবেন। মেন্টাল হেল্‌থ ঠিক রাখার জন্য এটা একটা চমৎকার জিনিস। মাঝে মাঝে বেড়াতে চলে যাওয়া, কোথাও হারিয়ে যাওয়া। এমনি কোন একটা গাড়িতে উঠে একদিকে চলে যান, কোথায় যাচ্ছেন জানেন না। প্রকৃতিকে দেখুন। লাইফ কোন সিরিয়াস ব্যাপার না। আপনাকে ছাড়া সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলবে। সো, রিলাক্স! আপনি কোথাও চলে যান। কখনো বন্ধুবান্ধবদের সাথে, কখনো শুধু দুইজনে–হয়তো হাজব্যান্ড-ওয়াইফ। আবার কখনো একেবারে একা, নিজের সাথে নিজে, নিজের ফ্রেন্ড নিজে–আর কেউ নাই। প্রত্যেকটা ঘটনারই ডিফারেন্ট রকমের ইম্প্যাক্ট আছে। ভিন্ন রকমের ইফেক্ট ব্রেইনের মধ্যে পড়ে।

আমরা মাঝে মাঝে একেবারে হারিয়ে যাব। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাব, একাত্ম হয়ে যাব। আমি মাঝে মাঝে এই কাজটা করি–প্রায়ই করি। যেমন আমি একটা বাসে উঠে গেলাম। আমি জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি। আবার রাস্তায় নেমে গেলাম। রাস্তায় নেমে দেখলাম কিছু বাচ্চা ফুটবল খেলছে। তাদের সাথে গিয়ে কিছুক্ষণ খেললাম। আবার অন্য একদিকে চলে গেলাম। একটা পুকুর দেখলাম - নেমে গেলাম। দুই ঘন্টা সাঁতার কেটে উঠলাম। একটা রিকশা নিয়ে বা একটা অটো টেম্পো নিয়ে কোন একদিকে গ্রামের রাস্তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। দুই পাশে ধান খেত। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কী যে মজা! এটা আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না। টায়ার্ড হয়ে গেলাম, কোন একটা মসজিদে ঘুমিয়ে গেলাম।

একবার কী করেছি–ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা করছিল। মন ভালো লাগছিল না, কেমন জানি। সব গুমোট লাগছিল, ভালো লাগছিল না। তো, ইলিশের বাড়ি তো চাঁদপুর। সকালবেলা আমি একটা চাঁদপুরের বাসে উঠে গেলাম। দুপুরের দিকে চাঁদপুর গিয়ে পৌঁছালাম, বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে। লঞ্চ ঘাটে চলে গেলাম। ইলিশ মাছ খেলাম, ভাত খেলাম। খেয়ে আড়াই টার দিকে একটা লঞ্চে উঠে গেলাম। সেখান থেকে বুড়িগঙ্গা নদী দিয়ে ঢাকা চলে এলাম। সদরঘাট থেকে হেঁটে হেঁটে কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে একটা টিকিট কাটলাম। রাতে স্লিপিং বার্থে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সকালবেলা চট্টগ্রাম চলে গেলাম। কেমন হলো? এই যে ছোট্ট একটা টাইম, এই সময়ে আমি কত মজা করলাম! কত জায়গা দেখলাম। মন একদম ভালো হয়ে গেল।

এ রকম অসংখ্য ঘটনা আছে। এই পাগলামিগুলো কিন্তু আমি করি।

আরেকটি গল্প বলি। একবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম ফ্যামিলি নিয়ে। মানে সবাই যেতে চাচ্ছিল কক্সবাজার বেড়াতে। পুরো ফ্যামিলি নিয়ে কক্সবাজার গেলাম, ঘুরলাম। ওদেরকে নিয়ে মজা করলাম বেশ। কিন্তু আমার মনে হলো যে আমি একা আসলে যে রকম মজা হয়, ওই মজাটা হয়নি। তো করলাম কী, ওদেরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আবার চলে গেলাম। তখনই! মানে সাথে সাথে। ওদেরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে রেস্ট নিয়ে, হয়তো পরদিন সকালবেলায়, আবার কক্সবাজার চলে গেলাম। ওখানে আমি একদম একা দুই-তিন দিন থেকে আসলাম। এবার আমার বেড়ানোর যে মজাটা, সেটা পূর্ণ হলো।

এইরকম পাগলামি মাঝে মাঝে করতে হয়। আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এগুলো কিন্তু অনেকের কাছে অনেক বড় পাগলামি। করেন না একটু পাগলামি! লাইফ তো একটাই, তাই না?

পাগলামির নতুন সংযোজন হচ্ছে - প্রতি মাসে একটি জেলা ট্যুর। ২-৩ দিনের। বাংলাদেশের সব জেলা ডিটেইলে ঘোরা। এ পর্যন্ত আমার বেশ অনেকগুলি জেলা ঘোরা হয়ে গেছে।

এইভাবে আপনি যদি লাইফটাকে দেখতে পারেন, আপনি মেন্টালি অনেক ভালো থাকবেন। এটা আপনার কাছে পাগলামি মনে হোক, মানুষের কাছে পাগলামি মনে হোক, কারও কাছে কী মনে হলো সেটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে–আপনি ভালো আছেন কিনা, মেন্টালি আপনি সুস্থ আছেন কিনা। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট।

নেক্সট কবে আপনি বের হবেন, এখনই লিখে ফেলুন। কবে আপনি একা একা বের হবেন, সেটা এখনই লিখে ফেলুন। অথবা বন্ধুবান্ধবদের সাথে। কোন সমস্যা না। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে–মাঝে মাঝে আমাদেরকে মেন্টাল রিফ্রেশমেন্টের জন্য বের হয়ে যেতে হবে। সময় বা টাকা নাই - এটা একটা বাহানা। আসল কথা হচ্ছে মাইন্ডসেট। আপনি যদি আসলেই করতে চান, করতে পারেন।



অন্যের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করা

আরেকটি বড় কারণ যেটা আমাদের মেন্টাল হেল্‌থ নষ্ট করে সেটা হচ্ছে অন্যের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করা। আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে অন্য মানুষের সাথে তুলনা করতে থাকি। 'আমার বন্ধু, সে আমার সাথেই স্কুল-কলেজে গিয়েছে। এত অল্প সময়ে এত টাকা কামিয়ে ফেলেছে–আমি কেন কামাতে পারিনি?' ওটা তো আপনার বন্ধু, আর আপনি তো আপনি। সে তো আপনি না, বা আপনি তো 'সে' না। প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে ইউনিক এবং তারা তাদের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। কাজের মাধ্যমে সে ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায় অনেকটুকুই। তাহলে আপনি কাজ করেন, কাজে নেমে পড়েন। স্ট্রেস কেন নিচ্ছেন? অন্যের সাথে তুলনা কেন করছেন?

নিজের সাথে শুধু নিজেরই তুলনা হতে পারে - অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে তুলনা না করলে আমরা এগোবো কীভাবে? আপনি অবশ্যই এগোতে পারবেন। অন্যের সাথে তুলনা করে না। নিজের সাথে নিজের তুলনা করেন। আপনি নিজেকে কতটুকু ছাড়িয়ে গেলেন? কালকের যে আপনি, তার থেকে আজকের আপনি আরও ভালো কিনা? এইটা হবে প্রশ্ন। নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন। সবসময় কম্পিটিশনটা হবে নিজের সাথে, অন্য কারও সাথে না।

আমরা কম্পেয়ার করব না নিজেদেরকে এবং নিজেদের বাচ্চাদেরকেও না। আমরা কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে অন্যের সাথে তুলনা করি। তাই সে যখন বড় হয়, সে-ও নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করতে থাকে এবং অন্যদেরকেও নিজের সাথে তুলনা করতে থাকে। বড় হয়ে তার যখন বাচ্চা-কাচ্চা হবে, সে-ও কিন্তু তার বাচ্চাকে অন্যের সাথে তুলনা করবে। এটা বাবা-মা থেকে আসলে শিখা হয়। সব দিক থেকে আপনি একজন ইউনিক মানুষ। আমি একজন ইউনিক মানুষ। এই কথাটা আমাদের সারাক্ষণ মনে রাখতে হবে।

পাছে লোকে কিছু বলে

লোকে যদি কিছু বলে, তাহলে আমি কী করব? কী করার আছে? কিছুই করব না। লোককে ভাবতে দেন, লোকে কী ভাববে, সেটাও যদি আপনিই ভাবেন, তাহলে লোকে কী ভাববে? লোককেও তো কিছু ভাবতে দিতে হবে।

এইগুলো চিন্তা করে কোন লাভ হয় না। বরং এগুলো আমাদের এনার্জি নষ্ট করে, আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলে অনেকাংশে। আমরা আমাদের মানসিক শক্তি নষ্ট হতে দেবো না। আশপাশের লোকে কী বলে, এটা আমরা চিন্তা করব না। আমরা নিজেরা কী বলি বা কী ভাবি, সেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট।

সাহস রাখেন। নতুন নতুন স্কিল শেখেন। তাহলে আপনার ভেতরে সেই কনফিডেন্সটা তৈরি হবে, যে আপনাকে তখন আর ভাবতে হবে না যে মানুষ আমাকে কী বলবে। আপনি আপনার দুর্বল জায়গা কী কী আছে, সেগুলো লিখে ফেলেন। এখনই লিখে ফেলেন। আজকেই লিখে ফেলেন এবং কাল থেকে কোন স্কিলটা শিখতে শুরু করবেন, সেটা ঠিক করেন।

যেমন, একটা একটা করে নতুন নতুন স্কিল, নতুন নতুন দক্ষতা আপনি শিখতে থাকেন এবং দক্ষ হয়ে ওঠেন। যখন আপনি কোন বিষয়ে দক্ষ হয়ে যাবেন, তখন ওই বিষয়ে আর কোন দুশ্চিন্তা আসবে না। তখন আপনার মনে হবে না যে পাছে লোকে কিছু বলে। ব্যাপারটা হচ্ছে দক্ষতা তৈরি করার। এই যে কমিউনিকেশন স্কিল, মানুষের সাথে সংযোগের দক্ষতা, এটাও সাংঘাতিক চমৎকার একটি দক্ষতা। এ রকম প্রচুর দক্ষতা আছে যেগুলো আপনি সারাজীবন ধরে শিখতে পারেন। জীবনেও শেষ হবে না।

তাহলে আপনার হাতে অনেক কাজ। স্ট্রেস করার কোন টাইম নাই। লোকে কী বলে, ডোন্ট কেয়ার। কেয়ার করার কিছু নাই। আমি আপনাদেরকে ধরিয়ে দিচ্ছি কোন কোন জায়গা থেকে স্ট্রেসগুলো আসে, কেন আমাদের মেন্টাল হেলথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাফ করে দেওয়া এবং ভুলে যাওয়া - Forgive and Forget

কোন কোন মানুষ আপনার সাথে বাজে ব্যবহার করে বসবে, কারণ সবাই তো আর আপনার মতো না। সবাই তো আর আমাদের মত করে চিন্তা করে না। সবাই যার যার মত করে চিন্তা করে। মানুষের চিন্তা আপনি কখনো থামাতে পারবেন না। তারা তাদের মত করে ভাবতে থাকবে। তারা কখনো কখনো আপনাকে মনে কষ্ট দিয়ে ফেলবে।

পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, আপনার বিজনেস পার্টনার, ক্লায়েন্ট বা আপনার বস, কত মানুষ আছে সারা পৃথিবীতে। একজন রিকশাওয়ালাও, দাম দর করতে গিয়ে অনেক সময় সে ঝগড়া করে ফেলে। একজন বাস কন্ডাক্টর আপনার সাথে ঝগড়া করে ফেলে। এই ব্যাপারগুলো সারাজীবন ধরে চলতে থাকবে।

Just Let go, Forgive and Forget - বাদ দেন, মাফ করে দেন এবং ভুলে যান। তৎক্ষণাৎ ভুলে যান। কারণ আপনার চিন্তা করার জন্য অনেক পজিটিভ ভাবনা আছে। এই ফালতু জিনিস নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার মত সময় আপনার নাই, রাইট?

আমাদের ইগো – ওই যে প্রথমে বলেছিলাম ইগো, সেই ইগোটা কিন্তু এটা করতে চায়। সে এই ব্যাপারটা তৈরি করে। মাফ করতে দেয় না। ভুলে যেতে দেয় না। জাঙ্ক করে রাখে মাইন্ডের ভিতরে। আমরা কেন অন্য মানুষের জাঙ্ক আমাদের মাথার ভেতরে নিয়ে ঘুরব, তাই না? এটা আমরা করতে পারি না। তাহলে আমাদের ভালো চিন্তাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ যদি আপনাকে চয়েস দেন এ রকম যে তুমি যদি সব মানুষকে মাফ করে দাও–তোমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে সারাজীবনে, যত বড় কষ্টই দিক না কেন–তাহলে আমি তোমাকে মাফ করে দেবো।

এইটা কী চমৎকার একটা ডিল না? অবশ্যই এটা চমৎকার একটা ডিল। আপনি মানুষকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন। এটা আসলে আমার নিজের লাভের জন্য।

আমার ব্লাড প্রেসার ঠিক থাকবে। আমার মেন্টাল হেল্‌থ ভালো থাকবে। সেই কারণে আমি মানুষকে মাফ করে দেবো এবং ভুলে যাব। কমপ্লিটলি ভুলে যাব। ভালো কাজে মনোযোগ দেবো।

সময় সবকিছু বদলে দেয়

জীবনে যখনই কোনো পরিস্থিতি আসে, সেটা সুখের হোক বা দুখের, সাফল্যগাথা হোক বা ব্যর্থতার মূহুর্ত; প্রেম হোক বা বিরহ–মানুষের প্রথম ভুল ধারণাই হয় - 'এ অবস্থা বোধহয় চিরদিনই থাকবে।" দুঃখে পড়লে মনে হয়, এ কষ্টের তো কোনো শেষই নেই। আর সুখ ধরা দিলে আমরা ধরেই নিই, এ আনন্দ বুঝি চিরকাল চলবে। কিন্তু সত্যি হল–সময়ের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই। সময় সব বদলে দেয় – গভীরতম দুঃখটা বা সর্বোচ্চ সাফল্য, সবকিছু বদলে দেয়। সময় কত রাজাকে ভিখারি করেছে, আর কত ভিখারিকে রাজা। মহান সব প্রেমকে কেবল স্মৃতি করে দিয়েছে, আর সবচেয়ে বড় যুদ্ধকে ঠাঁই দিয়েছে শুধু ইতিহাসের পাতায়। এটাই জীবনের অবধারিত নিয়ম–কিছুই স্থায়ী নয়।

যখনই আমরা সত্যি বুঝে ফেলি যে জীবনের প্রতিটি অবস্থা সাময়িক, তখনই আমরা আসলে বাঁচতে শিখি। 'এ পরিস্থিতিটাও কেটে যাবে"–এই কথাটার ভিতরেই এই উপলব্ধিটি আছে। কঠিন সময়ে–অর্থকষ্ট, অসুখ-বিসুখ, ভাঙা সম্পর্ক, অথবা এমন কোনো ক্ষতি যা আত্মা ছিঁড়ে দেয়–মন ধরে নেয়, 'এটাই শেষ।" মনে হয় সামনে আর কোনো পথ নেই। কিন্তু নিজের অতীতটা যদি আমরা দেখি, –এর আগেও কত বিপদ-আপদ পেরিয়ে এসেছি, সবই তো কেটে গেছে। তখনও লেগেছিল জীবন অসম্ভব। অথচ আজ দাঁড়িয়ে আছি, শ্বাস নিচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি।

দুঃখগুলো স্থায়ী ছিল না–তারা আমাদের ছেড়ে গিয়েছে। তাই পরের বার দুঃখ ঘিরে ধরলে মনে রাখতে হবে - *'এটাও কেটে যাবে'*। এটা শুধু সান্ত্বনা নয়–খুব গভীর সত্য। অতীত যদি কেটে গিয়ে থাকে, বর্তমানও কেটে যাবে। আর এ কথা শুধু দুঃখ কাটানোর জন্যই নয়–সুখের সময়েও ঠিক ততটাই দরকারি। সাফল্য, নাম-খ্যাতি, প্রেমের মিষ্টি স্বাদ–এসব পেলে আমরা ধরে নিই, *'এ অবস্থাই থাকবে চিরকাল'*। ঠিক তখনই আমরা ভাববো - *'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*। এটা মনে করা জরুরি - নইলে সুখের মোহ আমাদের আঁকড়ে ধরে; সময়ের সাথে সুখ চলে গেলে সুখের অহংকার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, আরো বেশী দুঃখে ফেলে আমাদের।

যে মনে রাখে *'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*। সে সাফল্যে বিনয়ী থাকে, ব্যর্থতায় ধৈর্য ধরে–আর জীবনের ঢেউয়ে ভারসাম্য রাখে। *'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*। –শুধু শব্দ নয়, জীবনের গভীর ধ্যান। এই কথাটা ভিতর থেকে অনুভব করতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো – আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোও ক্ষণিকের। এই বোধ আমাদেরকে বর্তমান মুহূর্তে স্থির থাকতে শেখায়। যেহেতু সব বদলাবেই–তাহলে এই মুহূর্তটি ঠিক যেমন আছে, তেমনই মেনে নেয়া যাক। দুঃখ আসুক – তাকে জড়িয়ে ধরি, আলিঙ্গন করি ; সে বেশিক্ষণ টিকবে না। সুখ আসুক–পূর্ণ সচেতনতায় তাকে উপভোগ করে নিই ; সেও বেশিক্ষণ থামবে না।

এই ভাবে চিন্তা যদি আমরা করতে পারি তবে আমরা দুঃখে ভেঙ্গেও পড়বো না আবার সুখের আতিশয্যে ভেসেও যাবো না, এটা আমাদের করে তুলবে স্থির ও মানসিকভাবে অনেক পরিপক্ব। এ বাক্যটি থেকে সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো - এটা অহংকার থেকে আমাদের মুক্ত করবে।

সাফল্যকে যদি আপনি নিজের মহত্ত্বের প্রমাণ ভাবেন – *'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*। মনে করলেই বুঝতে পারবেন - সাফল্যও সময়ের খেলা। আবার ব্যর্থতাকেও যদি জীবনের শেষ ভাবেন – এই একই বাক্য মনে করায়, *'এটাও সাময়িক'*। এটা বুঝতে পারলে না আপনি অহংকারে ভেসে যাবেন, না হতাশায় ডুবে যাবেন – শুধু জীবনের স্রোতের সঙ্গে বয়ে চলবেন।

কখনো জীবন আপনাকে এমন এক ঘুর্ণিবায়ে ফেলবে, মনে হবে - সব ভেঙেচুরে গেছে। না আলো আছে, না পথ। ভিতরে ফাঁকা, বাইরে অন্ধকার। এ সময়ে মানুষ নিজের ভাবনায় ধরে নেয়–*'এই তো আমার ভাগ্য, এটাই শেষ'*। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখবেন – এটাও স্থায়ী নয়। যেমন রাতের গভীর অন্ধকারের পর সূর্য ওঠে–তেমনি আপনার জীবনেও সকাল আসবে। রাত যত লম্বাই লাগুক, তার শেষ নিশ্চিত। এটাই - *'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*-র আসল বার্তা। দুঃসময় যতই বড় হোক, অনন্ত নয়–সময়েই মিলিয়ে যায়।

এই কথাটি অন্তরে বসাতে পারলে জীবনের অর্ধেক সমস্যা নিজে থেকেই হালকা হয়ে যায়। কারণ আমরা দুঃখে যতটা কষ্ট পাই, তারচেয়েও বেশি কষ্ট পাই *'এটা চিরদিন থাকবে'*–এই ভুলে। যখনই বুঝতে শিখবেন – সব বদলায়, তখনই ধৈর্য ধরতে পারা অনেক সহজ হয়ে যাবে। লড়াই করারও দরকার নেই, পালানোরও প্রয়োজন নেই, শুধু টিকে থাকতে হয়, শক্ত ধৈর্য্যের সাথে, ইতিবাচকভাবে।

এই বাক্যটা শুধু বাইরের পরিস্থিতির জন্য নয়–ভিতরের আবেগের জন্যও সমান প্রযোজ্য। রাগ আসবে-যাবে, বিষণ্নতা আসবে-যাবে, ভয় আসবে জীবনে–সময়ে সবই থিতিয়ে যাবে। আবেগগুলো ঋতুর মতো–মেঘ আসে, বৃষ্টি হয়, তারপর রোদ ওঠে। এই সত্যটা ধরতে পারলে কোনো আবেগের দাস হতে হয় না। রাগ, লজ্জা, বিষণ্নতা, আনন্দ, দুঃখ সবকিছুরই সাক্ষী হওয়া যায় এগুলোতে না জড়িয়েই।

মৃত্যু প্রসঙ্গে এ বাক্যের গুরুত্ব আরও গভীর। মৃত্যুভয় সবার মনে কোথাও না কোথাও আছে–সবাই ভাবি, মৃত্যু সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এ বাক্যটি মৃত্যুভয় থেকেও আমাদের মুক্তি দিতে পারে। মৃত্যু সত্য - তবে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে–মৃত্যুও জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতোই সাময়িক এক রূপান্তর। শরীর নশ্বর, রূপ নশ্বর–কিন্তু ভিতরের যে চেতনা–সময়-সীমার বাইরে। মৃত্যু জীবনের স্রোতের এক ধরনের পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই না। যেমন শৈশব কেটেছে, যৌবনও কাটবে–তেমনি জীবনও একদিন কেটে যাবে। যখন বুঝি–মৃত্যু এক স্টেশন–*'জীবনও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*–তখন জীবনকে আরও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি; মৃত্যুভয়ে নয়, প্রতিটি শ্বাসকে উপহার মনে করে বাঁচতে পারি। যেহেতু *'সবই একদিন অতীত হয়ে যাবে'* – বর্তমানের এ মুহূর্তটাকে প্রেমে, সচেতনতায়, আনন্দে বাঁচি–এই দৃষ্টিভঙ্গি মৃত্যুকেও উৎসবে বদলে দিতে পারে।

আমরা প্রায় সবসময় দুঃখকে এত বড় করে দেখি যে জীবনের বাকি রংগুলো চোখে পড়ে না।*'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে'*– এটি মনে রাখা মনের একটা জানালা খুলে দেয়–দেখায়, এই ভার এখনকার, চিরকালের নয়। হৃদয়ে আশার বাতি জ্বলে–এখন ব্যথা আছে, কিন্তু ব্যথা সারবে; এখন ক্ষত আছে, ক্ষত শুকাবে। এই আশাই ভেঙে পড়া থেকে বাঁচায়, চলার সাহস দেয়। এই বাক্যের আসল শক্তি এখানেই। এ বাক্য ধৈর্য্যও শেখায়–যেহেতু আমাদের জানা আছে - পরিস্থিতি বদলাবে, তাই তাড়াহুড়োয় সিদ্ধান্ত না নিয়ে শান্ত হয়ে যাই, অপেক্ষা করি–যেমন চাষী বীজ বোনার পর বৃষ্টির অপেক্ষা করে। এই ধৈর্যই উত্থান-পতনে আমাদেরকে শক্ত করে। মানুষ টিকে থাকে এই বিশ্বাসে – না হলে কেউই বড় দুঃখ সইতে পারত না।

রিলেশনশিপের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান দরকারি। আমরা মানুষের সাথে সম্পর্ককে স্থায়ী মনে করি – আমরা ভাবি, 'এ সম্পর্ক চিরকাল থাকবে"–সময়ের আবর্তে মানুষ যখন সম্পর্ক বদলে ফেলে তখন আমরা ভেঙে পড়ি। যদি আগে থেকেই মনে থাকে–'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে"–তাহলে সম্পর্কও সচেতনতার সূত্র মানবে – সম্পর্ককে আঁকড়ে না ধরে এটিকে উপভোগ করি; বদলে গেলে ভেঙ্গে না পড়ি – জীবনের স্রোতে অংশ নিই–নিজের ভিতরে স্বাধীনতা অনুভব করি। ক্ষণিকের এ যাত্রাপথে একজন সহযাত্রীর মতো তার সঙ্গ উপভোগ করি। ঠিক যেমনিভাবে যে কোন স্টেশন থেকে যে কেউ উঠে আবার যে কোন স্টেশনে নেমে যেতে পারে, তেমনি এ যাত্রাটি আমরা উপভোগ করতে পারি।

'এটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে' – শুধু একটি বাক্য নয়–জীবনের গভীরতম মন্ত্র। এটি শেখায় – সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু–সবই সাময়িক। যে এটা মেনে নেয় - তার জীবনে আর কোন বাঁধন থাকে না - সে স্বাধীন, সে হালকা, সে সব প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কোন কিছুতেই জড়ায় না - সে সাক্ষী। সে-ই সত্যিকারভাবে বাঁচে। সে জানে, প্রতিটি অভিজ্ঞতা ঢেউয়ের মতো আসে আর চলে যায় – এটাই জীবনের রহস্য, এটাই মুক্তি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই নিয়মে চলে - শতকোটি নক্ষত্র অনন্ত মহাকাশে জন্মায়-আবার নিভে যায়, গ্রহ গড়ে-ভাঙে, সুবিশাল যে গ্যালাক্সি, সেও স্থায়ী নয়–সব পরিবর্তিত হয়, সবকিছুর শুরু হয়, শেষ হয়। আমরাও সেই স্রোতেরই অংশ–আমরাও বদলাব–পরিবর্তনই আমাদের ধর্ম। তাই, ধরে রাখার কিছু নেই–সবই সাময়িক, সবই বদলায়–স্থায়ী শুধু ভিতরের সাক্ষী। সবকিছুর একটি শেষ থাকাতেই তো প্রকৃতির সৌন্দর্য–ফুল যদি শুকিয়ে না যায়, তার ঘ্রাণের দাম কে বুঝবে? রাত না কাটলে সকালকে কে স্বাগত জানাবে? পরিবর্তনই জীবনকে জীবন্ত রাখে।

এটা বুঝতে পারলে জীবন খুব মজার এক খেলায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। হারলেও কোন কষ্ট নেই, জিতলেও অহংকার নেই; জীবন জীবনের মতনই -সদা-পরিবর্তনশীল স্রোত হিসেবে বয়ে চলে। এটি গ্রহণ করতে পারলেই - জীবনে প্রশান্তি আসবে, মুক্তি মিলবে মানব আত্মার।

মানুষের জন্য ভালো কিছু করে যাওয়া

ভালো কিছু করব, কারণ এইটা প্রকৃতির নিয়মে আমার কাছে ঘুরেফিরে আসবে। একদম নিঃস্বার্থভাবে আমরা মানুষের কিছু উপকার করব। আমরা এভাবে করে চিন্তা করব না যে, আমি এখন উপকার করলাম, এটি ওই মানুষটা আবার এভাবে ফেরত দেবে। কখনো কখনো নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে উপকার করে দেখেন। কখনো anonymously মানুষকে উপকার করেন। অ্যানোনিমাস মানে, কে উপকার করেছে জানেন না। কাকে উপকার করেছেন, সেটাও আপনি ভুলে গেছেন। সেও যেন বুঝতে না পারে যে আপনি তাকে কোন রকমের উপকার করেছেন।

প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তা নিয়ম করে রেখেছেন। আপনি কারও উপকার করলে, এটা আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রকৃতিতে ঘুরতে থাকবে এবং অনেক বড় হয়ে ফিরে আসবে। অনেক অনেক গুণে ফিরে আসবে। এ রকম অনেক এক্সপেরিয়েন্স আমাদের জীবনে হয়েছে। অদ্ভুত সব ম্যাজিক আমাদের জীবনে দেখেছি। একটা শেয়ার করছি।

একটি ক্যামেরার গল্প

২০০৯ সালে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহের একটা ট্যুর প্ল্যান ছিল। বেড়াতে বেড়াতে একসময় আমরা 'তামান নিগারা' বলে একটা জায়গায় গেলাম। এটি ছিল একটি অভয়ারণ্য। প্রকৃতি তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে সে রেইনফরেস্টে আবির্ভূত। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে আমার মনে হলো ইশ!, যদি একটা ভালো ক্যামেরা থাকত! তখন আমি একটা

ফোন দিয়ে ছবি তুলছিলাম। এটা ছিল এল.জি'র একটি টাচ মোবাইল ফোন, তবে সেই সময়কার, স্মার্টফোন না। মাত্র এক মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ছিল সেটাতে। একটা ভালো ক্যামেরার খুব অভাব বোধ করছিলাম। তাই ঠিক করলাম যে ফেরার সময় একটি ক্যামেরা এখান থেকে কিনে নিয়ে যাব। আসার সময় পরিবারের লোকজন এবং অফিসের কলিগরা একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই লিস্টটি আমি খুব অনিচ্ছাকৃতভাবে এনেছিলাম এবং ভেবেছিলাম, *'এগুলো কিনব না'!* লিস্টটি ছিল বিভিন্ন রকমের কসমেটিকস, বাচ্চাদের লোশন, ক্রিম, শ্যাম্পু ইত্যাদি। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, *'এইসব আমি কিনব না, ধুর'!* লিস্টটি ব্যাগের এক কোনায় পড়ে ছিল।

ট্যুর শেষ করে যখন শহরে এলাম, তখন একটা পুরো দিন হাতে ছিল। ভাবলাম, এই দিনটা শপিং মল ঘুরে দেখি। শপিং মলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আসলে ক্যামেরা কেনা। শপিং মলে ঘুরতে ঘুরতে অলিম্পাস এর একটা ক্যামেরা খুব পছন্দ হলো। ক্যামেরার দাম ৬০০ রিঙ্গিত। আমার কাছে ছিল ৭০০ বা ৭৫০ রিঙ্গিত। ভাবলাম, 'এই টাকাটা দিয়ে যদি ক্যামেরা কিনে ফেলি, তাহলে আমার খুব টানাটানি হয়ে যাবে, হাতে কোন টাকাই থাকবে না। কাল যদি কোন সমস্যা হয়, কোন কারণে ফ্লাইট ক্যানসেল বা অন্য কোন ঝামেলা হয় তাহলে আমি মহাবিপদে পড়ে যাবো। মনটা কিন্তু মানতে পারছিল না। মন বারবার বলছিল, *'ক্যামেরা কিনে ফেলো, কোন সমস্যা হবে না'*। ক্যামেরাটা দেখে, নেড়েচেড়ে কাউন্টারে রেখে একটু সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

সামনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটি শ্যাম্পুর বোতলের দিকে চোখ পড়ল। নামটা খুব পরিচিত মনে হলো। পকেট থেকে লিস্ট বের করে দেখলাম, এক্সাক্ট সেই শ্যাম্পু এবং অনেক সস্তা। ভাবলাম দু-একটা জিনিস হলেও কিনি। আশেপাশে লিস্টের আরও কিছু জিনিস দেখলাম।



আনমনে একটি শপিং কার্ট নিয়ে সব জিনিস নামিয়ে ফেললাম। পুরো কার্ট ভর্তি হয়ে গেল। হিসাব করে দেখলাম, এগুলো কিনলে আর ক্যামেরা কেনা যাবে না, তবে হাতে কিছু টাকা থাকবে। আবার ক্যামেরা কিনলে এগুলো একটাও কেনা যাবে না। আমি দোটানায় পড়ে গেলাম।

শপিং কার্ট-টি রেখে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে গেলাম। শো-কেস থেকে ক্যামেরা বের করে হাতে নিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি - 'ক্যামেরাই কিনবো'। পকেটে হাত পর্যন্ত দিয়েছি টাকা বের করার জন্য। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, শপিং কার্টে রাখা বাচ্চাদের লোশন আর পাউডারের দিকে চোখ আটকে গেল। মনে হলো, *'ক্যামেরা কিনলে আমি একা খুশি হব। কিন্তু এই জিনিসগুলো কিনলে অনেক মানুষ খুশি হবে। দেশে ফিরে সবার আগে ক্যামেরা কিনবো'।* এই চিন্তা মাথায় আসতেই ক্যামেরা রেখে কার্ট নিয়ে এলাম।

বাচ্চাদের জন্য চকলেট কিনে হোটেলের লবিতে এসে বসে জিনিসগুলো গুছাতে লাগলাম। লবিতে এক ভদ্রলোক আমাকে অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলেন। তিনি উঠে এসে বললেন, *'এগুলো আপনি এভাবে নিতে পারবেন না। এয়ারপোর্টে ফেলে দেবে'।* আমার মাথায় হাত ! বললাম, *'তাহলে কী করব'?* তিনি বললেন, *'আপনাকে একটা লাগেজ কিনতে হবে'।* কী আর করা - তাঁর সাথে মাইদিনে (শপিং মল যেখান থেকে এত কিছু কিনে এনেছি) গিয়ে একটা বড় লাগেজ কিনলাম।

হোটেলে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন তাকে বললাম, *'আমি আসলে এগুলো কিনতে চাইনি, ক্যামেরা কিনতে চেয়েছিলাম'।*

তিনি বললেন, 'ক্যামেরা? ক্যামেরার দাম কত?' আমি বললাম *'৬০০ রিঙ্গিত'।* তিনি বললেন, *'ক্যামেরা তো ৩০০ রিঙ্গিতেও পাওয়া যায়'!* আমি অবাক। বললাম, *'৩০০ রিঙ্গিত! ৩০০ রিঙ্গিত তো আমার কাছে আছে ! তাহলে তো ক্যামেরাও কেনা যাবে'।* সে তৎক্ষণাৎ পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'সনি'র ২৯৯ রিঙ্গিতের ক্যামেরা দেখাল। সে রাতেই সেই দোকানে গিয়ে

হাজির হলাম। সত্যি সত্যিই সেইম মেগাপিক্সেল, সেইম পাওয়ার, শুধু ব্যাটারি প্যাকের জায়গায় চারটা পেনসিল ব্যাটারি লাগত। আমি সেই ক্যামেরা, তার সাথে মেমোরি কার্ড, রিচার্জেবল ব্যাটারী, চার্জার কিনে মহানন্দে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, লেকিন - 'ক্লাইম্যাক্স আভি বাকি হ্যায়, মেরে দোস্ত।' মাস ছয়েক পরে এক বন্ধু ক্যামেরাটা চাইলেন। তাঁকে দিলাম। কয়েক মাস পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, *'আপনার জন্য একটা ভালো খবর আছে, একটা খারাপ খবর। কোনটা আগে শুনবেন'?* বললাম, *'খারাপটা আগে বলুন'।* তিনি বললেন, *'আপনার ক্যামেরা সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে চুরি হয়ে গেছে'।* আর, ভালো খবর? *'আমি আপনাকে একটা নতুন ক্যামেরা কিনে দিচ্ছি'।* আমরা গিয়ে ক্যামেরা কিনলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ক্যামেরা ছিল সেই ৬০০ রিঙ্গিতের ক্যামেরা, যেটি আমি সবার আগে পছন্দ করেছিলাম !

আপনি যদি মানুষের কথা চিন্তা করেন, সৃষ্টিকর্তা আপনার কথা চিন্তা করবেন। ডিভাইন শক্তি আপনার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে। এটা আমাদের জীবনে ম্যাজিকের মতো ঘটে। বন্ধুরা, এই শিক্ষা যদি আমরা পাই, তাহলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। অনেক স্ট্রেস ফ্রি হয়ে যায়।

পড়ার অভ্যাস তৈরি করা

এ পর্বের শেষে আমরা আপনাদেরকে যে পরামর্শটা দেব, সেটা হচ্ছে রিডিং হ্যাবিট তৈরি করা। প্রতিদিন যেন কিছু না কিছু আপনি পড়েন। যেকোনো জিনিস–গল্প হোক, কবিতা হোক, প্রবন্ধ হোক, ভালো জিনিস হোক, জ্ঞানের জিনিস হোক।

লার্ণ আনলার্ণ রি-লার্ণ চক্র - আরেকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, লার্ন-আনলার্ন-রি-লার্ন - এই সাইকেলের ভেতর দিয়ে নিজেকে নিয়ে

যাওয়া–লার্ন, আনলার্ন, রি-লার্ন। আপনি যা শিখেছেন, সব ঠিক না। মাথা সবসময় নতুন জিনিসের জন্য খোলা রাখবেন। আপনি যখন আরও পড়তে থাকবেন, তখন দেখবেন যে আগের অনেক জিনিস, অনেক আইডিয়া ভুল প্রমাণিত হবে। তখন সেগুলো আনলার্ন করে ফেলবেন। আবার রি-লার্ন করবেন, নতুন জিনিস শিখবেন। আবার আনলার্ন করবেন, আবার রি-লার্ন করবেন। এই জার্নিটা অসম্ভব রকমের মজার। আপনার জীবন সিম্পলি দারুণ হয়ে যাবে।

এই সাইকেলটা আমরা চালু রাখবো। আমরা বিভিন্ন ধরনের বই পড়ব। সবার কথা শুনব, কিন্তু মানবো নিজের কথা। মানুষের কথায় ইনফ্লুয়েন্সড হব না, মানুষের কথায় পরিচালিত হব না। আমি নিজে ভেবে যেটা বের করব, সেইভাবে পরিচালিত হব। নিজের সিদ্ধান্তে ভুল হলেও কোন সমস্যা নেই। ভুল থেকে শিখবো।

আমাদেরকে সাহায্য করবে আমাদের বই। আমাদেরকে সাহায্য করবে আমাদের আশপাশের মানুষ। আমাদের পরিবেশ আমাদের সাহায্য করবে। শিখতে থাকবেন। মাথা খোলা রাখবেন। মাথা যত খোলা রাখবেন, স্ট্রেস তত কম থাকবে। তত মজায় আপনি থাকবেন।

রিলিজিয়ন, হিস্ট্রি, ফিকশন, নন-ফিকশন, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স, ফিলোসফি–যা ইচ্ছা তাই পড়ুন। সবকিছু পড়ুন। হ্যাভ এ স্ট্রেসলেস লাইফ। হ্যাভ এ কন্ট্রোলড লাইফ। আপনি নিঃসন্দেহে ভালো থাকবেন।

ব্যস্ত হয়ে যাওয়া - এত বেশি ব্যস্ত হয়ে যান যে স্ট্রেসের জন্য যেন সময় না থাকে। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিন। কাজ করার যে মজা, সেই মজাটা আপনি নিয়ে নিন পৃথিবী থেকে। এখানে আপনি একবার মাত্র বাঁচবেন, এরপর কোথায় চলে যাবেন সেটা কেউ জানে না।

নিজেকে এত বেশি ব্যস্ত করে ফেলুন যাতে আপনি পৃথিবীতে একটা ছাপ ফেলে যেতে পারেন। মানুষ আপনাকে মনে রাখুক না রাখুক,

সৃষ্টিকর্তা যেন আপনাকে বলেন যে আপনাকে পাঠানো হয়েছিল, আপনি কিছু ভালো কাজ করে এসেছেন।

কাজে মনোযোগ দেয়া - আপনার জীবনের স্বপ্নটা কী? সে স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিন। ব্যস্ত হয়ে যান, পজিটিভ একটা ওয়ার্ক ফ্লো-র ভেতরে ঢুকে যান। তাহলে আপনার জীবনে আর স্ট্রেস আসার সময় পাবে না।

আশেপাশে অনেক রকমের মানুষ থাকবে। তাদেরকে ওভারলুক করেন। পাশ কাটিয়ে চলে যান। সবার সাথে কনফ্লিক্ট করার দরকার নেই। আপনি রাস্তায় যদি গাড়ি বের করেন আর যদি সবার সাথে ধাক্কা লাগান তাহলে কী অবস্থা হবে? আপনি কী করেন রাস্তায় বের হলে? আপনি কি ধাক্কা লাগান? ধাক্কা লাগান না। আপনি খুব যত্নের সাথে পাশ কাটিয়ে চলে যান যাতে কারও সাথে কনফ্লিক্ট না হয়। আপনার জীবনের চলার পথেও এই রকমের মাইন্ডসেট রাখতে হবে। এমন একটা মাইন্ডসেট আমাদের রাখতে হবে যে 'আমি কনফ্লিক্ট করব না। ভাই, আমার গাড়িটা ভালো থাকতে হবে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে এই গাড়িটা নিয়ে।'

বন্ধুরা, আশা করি টিপ্সগুলো আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। মেন্টাল হেলথের জন্য কিছু ঝামেলা থাকবেই। এটাকেই দুনিয়া বলে। ঝামেলা ছাড়া কিছু হবে না। ঝামেলা যদি না থাকে তাহলে আসলে বেঁচে থাকার কী মজা আছে? আপনি চিন্তা করতে পারেন–ঝামেলা ছাড়া জীবন আসলে কী? আপনি যদি সবকিছু আজকে পেয়ে যান, যা চান সবকিছু আজকে দিয়ে দেওয়া হয়, আপনি বেশি দিন এটাকে উপভোগ করতে পারবেন না। আপনার লাইফ অসম্ভব রকমের বোরিং হয়ে যাবে। এই ঝামেলাগুলো আমাদের জীবনে আছে বলেই জীবনে এত সুন্দর। এই ঝামেলাগুলো পৃথিবীতে থাকবেই। বরং এই ঝামেলাগুলো আপনার জন্য উপকারী।

আপনি খেয়াল করে দেখুন, আপনার জীবনে এমন কিছু ঝামেলা হয়েছিল যেগুলো আপনার মনে হয়েছিল যে এগুলো কেন জীবনে এলো;

আজকে যখন পেছনে ফিরে তাকান, তখন মনে হয় যে এই ঝামেলা গুলোর অবশ্যই দরকার ছিল। না হলে আমি আজকে যা হয়েছি সেটা হতে পারতাম না। এই ঝামেলাগুলোর কন্ট্রিবিউশন ছিল।

সো, গিভ থ্যাংকস টু দোস ঝামেলাস। সবকিছু ভালোর জন্য হয়। যা কিছু হয়, ভালোর জন্য হয়। সব আল্লাহর তরফ থেকে হয়। আমাদের মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে। দ্যাট ইজ ওকে। এটাকেই দুনিয়া বলে।

অ্যাকশন প্ল্যানিং

আমি একজন টাইপ এ / টাইপ বি মানুষ	A	B
অহংকার ও আত্মসম্মানবোধ আমার একই জিনিস মনে হয়	হ্যাঁ	না
আমার সেন্স অফ হিউমার নিয়ে আমি সন্তুষ্ট	হ্যাঁ	না
আমি মাঝে মাঝেই একা একা বেড়াতে যাই	হ্যাঁ	না
আমি প্রায়ই নিজের সাথে অন্যের তুলনা করি	হ্যাঁ	না
লোকে যদি কিছু বলে - আমি সেই ভয়ে থাকি	হ্যাঁ	না
মানুষকে মাফ করে দিতে আমার কষ্ট হয়	হ্যাঁ	না
আমি মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে ভালোবাসি	হ্যাঁ	না
আমার নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস আছে	হ্যাঁ	না
আমি কাজে আলসেমি করি	হ্যাঁ	না

ওপরের হ্যাঁ/না উত্তরের উপর ভিত্তি করে আপনি নিজের উন্নতির জন্য কাজ শুরু করতে পারেন।

রাগ নিয়ন্ত্রণ - স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে একটি বড় ফ্যাক্টর

রাহুল ছিল আমাদের অফিসের সবচেয়ে দক্ষ মানুষদের একজন। প্রেজেন্টেশনে অসাধারণ, ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্টে পারদর্শী, আর তার প্রজেক্ট ডেলিভারির রেকর্ড ছিল দুর্দান্ত। কিন্তু একটা সমস্যা তার পিছু ছাড়ত না–রাগ। ছোটখাটো বিষয়ে তার রাগ এমনভাবে বেড়ে যেত যে পুরো টিম তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইত।

একদিন অফিসের একটি মিটিংয়ে জুনিয়র টিম মেম্বারের একটি সামান্য ভুলের কারণে রাহুল এমনভাবে চিৎকার করল যে মিটিং মাঝপথেই থেমে গেল। টিম লিডার রাহুলকে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠালেন।

ম্যানেজার বললেন, *'রাহুল, তোমার দক্ষতা নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তোমার রাগ যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে সেটা তোমার ক্যারিয়ারকেই ধ্বংস করবে। আমি নিজেও একসময় তোমার মতো রাগ করতাম। আমার একটা গল্প শোনো'।*

'আমার প্রথম চাকরির সময়, আমি একটা বড় প্রজেক্টে লিড করছিলাম। একটা ছোট ভুলের জন্য আমি আমার পুরো টিমের সাথে চিৎকার করলাম। কিন্তু জানো, ভুলটা আসলে আমার নিজের ছিল। টিমের মনোবল ভেঙে গেল। তারা সবাই মিলে আমার নামে মেনেজমেন্টে কমপ্লেইন করল। আমাকে শো-কজ করা হলো এবং পরবর্তীতে কৌশলে আমাকে সেই চাকরি থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়। যাওয়ার সময় আমার বস আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি রাগ নিয়ে কাজ করো, রাগই তোমার নিয়ন্ত্রণ নেবে।' আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম এবং রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতে শুরু করলাম'।

যাত্রাটি সহজ ছিল না। আমি সবার প্রথমে নিজেকে এনালাইসিস করতে বসলাম। নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম - *'কেন তুমি কথায় কথায় রেগে যাও? উত্তর আসল - আমি ছোটবেলা থেকেই রাগী'।*

তখন আমি নিজেকে আবার জিজ্ঞেস করলাম - তুমি কি সবার সাথেই কথায় কথায় রেগে যাও নাকি শুধু তোমার অধস্তনদের সাথে? তাইতো, আমি তো বসদের সাথে রাগ দেখাই না, যদিও প্রায়ই তাদের সাথে আমার মতের অমিল হয়।

এভাবে নিজের সাথে কথা বললাম। ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করে রাগের কারণ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো জানলাম এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করলাম। ফলাফল আজকের এই আমি। পরিবর্তনটা দেখতেই পাচ্ছো।

শোন রাহুল, মানুষ এবং ম্যাচের কাঠির মধ্যে একটি মিল আছে - কী সেটা? মানুষেরও একটি মাথা আছে, ম্যাচের কাঠিরও মাথা আছে। কিন্তু ম্যাচের কাঠি ঘষা লাগলে জ্বলে ওঠে কারণ সেটি ম্যাচের কাঠির মাথা, সেখানে কোন ব্রেইন নেই। মানুষের মাথায় কিন্তু ঘিলু আছে, তাই কনফ্লিক্টে সে জ্বলে উঠবে না। ওঠা উচিৎ না কারণ সে একজন মানুষ। সৃষ্টির সেরা - সে কোন ম্যাচের কাঠি না। চল এখন কীভাবে এই হঠাৎ রাগটিকে ম্যানেজ করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলি'।

রাহুল মাথা নিচু করে ম্যানেজারের কথা শুনছিল। ম্যানেজার বললেন, *'তোমার জন্য সমাধান আছে। তুমি চাইলেই নিজেকে বদলাতে পারো। রাগকে তোমার শক্তিতে পরিণত করো'।*

রাগ কেন হয়: কারণ খুঁজে বের করা

আমরা যখন মনে করি পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন রাগ তৈরি হয়। কিন্তু রাগ মানেই শক্তি হারানো নয়। বরং এটি একটি শক্তিশালী অনুভূতি, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে।



রাগ সাধারণত কয়েকটি কারণে বেড়ে যায়:

১. অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি : যখন কোন কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না।

২. নিজের সীমাবদ্ধতা : নিজের ক্ষমতার চেয়ে বেশি চাপ নিচ্ছি - মনে হলে

৩. অপরের আচরণ : অন্যের কথা বা কাজ আমাদের সাথে না মিললে

৪. ছোটবেলা থেকেই আমার রাগ বেশি সেই (ভুল) ধারণা।

৫. ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স : নিজেকে ক্রমাগত ছোট মনে করা, আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আগেই আক্রমণ করা।

রাগ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবসম্মত কৌশল

ম্যানেজার রাহুলকে কিছু কার্যকর কৌশল শিখিয়ে দিলেন। চলুন, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলি।

১. স্টপ-থিংক-রেসপন্ড : থামো, ভাবো, উত্তর দাও।

রাগ ওঠার সাথে সাথেই কথা বলা বা কাজ করার আগে কয়েক সেকেন্ড থামুন। ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড সময় নিন। ভাবুন, এই মুহূর্তে আপনার রাগের কারণ কী?

আপনি কী বলতে যাচ্ছেন? এতে পরিস্থিতি শান্ত হবে। প্রো-এ্যাকটিভ বিহেভিয়ার, মনে আছে তো?

রাহুল এই কৌশলটা প্রয়োগ করা শুরু করল। প্রথম কয়েকবার ভুল করল, কিন্তু পরে দেখল তার কথার প্রভাব অনেক বেশি ইতিবাচক হচ্ছে।

২. 'রাগের ডায়েরি' রাখা।

আপনার রাগ কখন হয়, কেন হয়, এবং কীভাবে সেটি সামলানোর চেষ্টা করেন, সেটা লিখে রাখুন। এক মাস পরে সেই ডায়েরি দেখুন। এতে আপনি রাগের উৎস এবং সেটি সামলানোর উপায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

৩. বিরতির কৌশল ব্যবহার করা।

রাগ ওঠার মুহূর্তে একটি শারীরিক কাজ করুন। পানি খান, বাইরে একটু হাঁটুন, অথবা জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখুন। এতে আপনার মন অন্যদিকে সরে যাবে এবং রাগ কমে আসবে।

৪. রাগের শক্তিকে কাজে লাগানো।

রাগকে কখনো দমন করবেন না। বরং এটিকে আপনার লক্ষ্য অর্জনের অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করুন। মনে রাখুন, রাগ যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে সেটি আপনার কাজের গতি বাড়িয়ে দিতে পারে।

৫. অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা।

যে বা যা আপনাকে রাগাচ্ছে, তার জায়গা থেকে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করুন। এতে আপনি বুঝতে পারবেন, হয়তো অপর পক্ষ ইচ্ছা করেই এমন কিছু করেনি।

খুব ধীরে ধীরে কিন্তু অবধারিতভাবে রাহুল তার রাগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল। তার টিম এখন তাকে আরও বেশি পছন্দ করে। রাগের সময় ধৈর্য ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তার ক্যারিয়ারে নতুন গতি এনেছে।

আরেকটি কাজ করে দেখতে পারেন, দারুণ কাজ করে -

রাগের মুহূর্তে ওই স্থান ত্যাগ করা

অন্য কোন রুমে চলে যান। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি নদীর ধারে বসে আছেন। পানির শব্দ শুনছেন। পাখির ডাক শুনছেন। আপনার চারপাশে সব শান্ত। কিছুক্ষণ পর আপনি অনুভব করবেন, আপনার রাগ একেবারেই কমে গেছে।

রাগ হলো একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এটি লুকানোর চেষ্টা না করে সঠিক কৌশল প্রয়োগ করে রাগকে শক্তিতে পরিণত করতে পারি আমরা।

নীরবতার শক্তি - Power of Silance

'কখনো কখনো নীরব থাকা কথা বলে জিতে যাবার চেয়েও বেশী শক্তিশালী - এ কথা বোঝার মতো পরিপক্কতা অর্জন করুন'

- থিমা ডেভিস

স্টেস ও অ্যাংগার ম্যানেজমেন্টে গভীর এক শক্তির নাম - নীরবতা - চুপ থাকা। জবাব দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। চুপ থাকা মানে হেরে যাওয়া নয়; বরং উপলব্ধির জায়গা তৈরি করা। এ পর্বে আমরা দেখবো চুপ থাকার শক্তি কীভাবে কাজ করে, কখন এটি অপরিমেয় শক্তি হয়ে ওঠে।

নীরবতা দুর্বলতা নয়, প্রাপ্তি - অনেকেই ভাবেন, চুপ থাকা মানে হার মেনে যাওয়া, সবসময় তা নয় বরং কখনো কখনো চুপ থাকা মানে ঝগড়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়া। একটা ছোট্ট নীরবতা, একটুখানি সবর - সম্পর্ক নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। যে পরিস্থিতিতে আপনি চীৎকার করে ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে ফেলতে পারতেন, সে একই পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে সংযত রেখে যদি বলতে পারেন - 'আপনি আমার সাথে রূঢ় আচরণ করছেন' - পরিস্থিতি পুরোপুরি আপনার কন্ট্রোলে চলে আসতে বাধ্য।

মানসিক সুস্থতায় নীরবতার ভূমিকা - চুপ থাকা আমাদের ভেতরের কগনিটিভ কোলাহল কমিয়ে দেয়। মাথায় একসাথে দশটা চিন্তা চললে আমরা সিদ্ধান্তে ভুল করি, আবেগে ভেসে যাই। সামান্য নীরবতা–একটি দীর্ঘ শ্বাস, চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকা – মস্তিষ্ককে জানায় : *'সব ঠিক আছে; তাড়াহুড়া নয়, All is well'* এতে উত্তেজনা কিছুটা কমে, চিন্তা পরিষ্কার হয়। আমরা প্রতিক্রিয়া reaction না দিয়ে উত্তর response বেছে নিতে পারি। ফলাফল সবসময় ইতিবাচক হয়।

আরেকটি সূক্ষ্ম লাভ হলো আত্মপর্যবেক্ষণ। চুপ থাকলে বোঝা যায়–আমি কি সত্যিই অপমানিত হয়েছি, নাকি ক্লান্তি, ভয় বা হতাশা আমাকে সংবেদনশীল করে তুলেছে। এই ভেতরের আলাপটা শব্দের ভিড়ে শোনা যায় না; নীরবতার ফাঁকে সে নিজেই উঠে আসে। যে ব্যক্তি নিজের অনুভূতিকে চিনতে পারে, সে অন্যের অনুভূতিও ভালো শুনতে পারে–এটাই পরিণত আবেগ-চিন্তার লক্ষণ।

সম্পর্কের উন্নতি - বেশিরভাগ সম্পর্ক ভাঙে কথার অভাবে নয়; অতিকথন ও না-শোনার কারণে। আপনি যখন কারও কথা থামিয়ে উত্তর দেন না, বরং স্পেস দেন–তখন সে ব্যক্তি নিরাপদ বোধ করে, তার কথার ভেতরের কথা বেরিয়ে আসে। অনেক আঘাতজনক বাক্যের পিছনে থাকে ভয়, অবহেলার অভিজ্ঞতা কিংবা অদেখা ক্লান্তি। নীরবতা আড়ালের সেই দরজা খুলে দেয়।

তবে সতর্কতা জরুরি: চুপ থাকা যেন সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট না হয়ে যায়। 'সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট' হলো শাস্তি–অন্যজনকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কথা বন্ধ রাখা। আর সুস্থ নীরবতা হলো সম্মতিতে নেওয়া বিরতি– *'এখন আবেগ বেশি, পরে শান্ত হয়ে কথা বলি'*। প্রথমটি দেয়াল তোলে, দ্বিতীয়টি সেতু বানায়।

আত্মসম্মান ও আবেগের সীমানা - চুপ থাকা অনেক সময় সীমা টানার এক মার্জিত উপায়। আপনি যখন ইচ্ছাকৃত আঘাতের মুখে শান্ত থাকেন, তখন বার্তাটি স্পষ্ট হয় – *'আমার মর্যাদা আমি নিজে ধরে রাখি; তোমার আবেগের ঝড়ে ভেসে যাব না'*। এ নীরবতা কখনোই অন্যায়ের সমর্থন নয়; বরং সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলার প্রস্তুতি। প্রয়োজন হলে নীরবতা শেষে স্বচ্ছভাবে বলা যায়– *'তোমার এ ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা শান্ত হলে কথা বলব'*।

রাগের মাথায় বলা একটি বাক্য এমনকি সারা জীবনের সম্পর্ক ক্ষয় করতে পারে। চুপ থাকা অনেক সময় ভবিষ্যতের কথোপকথনকে বাঁচানো। আপনি যখন বলেন– *'আমি এখনই উত্তর দিলে কঠিন কথা বলে ফেলবো; একটু পরে শান্ত হয়ে বলি'* – তখন আপনি সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না; বরং গুরুত্ব দিচ্ছেন, যাতে সমাধানের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়। শান্ত সময়ে আলোচনায় বসলে সত্যও কোমল হয়, আর কোমল সত্যই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়।

কখন চুপ থাকা উচিত নয় - সব নীরবতা গুণ নয়। অপমান, সহিংসতা, নির্যাতন–এসবের মুখে চুপ থাকা নিরাপদ বা ন্যায্য নয়। সেখানে স্পষ্ট সীমা, সহায়তা চাওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ–এসবই প্রয়োজন। সুস্থ নীরবতা কখনো অন্যায়ের অংশীদার হয় না; বরং শক্ত অবস্থান নেওয়ার আগে ক্ষণিকের স্বচ্ছতা এনে দেয়।

একটি হাদিস বলে এ পর্ব শেষ করি।

হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (স.) - কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (স.) তাহলে প্রকৃত বীর কে? তিনি বললেন - প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির ব্যবহার

আজ আমরা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছি। প্রায় সব কাজেই আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কেন সেটি ব্যবহার করা যাবে না? অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি মানুষের চেয়েও সুন্দরভাবে মানসিক চাপ নিয়ন্তণে সাহায্য করতে পারে।

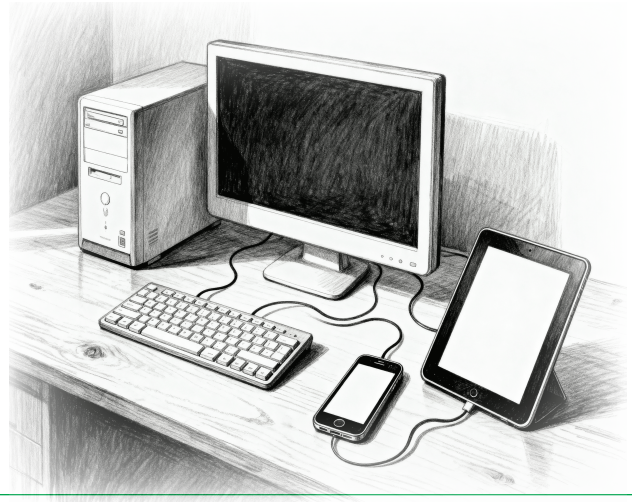

মানসিক প্রশান্তির বিভিন্ন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট

প্রযুক্তি দিয়ে আজ আমরা ঘিরে আছি। এটি আমাদের জীবনের সাথে মিলে মিশে গেছে। যখন সকালে ঘুম ভাঙে, প্রথমে হাতে নেওয়া স্মার্টফোনটি থেকে শুরু করে দিনশেষে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত, প্রযুক্তি প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সঙ্গী। প্রযুক্তি শুধু আমাদের জীবনকে সহজ করে দেয়নি, বরং স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এনেছে নতুন দিগন্ত। আপনার স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

মাইন্ডফুলনেস ও মেডিটেশনের অ্যাপ

মাইন্ডফুলনেস ও মেডিটেশন অ্যাপগুলো আজকাল স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। Headspace, Cam, Insight Timer এর মতো অ্যাপগুলো ব্যবহার করে আপনি গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান, এবং ইতিবাচক চিন্তাধারার চর্চা করতে পারেন। এগুলো কেবল আপনার মানসিক শান্তি ফেরাবে না, বরং স্ট্রেস সামলানোর একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

অনলাইন কাউন্সেলিং ও থেরাপি প্ল্যাটফর্ম

আজকাল মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা সহজ হয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে। Talkspace, Better health এর মতো প্ল্যাটফর্মে পেশাদার থেরাপিস্টদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। এই সেবা শুধু সুবিধাজনক নয়, বরং যারা সামনাসামনি কাউন্সেলিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার সমাধান।

পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ডিভাইস

স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ফিটনেস ট্র্যাকার ও স্মার্টওয়াচের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আপনার হৃদস্পন্দন, ঘুমের গুণগত মান এবং

দৈনিক হাঁটার হিসাব রাখতে সাহায্য করে। এই ডেটাগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার শারীরিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন এবং স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে প্রভাবশালী পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

সোশ্যাল কানেক্টিভিটি

সামাজিক সংযোগ বজায় রাখা স্ট্রেস কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রযুক্তি এই সংযোগ আরও সহজ করে দিয়েছে। ভিডিও কল, চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম, এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আপনি দূরে থেকেও কাছের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। তবে এর সঠিক এবং সীমিত ব্যবহার স্ট্রেস কমাতে কার্যকর।

টাইম ম্যানেজমেন্ট টুল

প্রযুক্তি টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য অসংখ্য কার্যকর টুল এনে দিয়েছে। Trello, Asana, Google Calendar এর মতো অ্যাপ ব্যবহার করে আপনি আপনার কাজের তালিকা তৈরি করতে এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন। কাজগুলো যখন সময়মতো হয়ে যাবে, কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসের মাত্রাও অনেকাংশে কমবে।

অনলাইন শিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট

জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক সময় স্ট্রেসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রযুক্তি এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক অমূল্য হাতিয়ার। Coursera, Udemy, Skillshare এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি নতুন নতুন স্কিল শিখতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করবে।

স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (চ্যাটজিপিটি)'র ভূমিকা

স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলো একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই উদ্ভাবন মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা ও মানসিক চাপ সামলাতে অসাধারণভাবে সহায়তা করতে পারে।

চ্যাটজিপিটির মতো এ.আই মডেলগুলো কেবল তথ্যপ্রযুক্তি টুল নয়; এটি এমন এক ভার্চুয়াল সহকারী, যা আপনার মানসিক চাপ কমানোর যাত্রায় বন্ধু হিসেবে কাজ করতে পারে। আসুন, দেখে নিই কীভাবে চ্যাটজিপিটি স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

চ্যাটজিপিটিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম - *'তুমি কীভাবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে মানুষকে সাপোর্ট দিতে পারো'?* নিচের কথাগুলো চ্যাটজিপিটি আমাকে বলেছে-

মানসিক সাপোর্ট দেওয়া

চ্যাটজিপিটি কখনো বিচার করে না, কখনো বিরক্ত হয় না। এটি যেকোনো সময়ে আপনার সমস্যার কথা শুনতে প্রস্তুত। মানসিক চাপের মুহূর্তে এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। এটি সহমর্মিতার সঙ্গে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং আপনাকে মানসিক প্রশান্তি দেয়।

সময় ব্যবস্থাপনায় সহায়তা

স্ট্রেসের একটি বড় কারণ হলো সময় ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা। চ্যাটজিপিটি আপনার সময় ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অসাধারণ টুল। এটি আপনার কাজের তালিকা তৈরি করতে, কাজের গুরুত্ব নির্ধারণে এবং কার্যকর পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।

মেডিটেশন ও রিল্যাক্সেশন গাইড

চ্যাটজিপিটি মানসিক প্রশান্তি বাড়ানোর জন্য মেডিটেশন বা রিল্যাক্সেশন চর্চার গাইডলাইন দিতে পারে। এটি গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের টেকনিক, বডি স্ক্যান, অথবা ধ্যানের পদ্ধতি শেখাতে পারে, যা স্ট্রেস কমাতে কার্যকর।

শিক্ষামূলক রিসোর্স প্রদান

চ্যাটজিপিটি স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এটি বই, আর্টিকেল, বা ভিডিওর পরামর্শ দিয়ে আপনাকে স্ট্রেস ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।

সহানুভূতিপূর্ণ কথোপকথন

একাকিত্ব এবং মানসিক চাপের সময় চ্যাটজিপিটি একজন সঙ্গীর ভূমিকা পালন করে। এটি আপনার সঙ্গে কথা বলে, উৎসাহ দেয় এবং ইতিবাচক চিন্তা করতে সাহায্য করে। অনেক সময়, কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই আপনি হালকা অনুভব করতে পারেন।

ব্যক্তিগত কাস্টমাইজড পরিকল্পনা

আপনার জীবনযাত্রা এবং স্ট্রেসের কারণ বুঝে চ্যাটজিপিটি একটি কাস্টমাইজড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দিতে পারে। এটি আপনার স্ট্রেসের ধরন, আপনার লক্ষ্য, এবং আপনার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম।

সতর্কতা

চ্যাটজিপিটি আপনার মানসিক চাপ কমানোর সহায়ক হতে পারে, তবে এটি একজন পেশাদার মনোবিজ্ঞানী বা থেরাপিস্টের বিকল্প নয়। গুরুতর মানসিক সমস্যা বা দীর্ঘস্থায়ী চাপের ক্ষেত্রে পেশাদার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

চ্যাটজিপিটি প্রযুক্তির এমন একটি উদাহরণ, যা মানুষের জীবনকে সহজ, আরামদায়ক, এবং চাপমুক্ত করতে সাহায্য করে। এটি আপনার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে স্ট্রেসকে সামলাতে সাহায্য করতে পারে, যদি আপনি এটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। এর সাহায্যে আমরা একটি মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর এবং স্ট্রেস মুক্ত জীবনযাপন করতে পারি।

স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা

প্রযুক্তির যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি অসাবধানতার কারণে এটি স্ট্রেস বাড়াতেও পারে। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম, অনলাইন আসক্তি, এবং নোটিফিকেশনের চাপ অনেক সময় আমাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে। তাই প্রযুক্তির ব্যবহার হতে হবে নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক উদ্দেশ্যে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে এটি স্ট্রেসকে জয় করার একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে আরও সমৃদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারি। এটি আমাদের জীবনকে শুধু সহজ করে তোলে না, বরং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

কখন একজন প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট/ সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে

স্ট্রেস জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে কখনো কখনো এটি এমন এক স্তরে পৌঁছে যেতে পারে যখন পেশাদারের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আপনার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর স্ট্রেসের প্রভাব যদি অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন এটি আর স্বাভাবিক চাপের মধ্যে থাকে না। চলুন দেখে নিই, কোন পরিস্থিতিতে পেশাদারের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

দীর্ঘস্থায়ী এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ

যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ অনুভব করেন এবং এটি আপনার দৈনন্দিন কাজ, সম্পর্ক, বা ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে, তাহলে পেশাদারের সাহায্য নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসের কারণে অবসাদ, উদ্বেগ বা হতাশা দেখা দিতে পারে।

শারীরিক লক্ষণ দেখা দিলে

স্ট্রেসের কারণে যদি আপনার শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, যেমন : ঘনঘন মাথাব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, হজমের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা বা অতিরিক্ত ঘুমানো, তাহলে এটি অ্যালার্মিং। এই লক্ষণগুলো অবহেলা করলে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে।

যদি আপনি নিজের অনুভূতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারান

আপনি যদি অনুভব করেন যে, আপনি খুব সহজেই রেগে যাচ্ছেন, ছোটখাটো বিষয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করছেন, অথবা কান্না আটকে রাখতে পারছেন না, তাহলে এটি একটি সংকেত হতে পারে যে আপনার একজন পেশাদারের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

একাকিত্ব বা সামাজিক সম্পর্কের অবনতি

যদি স্ট্রেসের কারণে আপনি মানুষজনের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারছেন না, একাকিত্ব অনুভব করছেন, বা অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তাহলে এটি একটি সিরিয়াস সিগনাল। সম্পর্কের অবনতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

কাজ বা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে না পারা

যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে, স্ট্রেসের কারণে আপনার কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন, সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হচ্ছে, অথবা উৎপাদনশীলতা কমে গেছে, তবে পেশাদারের সাহায্য নেওয়া উচিত।

নেশার প্রতি আসক্তি

যদি স্ট্রেস সামলাতে আপনি মদ, ধূমপান, বা অন্য কোনো নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে এটি অবশ্যই পেশাদারের শরণাপন্ন হওয়ার সময়। নেশা সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর।

যদি আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করেন

আপনার যদি মনে হয় যে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েছে বা আত্মহত্যার মতো চিন্তা মাথায় আসছে, এটি একটি জরুরি অবস্থা। অবিলম্বে পেশাদারের শরণাপন্ন হতে হবে। কাছের বন্ধু বা পরিবারের সাথে বিষয়টি শেয়ার করতে দ্বিধা করবেন না এবং দ্রুত সঠিক সাহায্য নিন।

আত্মবিশ্বাস বা আত্মসম্মানের ঘাটতি

যদি আপনি বারবার নিজের উপর সন্দেহ করেন, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, বা নিজেকে তুচ্ছ ভাবেন, তবে এটি মানসিকভাবে আপনাকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই অবস্থায় পেশাদারের পরামর্শ আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি কোনো বিশেষ ট্রমা থেকে বের হতে না পারেন

যদি কোনো ব্যক্তিগত আঘাত বা ট্রমা, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পর্ক ভাঙা, বা আর্থিক সংকট, আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে তাড়িয়ে বেড়ায়, তাহলে এটি প্রফেশনাল হেল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত।

স্ট্রেস মোকাবিলায় সাধারণ কৌশল কাজ না করলে

যদি আপনি বিভিন্ন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কৌশল, যেমন মেডিটেশন, সময় ব্যবস্থাপনা, বা রিল্যাক্সেশন চর্চা করেও ফল না পান, তাহলে পেশাদারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

একজন প্রফেশনাল কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন

একজন পেশাদার (যেমন মনোবিজ্ঞানী, সাইকিয়াট্রিস্ট, বা কাউন্সেলর) : আপনার স্ট্রেসের প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারেন, আপনার জন্য একটি কাস্টমাইজড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করতে পারেন, থেরাপি বা প্রয়োজন হলে ওষুধের সাহায্যে আপনার মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মনে রাখবেন, সাহায্য চাওয়া কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি আপনার শক্তির প্রকাশ।

শেষ কথা কখনোই শেষ কথা নয়

কথা শেষ হওয়ার পর কাজ শুরু হওয়ার কথা।

স্ট্রেসকে কখনোই আমাদের প্রতিপক্ষ ভাবা উচিত নয়। এটি জীবনেরই অংশ। যেমন নদী তার গতিতে বাধা পেলে নতুন পথ খুঁজে নেয়, তেমনি স্ট্রেসও আমাদের জীবনের দিশা খুঁজে বের করার সুযোগ দেয়। এটি আমাদের নিজের শক্তি, ধৈর্য, এবং মানসিক স্থিতি যাচাই করার একটি উপায়।

আমাদের জীবন একটি সুন্দর ভ্রমণের মতো। এই ভ্রমণে কখনো রোদ, কখনো ঝড়, আবার কখনো নীরবতার রাত। স্ট্রেস সেই ঝড়ের মতো, যা আমাদের জীবনকে পরীক্ষা করে, কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ। জীবন যদি শান্ত নদীর মতোই কেটে যেত, তবে হয়তো আমরা কখনো জানতে পারতাম না আমাদের ভেতরে কী পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে।

জীবনের স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয়। ভালোবাসা, শৃঙ্খলা, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হলো সেই tool, যা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে একটি সুন্দর আকার দিতে পারি। ভালোবাসা আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে গ্রহণ করার শক্তি দেয়। এটি আমাদের নিজের ভুলগুলোকে মেনে নিতে এবং সেগুলো থেকে শেখার সুযোগ দেয়। শৃঙ্খলা আমাদের পথচলা সহজ করে। প্রতিদিনের ছোট ছোট পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, এবং সময়ের সদ্ব্যবহার আমাদের জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

তবে জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোও আমাদের শেখায়। ব্যর্থতার সময়গুলো আমাদের মনের শক্তি বাড়ায়, আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। আমরা যখন নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নিয়ে এগিয়ে যাই, তখন আমরা আসলে নিজের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিই।

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট মানে কেবল চাপ কমানো নয়, বরং চাপ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আরও দৃঢ় করে তোলা। এই পৃথিবীতে আমরা একে অপরের জন্য আছি। আমাদের গল্প, আমাদের জয়, এবং আমাদের শান্তি—এসবই অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

এ নিয়ন্ত্রিত স্ট্রেস আমাদের সেই অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাক - এটাই প্রার্থনা। পৃথিবী অল্প কিছুদিনের। পৃথিবীর এ যাত্রা শেষ করে আমরা যখন আপন সৃষ্টিকর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো - তিনি পরম মমতায় আমাদের বলবেন - হে প্রশান্ত আত্মা, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট ! তোমাকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলেছি আর তুমি ধৈর্য্য ধারণ করেছো। প্রচণ্ড কষ্টে থেকেও তুমি সবর করেছো। সামান্য প্রাপ্তিতে তুমি কৃতজ্ঞ থেকেছো। তুমি যেমন আমার সবকিছুর উপর সন্তুষ্ট ছিলে, আজ আমিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। আমার এ অনন্ত শান্তি আশ্রয়ে প্রবেশ কর।

সে মহাসাফল্যের দিনের অপেক্ষায় আমরা সবাই।

আমাদের জীবন একটি সুন্দর ভ্রমণের মতো। এই ভ্রমণে কখনো রোদ, কখনো ঝড়, আবার কখনো নীরবতার রাত। স্ট্রেস সেই ঝড়ের মতো, যা আমাদের জীবনকে পরীক্ষা করে, কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ। জীবন যদি শান্ত নদীর মতোই কেটে যেত, তবে হয়তো আমরা কখনো জানতে পারতাম না আমাদের ভেতরে কী পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে।

জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো আমাদের শেখায়। ব্যর্থতার সময়গুলো আমাদের মনের শক্তি বাড়ায়, আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে।

আমরা যখন নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নিয়ে এগিয়ে যাই, তখন আমরা আসলে নিজের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিই।

আলো-আলোকিত জীবনশৈলী
চৌধুরী নগর, বায়েজিদ বোস্তামী, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
life-skillz.org
880 1713 197 000